মাসুদ রানা

# নকল বিজ্ঞানী

দুইখন্ড একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনা





মাসুদ রানা

# নকল বিজ্ঞানী

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

সেবা প্রকাশনী

চৌত্রিশ টাকা


ISBN 984-16-7225-1

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০





১ম প্রকাশ ১৯৯৫, ২য় প্রকাশ ২০০৩

প্রচ্ছদ রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: Sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbocks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana
NAKAL BIGGYANEE
Part. I & II
By Qazi Anwar Husain

# নকল বিজ্ঞানী-১

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৫

## এক

প্যারাডাইস সিটি, ফ্লোরিডা। অর্ধবৃত্তাকারে শহর ঘিরে রাখা উপসাগরের নয়নাভিরাম সী বিচের কাছেই সগর্বে দাঁড়িয়ে হোটেল বেলিভেডার। শহরের সব থেকে ব্যয়বহুল এবং বিলাসবহুল হোটেল। টেক্সাসের টাকার কুমির তেল ব্যবসায়ী, চিত্রতারকা ও বড় বড় কোম্পানির মালিক-নির্বাহীর বিনোদন-কাম-বিশ্রামের প্রথম পছন্দ।

এর পনেরো তলার বিশাল এক পেন্টহাউস স্যুইটের পিছনের বারান্দায় রকিং চেয়ারে বসে মৃদু মৃদু দোল খাচ্ছে এক লোক। ষাট-পঁয়ষট্টি হবে বয়স। লোকটা খাটো, প্রায় চৌকো দেহ। ভীষণ মোটা। ঘন, চওড়া ভুরুর নিচে প্রায় ঢাকা দু'চোখ তার সামনে প্রসারিত।

সৈকতে ছোটাছুটিতে ব্যস্ত বিকিনি পরা মেয়েদের দিকে তাকিয়ে আছে সে। শুধু তাকিয়েই আছে, দেখছে না। পাতলা, তামাটে চুলের নিচে বড়সড় মাথাটায় তার অন্য চিন্তা। গভীর চিন্তা। দাঁতে কামড়ে ধরা মোটা চুরুট পুড়ছে।

লোকটির নাম কার্ল হফার। কোটিপতি এক জার্মান ব্যবসায়ী। পৃথিবীর সেরা ধনীদের একজন হফার। বিশ্বের প্রায় সব দেশেই আছে তার ব্যবসা, ছড়িয়ে আছে বহুভূজ অক্টোপাসের মত। সাঙ্ঘাতিক প্রভাবশালী ব্যক্তি। ইউরোপ-আমেরিকার প্রতিটি কূটনৈতিক মিশন খুব ভাল করে চেনে তাকে। কারণ 'দাঁড়াবার সময় তো নাই' মার্কা চঞ্চল মৌমাছির মত আজ এ দেশ কাল ও দেশ চষে বেড়ানো হফারের ভিসা তাদেরকেই ইস্যু করতে হয়। বছরের ছয় মাসই আকাশে থাকে লোকটা। বাকি ছয় মাস মাটিতে।

জুরিখ, টোকিও, হংকং, লণ্ডন ও নিউইর্য়ক স্টক এক্সচেঞ্জ, সবখানে কার্ল হফার একটা ফিগার। প্রথম জীবনে শূন্য হাতে ব্যবসায় নেমে আজ এই পর্যায়ে পৌঁছতে পেরেছে লোকটা কেবল পাতলা চুলের নিচের ওই মাথাটার জন্যে। ওটাই কার্ল হফারের সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। সারাক্ষণ আরও অর্থ রোজগারের ফিকিরে থাকে। অর্থের যেমন অভাব নেই তার, তেমনি খাঁইয়েরও কমতি নেই।

তিন বেড, তিন বাথ, একটা ডিলাক্স কিচেন, দুই রিসেপশন রুম, আরও একটা ছোট রুম, ককটেল বার, সুইমিংপুলসহ বিশাল টেরেস ইত্যাদি সম্বলিত এই পেন্টহাউস স্যুইট সারা বছরের জন্যে বাঁধা কার্ল হফারের। যখন-তখন ছুটে আসে সে এখানে, বিশেষ করে যখন বড় কোন কুটিল বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন দেখা দেয়। ফ্লোরিডার চড়া রোদে চাঁদি উষ্ণ হয় তার, সেই সঙ্গে বুদ্ধিও খোলতাই হয়।

মুখ ঘোরাল কার্ল হফার। রেলিং ঘেঁষে রাখা বড় বড় কাঠের টবে কয়েক ধরনের উষ্ণমণ্ডলীয় ফুল ফুটে আছে। বাতাসে এদিক-ওদিক মাথা দোলাচ্ছে তারা, মিষ্টি সুবাস ছড়াচ্ছে। মনে মনে হাসল হফার। কর্মপদ্ধতি ঠিক করে রেখেছে সে আগেই, এতক্ষণ ওটাকেই একটু ঘষা-মাজা করছিল। মাথা ঘামানোর কাজ শেষ, এবার কাজে নামার সময় হয়েছে।

কোথাও কোন ফাঁক নেই হফারের পরিকল্পনায়। একেবারে নিখুঁত। ফুলপ্রুফ। এবার যোগ্য লোককে সব বুঝিয়ে দেবে সে। সে-ই করবে বাকিটা। ঘড়ি দেখল কার্ল হফার। সাড়ে এগারোটা। এখনই আসবে সে। ভাবতে ভাবতেই পিছনে মৃদু পায়ের আওয়াজ উঠল। এসে গেছে। সন্তুষ্ট হলো জার্মান। কে কত কর্তব্য পরায়ণ তা তার সময় নিষ্ঠা দেখে বেশ বোঝা যায়।

লোকটি তার ডান হাত, জেরি লাটিমার। আমেরিকান। প্রায় ছয় ফুট লম্বা। স্লিম ফিগার। হলিউডের নায়কদের মত চোখা চেহারা। বয়স পঁয়তাল্লিশ। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে ভীষণ বাছ-বিচার লাটিমারের। মদ, সিগারেট ছুঁয়েও দেখেনি জীবনে। শুয়োরের মাংস তার দু'চোখের বিষ। প্রিয় খাবার মাছ। স্বাদ বদলের জন্যে মাঝে মধ্যে মাংস সে খায় বটে, কচি মুরগির মাংস, তাও মাসে একবারের বেশি নয়। ফলে বাস্তবের চেয়ে অনেক কম বয়সী মনে হয় লাটিমারকে।

'বোসো,' বলল কার্ল হফার।

পাশের একটা লাউঞ্জিং চেয়ারে বসল লাটিমার নিঃশব্দে। বাঁ পায়ের ওপর ডান পা তুলে দিয়ে পালিশ করা শু্র চকচকে ভোঁতা ডগা পরখ করতে লাগল। চেহারা অভিব্যক্তিহীন।

নিষ্ঠুর, পাথুরে চোখে তাকে কয়েক মুহূর্ত পর্যবেক্ষণ করল কার্ল হফার। 'তোমার জন্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজের ব্যবস্থা হয়েছে।'

বসকে বিরতি দিতে দেখে মুখ তুলল জেরি লাটিমার। তার 'গুরুত্বপূর্ণ' মানেই ভয়ঙ্কর, 'খুব গুরুত্বপূর্ণ' তো আরও। তার মানে বড় কোন চাল চালতে যাচ্ছে হফার, যার পুরোটা তাকেই সামাল দিতে হবে। ও নিয়ে অবশ্য চিন্তা নেই লাটিমারের, যত ভয়ঙ্করই হোক কোন কাজকেই সে ভয় করে না। উল্টে কাজই বরং তাকে ভয় পায় বলা যায়। এবং হফার তা জানে বলেই মাসে মাসে দশ হাজার ডলার বেতন দিয়ে পোষে তাকে।

'কি কাজ, বস?'

'ইউএস অর্ডন্যান্স রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী, প্রফেসর মারগুব হোসেনের নাম শুনেছ?'

খানিক ভাবল লাটিমার। 'মনে হয় শুনেছি। ভদ্রলোক সম্ভবত মেন্টাল রুগী। কিছুদিন আগে...' বসকে মাথা দোলাতে দেখে থেমে গেল লাটিমার।

'হ্যাঁ, সে-ই। তবে আমার ধারণা প্রফেসর মানসিক রোগী নয়। ওটা তার ভান। মার্কিন সরকারের হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্যে প্রফেসর খুব সম্ভব স্মৃতিভ্রষ্টের অভিনয় করছে।'

তথ্যটা হজম করতে সময় লাগল লাটিমারের। 'অভিনয় করছে! বুঝলাম না।'

চুরুট নিভে গিয়েছিল। ওটা ফেলে সামনের গ্লাস টপ টেবিলে রাখা কাঠের তৈরি চুরুটের বাক্সটা খুলল হফার। সামনে ঝুঁকে সতর্কতার সঙ্গে বাছাই করল নতুন একটা। বাক্সের পাশে রাখা সোনার গিলোটিনে ওটার গোড়া কাটল সে। ধরিয়ে নিয়ে টানতে লাগল নীরবে। বক্তব্য গোছাচ্ছে মনে মনে। নড়েচড়ে বসল জেরি লাটিমার। পায়ের অবস্থান বদল করে ডান পায়ের ওপর বাঁ পা চাপাল। ধৈর্যের সঙ্গে হফারের মুখ খোলার অপেক্ষায় থাকল।

'বছর চারেক আগে,' চুরুটের দৈর্ঘ্য অর্ধেকে নামিয়ে এনে শুরু করল কার্ল হফার। 'একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করে বসে এই প্রতিভাবান প্রফেসর, মারগুব হোসেন। আবিষ্কারটা এক কথায় যুগান্তকারী। পাশাপাশি মানব সমাজের জন্যে ভয়ঙ্করও বটে। জিনিসটা ছিল বিশেষ এক মেটাল। স্টীলের তুলনায় দশগুণ হালকা, অথচ পাঁচ গুণ বেশি টেকসই। তারওপর পুরোপুরি ফ্রিকশন প্রুফ আর দামেও সস্তা।'

'বাপ্‌রে! একসঙ্গে এত কিছু!'

'হ্যাঁ, তাই। সবাই এর নাম দিয়েছে রেভল্যুশনারি মেটাল। এর উৎপাদন শুরু করতে সক্ষম হলে বিমান, রকেট, রণতরী, ডুবোজাহাজ ইত্যাদি নির্মাণের ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য এক বিপ্লব ঘটিয়ে দিতে পারত যুক্তরাষ্ট্র। রাতারাতি সারা বিশ্ব হাতের মুঠোয় এসে যেত তার। শক্তির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যেত পুরোপুরি। সোজা কথায় ওয়াশিংটনের করুণার ওপর নির্ভর করতে হত তখন রাশিয়া-চীনসহ সবাইকে। কিন্তু আমেরিকার দুর্ভাগ্য যে এমন একটা সুযোগ হাতে পেয়েও পেল না সে।

'এ জিনিস পেলে আমেরিকা না জানি কি করে, এই চিন্তা করে শেষ মুহূর্তে বেঁকে বসে প্রফেসর মারগুব।' তার মেটাল উদ্ভাবনের ফর্মুলা, যার নাম এমসিজেড, ডিকোড না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে লোকটা। প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দেয়, এ জিনিস কেউ উৎপাদন করুক তা সে চায় না। যুক্তরাষ্ট্রের কথা বাদ, আমার জানামতে রাশিয়া, চীন, ফ্রান্স এবং আরও কয়েকটি দেশ লোকটির পিছনে জোঁকের মত লেগে ছিল ওর ডিকোডেড ফর্মুলার আশায়। কত রকম লোভ যে দেখিয়েছে তারা লোকটিকে, কিছুতেই কিছু হয়নি। তার না তো না-ই।

'আর ওয়াশিংটন? ওরা কোন্‌টা যে করেনি বলা মুশকিল। পুরো দেড়টা বছর জান-প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করেছে তারা লোকটাকে লাইনে আনতে। পারেনি। অনেক অনুনয়-বিনয়, হাত-পা ধরাধরি, কিছুতে কিছু হয়নি। শেষে উপায়ন্ত না পেয়ে বিশজন বিজ্ঞানীকে ওই ফর্মুলা ডিকোড করার কাজে নিয়োগ করে তারা। বাঘা বাঘা একেকজন বিজ্ঞানী। কিন্তু টানা দু'বছর পরিশ্রম করেও কিছুই করতে পারল না তারা, ভেড়া বনে গেল সবাই। শেষে হাল ছেড়ে দিল। ঘোষণা করতে বাধ্য হলো, তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। ও কাজ মারগুব হোসেন ছাড়া কারও পক্ষেই করা সম্ভব নয়। কারণ ওটা ডিকোড করার মাল-মশলা আছে তার মাথার মধ্যে। এ কাজে কোন বই বা জার্নাল ব্যবহার করেনি সে।

'আমি মনে করি ব্যাপারটা অসম্ভব নয়। এই মানুষটি ফটোগ্রাফিক মেমোরির

অধিকারী। একটা বইয়ের পাতা একবার পড়েই টানা মুখস্থ বলে যেতে পারে। একটা দাঁড়ি কমাও ভুল হয় না। কাজেই এমসিজেড ব্রেকের কী নোট তার মাথার ভেতর থাকা খুবই সম্ভব। আমার ধারণা আছেও তাই।'

'আচ্ছা!'

'এদিকে মারগুব হোসেন যখন এই গবেষণা শুরু করে, তখন কি নিয়ে কাজ করছে সে, তা জানায়নি কাউকে। বিষয়টা সম্পূর্ণ গোপন রেখেছিল। যদিও এটা নিয়ম বহির্ভূত, কাজে হাত দেয়ার আগে গবেষণার বিষয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে নেয়াই নিয়ম। কিন্তু এসব নিয়ম-টিয়মের খুব একটা ধার ধারত না প্রফেসর। মানুষটা ত্যাড়া কিসিমের। অত্যন্ত প্রতিভাধর মানুষরা একটু আধটু এরকম হয়েই থাকে। এ-ও সে ধরনের। আধ-পাগলা, মুডি মানুষ।

'যে কারণে তার গবেষণায় বাধা দেয়নি কর্তৃপক্ষ। ওরা ভালই জানত মারগুব হোসেনের প্রকৃতি, সে নিশ্চই গুরুত্বপূর্ণ একটা কিছু নিয়েই লেগেছে, তা বুঝতে ভুল করেনি ওরা। ফলে বিষয়টা জানার জন্যে ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠেছিল। যে কারণে মারগুব হোসেনের গবেষণা সহকারী মেয়েটিকে একদিন গায়েব করে দেয় সিআইএ, এবং আরেক মেয়ে বিজ্ঞানীকে তার সঙ্গে ভিড়িয়ে দেয় সহকারী হিসেবে। মেয়েটি ছিল আসলে সিআইএ-র এজেন্ট। খুব সুন্দরী। কাজে নেমেই মারগুব হোসেনের প্রেমে পড়ে গেছে এমন একটা ভাব দেখাতে শুরু করে মেয়েটি। কাজের সময় তো বটেই, অবসর সময়ও নিয়মিত তার সঙ্গে সঙ্গে থাকত সে। অল্পদিনের মধ্যেই এক কথায় প্রফেসরের প্রেমিকা-কাম-গার্জেন হয়ে বসে এই মেয়ে।

'তার মাধ্যমে সিআইএ জানতে পারে কি নিয়ে গবেষণা করছে মারগুব হোসেন। কাজ ততদিনে প্রায় শেষ। এরমধ্যে সত্যি সত্যি মেয়েটির প্রেমে পড়ে যায় প্রফেসর। তাকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্নও দেখতে শুরু করে। এই সময় ঘটে বিপত্তি। গবেষণা শেষ করে প্রফেসর যখন বুঝল কী সাঙ্ঘাতিক জিনিস আবিষ্কার করে ফেলেছে সে, তখনই পুরোপুরি হাত গুটিয়ে নিল। চেপে যেতে চাইল সে বিষয়টা। কিন্তু মার্কিন সরকার তা মানবে কেন? মেয়েটিকে দিয়ে বিজ্ঞানীর ওপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করতে লাগল তারা ফর্মুলা ডিকোড করে দেয়ার জন্যে।

'দেয়নি মারগুব হোসেন। এরপর, আগেই বলেছি, অনুনয়-বিনয়, হাত-পা ধরাধরি, অর্থের লোভ, নোবেল পুরস্কারের লোভ, অনেক কিছুই করেছে মার্কিনীরা, কিছুতেই চিঁড়ে ভেজেনি। প্রফেসরের সাফ জবাব, ও জিনিস কাউকে দেবে না সে। প্রথম যার হাতে পড়বে ওটা, তার হাতে নিঃসন্দেহে বিপন্ন হবে পৃথিবী, এই ছিল প্রফেসরের যুক্তি। শেষ পর্যন্ত, কুড়িজন বিজ্ঞানীও যখন ফেল মারল, খেপে গেল ওয়াশিংটন। টানা দেড় বছর নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে বাধ্য করে ওরা প্রফেসরকে। দিন রাত তাকে নজরবন্দী করে রাখা হয়। টেলিফোন লাইন কেটে দেয়া হয় তার, খবরের কাগজ-জার্নাল ইত্যাদি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হয়। নিষেধাজ্ঞার কারণে এক সময় ঘর ছেড়ে বেরুনোও বন্ধ হয়ে যায় তার। এমনকি কাউকে দেখা পর্যন্ত করতে দেয়া হত না মারগুব হোসেনের সঙ্গে। এক কথায়

সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয় তাকে দেড় বছর।

'এই সময়ই প্রফেসরের আচার-আচরণে অস্বাভাবিকতা দেখা দিতে শুরু করে। একটু একটু করে তা বাড়তেই থাকে। লোকটা এমনিতেই ছিল পাগলাটে, নির্বাসনের দেড় বছরে তা বাড়তে বাড়তে বেশ জটিল পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এ জন্যে সিআইএ-র এজেন্ট মেয়েটিও কম দায়ী নয়। ওকে সত্যিই ভালবেসে ফেলেছিল প্রফেসর। ফর্মুলা ডিকোড করাতে ব্যর্থ হয়ে মেয়েটিও যখন তাকে ত্যাগ করল, তখন থেকেই মানসিক জটিলতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে তার। কারণ প্রফেসর বুঝে ফেলেছিল যে মেয়েটি তাকে ভালবাসেনি আদৌ, অভিনয় করে গেছে কেবল।'

থামল কার্ল হফার। মুখ ঘুরিয়ে সৈকতের দিকে তাকাল জেরি লাটিমার। এক যুবতীর ওপর চোখ পড়ল। হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে বল লোফালুফি করছে এক যুবকের সঙ্গে। খুব মোটা মেয়েটি, সারা গায়ে থল থল করছে চর্বি। বিকিনি পরা একেবারেই উচিত হয়নি ওর, ভাবল লাটিমার। বিচ্ছিরি লাগছে। যুবকের ছুঁড়ে দেয়া বল ধরতে গিয়ে হঠাৎ বেসামাল হয়ে পড়ল মেয়েটি, পড়ে গেল থপাস্ করে। হেসে উঠল জেরি লাটিমার।

'হাসছ কেন?' কট্‌মট্ করে তাকাল কার্ল হফার।

লাটিমার নিরুত্তর। মুখ নিচু করে মাথা চুলকাতে লাগল।

'জরুরী কাজের কথা বলার জন্যে তোমাকে এখানে ডেকেছি আমি, মেয়েদের পাছা-বুক মাপার জন্যে নয়,' তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনার সুরে বলল হফার।

মনে মনে জিভ কাটল লাটিমার। তার মানে ব্যাপারটা দেখে ফেলেছেন বস্। তাঁর এই একটা ব্যাপার বুঝে উঠতে পারে না লাটিমার। মেয়েদের একদম সহ্য করতে পারেন না বস্। মেয়েদের ব্যাপারে যাদের দুর্বলতা আছে, তারা হফারের করুণার পাত্র। হফারের দর্শন জানা আছে লাটিমারের। মেয়েদের যত খুশি ভোগ করো। কিন্তু লক্ষ রেখো, ওরা যেন তোমাকে দখল করে না বসে। ওদের মায়া যেন তোমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলার সুযোগ না পায়।

বুঝে উঠতে পারে না লাটিমার, এত যার টাকা, সে কি করে নারীবিমুখ হয়! এ নিয়ে আগেও অনেক মাথা ঘামিয়েছে জেরি। আরও একবার ঘামাল নতুন করে। লোকটা কি ব্যর্থ প্রেমিক? প্রেমে ছ্যাঁকা খেয়েই...নাকি...? কে জানে!

'দুঃখিত, বস্।'

চুরুটটা অ্যাশট্রেতে পিষে দিল কার্ল হফার। 'এরপর অবস্থার আরও অবনতি হয়। মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় প্রফেসরের। কারও সঙ্গে কথা বলে না, কাউকে চিনতে পারে না। খায় না, ঘুমায় না। সারাক্ষণ বসে থাকে চুপ করে। গম্ভীর। ফলে বাধ্য হয়ে এখানে, শহরের বাইরে এক মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করে তাকে সরকার। হাসপাতাল না বলে ওটাকে এক ধরনের কারাগার বলাই ভাল। হ্যারিসন ওয়েন্টওঅর্থ অ্যাসাইলাম। প্রাইভেট। তবে সর্বাধুনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে এদের। এদেশের পয়সাওয়ালা অথচ ভয়ঙ্কর, বিপজ্জনক সব মানসিক রোগীর চিকিৎসা করা হয় এখানে।

'ওয়াশিংটনের আশা, একদিন প্রফেসরকে সুস্থ করে তুলতে সক্ষম হবে এরা। এবং তাকে দিয়ে ফর্মুলা এমসিজেড ডিকোড করাবার আরেকটা চান্স নেবে সে।'

'কিন্তু তখন যে বললেন প্রফেসর স্মৃতিভ্রষ্টের ভান করছে! আপনি কি করে তা...'

'না, নিশ্চিত জানি না। ওটা আমার ধারণা। সিআইএ-র চাপাচাপির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে লোকটা পাগলামির অভিনয় করছে। হয়তো। অথবা হতে পারে সত্যিই পাগল হয়ে গেছে। সে যা-ই হোক, তাতে কিছু আসবে যাবে না আমার। আমার কেবল প্রফেসরকে চাই।'

'বুঝলাম। কিন্তু যদি সে সত্যিই স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে তাকে ধরে এনে কি লাভ?'

'বেশ কয়েকজন মেন্টাল স্পেশালিস্টের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। তাদের মত হচ্ছে,যদি প্রফেসর স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে তাকে সারিয়ে তোলা সম্ভব। সঠিক জায়গায় টোকা দিতে পারলেই সেরে উঠবে সে।' কোটের ভেতরের পকেট থেকে একটা মোটা খাম বের করে লাটিমারের দিকে এগিয়ে দিল কার্ল হফার।

'এটা রাখো। কি ভাবে কি করতে হবে সব লেখা আছে এতে। কাজে নামার আগে ভাল করে পড়ে বুঝে নেবে। এতে একটা মেয়ের উল্লেখ আছে, শিলা ব্রাউন, মেয়েটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একে কোনমতেই আহত করা চলবে না। সিআইএ-র এজেন্টকে সহকারী হিসেবে প্রফেসর হোসেনের সঙ্গে ভিড়িয়ে দেয়ার আগ পর্যন্ত শিলাই ছিল তার গবেষণা সহকারী। ওদের পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ার পর পুরানো কর্মস্থলে ফিরিয়ে আনা হয়েছে শিলাকে, আরেকজন বিজ্ঞানীর গবেষণা সহকারী হিসেবে একই জায়গায় চাকরি করছে সে বর্তমানে। এমসিজেড সম্পর্কে অনেক কিছু জানে মেয়েটি। আবারও বলছি, আমার এই মিশনে শিলা ব্রাউন ভাইটালি ইম্পর্টেন্ট। বড় কোন ঝামেলা হলে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে পারবে তুমি যখন খুশি। কোন প্রশ্ন?'

'আগে এটা পড়ে দেখতে চাই,' খামটা দোলাল জেরি লাটিমার। 'তারপর আরেকবার বসব আপনার সঙ্গে।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে। আজই পড়ে ফেলো।'

'জ্বি, আচ্ছা।'

'রাখো, আরও আছে,' লাটিমারকে আসন ত্যাগের প্রস্তুতি নিতে দেখে বলল হফার। 'ওতে যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটা নেই, সেটা শোনো এবার। মাসুদ রানার নাম শুনেছ কখনও?'

মাথা দোলাল লাটিমার। 'না।'

'বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের এক বেপরোয়া, দুর্দান্ত স্পাই মাসুদ রানা। বছর কয়েক আগে একবার ওর সঙ্গে টক্কর লেগেছিল আমার। খুব অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি আমি সে যাত্রা। ফাঁসীর গেরো প্রায় নিয়ে এসেছিল ও আমার মাথার ওপর, নেহাত কপাল জোরে...। সে যাক, প্রফেসর মারগুব হোসেন বাঙালি, বাংলাদেশের মানুষ। তার নিরুদ্দেশ সংবাদ যখন জানাজানি হবে, হাতে

যত কাজই থাকুক, ছুটে আসবে মাসুদ রানা। কারণ হ্যারিসন অ্যাসাইলামের নিরাপত্তার দায়িত্ব ওরই পরিচালিত এক ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির হাতে। 'রানা এজেন্সি' নাম ওটার। আসুক ও, তাতে কিছু যায়-আসে না আমার। কিন্তু এর পিছনে আমার হাত আছে, তা ওকে কোনমতেই টের পেতে দেয়া চলবে না। কোনমতেই না। তোমাকেও ক্লিন থাকতে হবে। আর মারগুব হোসেনকে খুঁজে বের করার মত কোন সূত্রও যাতে মাসুদ রানা না পায়, সেটাও তোমাকেই নিশ্চিত করতে হবে। মনে রেখো, মাসুদ রানার মত এমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি ড্যাম কেয়ার মানুষ জীবনে দ্বিতীয়টি চোখে পড়েনি আমার। কাল কেউটের চেয়েও ভয়ঙ্কর ও। বিষাক্ত। ও যদি নাগাল পায় তোমার, তুমিতো যাবেই, সঙ্গে আমাকেও যেতে হবে। মাসুদ রানার কথা ভেবেই এ অপারেশনে
সরাসরি নিজেকে জড়াতে চাই না আমি। আমার লিখিত সাজেশন অনুযায়ী তোমাকেই সব করতে হবে। যদি প্রয়োজন মনে করো, ওগুলোর সঙ্গে নিজের আইডিয়াও যুক্ত করতে পারবে। তবে খেয়াল রাখবে, অপারেশনের পুরো দায়িত্ব তোমার, এবং এ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হওয়া চলবে না। কয়েক দিনের জন্যে জার্মানি যাচ্ছি আমি। ফিরে এসে যেন দেখি সব ঠিক আছে। নইলে...।'

বক্তব্য শেষ করল না হফার ইচ্ছে করেই। ঝুঁকে আরেকটা চুরুট বাছাইয়ের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ওদিকে স্থির হয়ে বসে আছে জেরি লাটিমার। তাজ্জব হয়ে গেছে। এতদিন জানত কার্ল হফার কাউকে পরোয়া করে না। তার মত প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী মানুষ আর হয় না। অথচ আজ এ কী শুনছে সে তারই মুখে? কোথাকার কোন এক স্পাই, তার ভয়ে কি না...আশ্চর্য!

শীতল হাসি ফুটল জেরি লাটিমারের মুখে। মাসুদ রানা! বিষাক্ত কাল কেউটে? দেখা যাক, কে কত বিষ ধরে! মাসুদ রানাকে প্রয়োজনে পিঁপড়ের মত পিষে ফেলা যে কোন কাজই নয়, সময় হলে বসকে তা প্রমাণ করে দেখাবে সে।

# দুই

ডান চোখের পাতা আস্তে করে সিকি ইঞ্চি মেলল মাসুদ রানা। টেবিল ঘড়ির ঘণ্টা আর মিনিটের কাঁটা দুটো দু'পাশে লম্বা করে ডানা মেলে আছে। ওরে বাবা! ঝট্ করে বালিশ থেকে মাথা তুলল ও, সোয়া ন'টা!

ছিঃ ছিঃ! ভাবল রানা, ঠিক হয়নি কাজটা। বিজ্ঞজনেরা বলে গেছেন, আরলি টু বেড অ্যাণ্ড আরলি টু রাইজ...। আর ও কিনা...এক লাফে বিছানা ত্যাগ করল মাসুদ রানা। পরমুহূর্তে 'উফ্!' করে বসে পড়ল। টন্ টন্ করছে মাথা। অনেকদিন পর অফিসার্স ক্লাবে ঢুঁ মারতে গিয়েছিল ও কাল সন্ধের পর। ইচ্ছে ছিল কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ সেরেই ফিরে আসবে।

কিন্তু পারেনি। গল্প আর তাস খেলার ফাঁদে ফেলে আটকে দিয়েছিল বন্ধুরা

ওকে। মাঝরাতেরও অনেক পর, বহু হাত-পা ধরে রেহাই পেয়েছে মাসুদ রানা। এই সময়টুকুর মধ্যে বেশ কয়েক পেগ হুইস্কি গিলতে হয়েছে ওকে বাধ্য হয়ে। পরিমাণে একটু বেশিই হয়ে গেছে পানের মাত্রা। তার জের চলছে এখন। সোজা হয়ে বসল মাসুদ রানা। সাবধানে, আস্তে আস্তে ডানে-বাঁয়ে ঝাঁকাল মাথাটা দু'বার। একটু যেন কম মনে হলো ব্যথা এবার।

বাথরুমে গিয়ে ঢুকল মাসুদ রানা। শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে ঝাড়া দশ মিনিট ধরে গোসল করল; কানে পানি ঢুকে যাওয়ায় বাচ্চা ছাগলের মত লাফাল কতক্ষণ তড়াক্ তড়াক্। তখনই টের পেল ব্যথাটা নেই আর তেমন, গায়েব হয়ে গেছে প্রায়। পঞ্চমুখে ঠাণ্ডা পানির প্রশংসা করতে করতে গোসল শেষ করল ও। তারপর পেল্লায় এক তোয়ালে কোমরে পেঁচিয়ে বেরিয়ে এল।

বাইরে যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে নাশতা করল। তারপর কফি খেতে খেতে দৈনিক পত্রিকাগুলোয় নজর বোলাতে লাগল। সবগুলো পত্রিকার একটা খবর আজ কমন: প্রখ্যাত বিজ্ঞানী মারগুব হোসেনের আজ পঁয়তাল্লিশতম জন্মবার্ষিকী। সঙ্গে ছবিও ছাপা হয়েছে বিজ্ঞানীর। এতবড় এক বিজ্ঞানী, সারা পৃথিবীজোড়া যাঁর নাম, সেই মানুষটি আটকা আছেন এখন যুক্তরাষ্ট্রের এক পাগলা গারদে। কী দুর্ভাগ্য! ভাবল মাসুদ রানা।

টেলিফোনের আওয়াজে চমকিত হলো রানা। 'হ্যালো!'

'তুই এখনও বের হোস্‌নি?' সোহেলের খ্যাঁকানি শোনা গেল ও প্রান্ত থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে দুষ্ট বুদ্ধি চাপল ওর মাথায়। 'হ্যালো, কে বলছেন? কাকে চান?'

আমতা আমতা করতে লাগল সোহেল। 'ইয়ে, এটা এইট থ্রী ফাইভ ডাবল নাইন থ্রী না?'

'জ্বি না,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা। 'রঙ নাম্বার। আর নাম্বার শিওর না হয়ে ফোন ধরেই তুই-তুকারি করা কোথাকার ভদ্রতা?'

'সরি, ভাই,' আহাম্মক বনে গেল সোহেল। 'আমি দুঃখিত। আ'য়্যাম...।'

'অভদ্র কোথাকার!' দড়াম করে রিসিভার রেখে দিল রানা। হাসতে হাসতে ভাবল শালার চেহারাটা কেমন হয়েছে দেখতে পেলে হত।

দশ সেকেণ্ড যেতে না যেতে আবার বেজে উঠল ফোন। এইবার ভদ্র হয়েছে সোহেল। রানা উত্তর দিতে জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি...নাম্বার?'

'না।'

জিভ দিয়ে বিরক্তি সূচক আওয়াজ করল সে। 'কী যন্ত্রণা!'

'যন্ত্রণার কি আছে, যা বলার বলে ফেললেই তো পারেন।'

'জ্বি!'

'আরে শালা! কি বলবি, বল্ না!'

'রানা!' ডিনামাইটের মত বিস্ফোরিত হলো সোহেল। 'কত জরুরী কাজে খুঁজছি তোকে, আর তুই কি না ফাজলামো শুরু করে দিয়েছিস। তুই...তুই...' রাগে তোতলাতে শুরু করল ও রীতিমত।

আরও রাগিয়ে দিল রানা। 'এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি দিতে বল তোর

সেক্রেটারিকে। খানিকটা খেয়ে বাকিটা মাথায় ঢালতে থাক, ততক্ষণে পৌঁছে যাব আমি।'

'আয়, শালা! আজ তোর একদিন কি আমার...'

হাসতে হাসতে ফোন রেখে দিল রানা। বেরিয়ে এসে গাড়ি নিয়ে ছুটল মতিঝিল। ভাবছে, কি জরুরী কাজে খুঁজছে ওকে সোহেল? রানাকে দেখে চোখ কোঁচকালো সোহেল আহমেদ। সত্যি সত্যি রেগে আছে। 'অফিস শুরু হয় ক'টায়?'

'ন'টায়, স্যার,' ভালমানুষের মত বলল রানা।

'এখন বাজে ক'টা?'

'সাড়ে দশটা।'

রেগেমেগে কিছু বলতে যাচ্ছিল সোহেল, কিন্তু সুযোগ হলো না। ওর আর বিসিআই চীফ মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খানের রুমের মাঝের চকচকে স্টীলের পার্টিশনটা সরে যেতে আরম্ভ করেছে। সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন বৃদ্ধ। 'কখন এসেছ?' রানাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

'এইমাত্র, স্যার।'

'এসো। সোহেল, তুমিও এসো।'

ভেতরে বৃদ্ধের মুখোমুখি বসল ওরা। চিন্তিত মুখে পাইপ ধরালেন রাহাত খান। আনমনে ধোঁয়া ছাড়লেন কিছুক্ষণ। 'প্রফেসর মারগুব হোসেন সম্পর্কে তোমাদের নতুন করে কিছু বলার নেই। সবই জানো তোমরা।'

'জ্বি, স্যার,' বলল সোহেল।

রানা বলল, 'পত্রিকায় দেখলাম ভদ্রলোকের আজ জন্মদিন।'

'হ্যাঁ, দেখেছি,' চোখ ইশারায় পাশের এক শেলফে ভাঁজ করে রাখা আজকের পত্রিকাগুলো দেখালেন রাহাত খান। 'মার্কিন সরকার বড্ড বাড়াবাড়ি করছে ভদ্রলোককে নিয়ে।'

নীরবে মাথা দোলাল ওরা দু'জনেই।

'কূটনৈতিক পর্যায়ে ওয়াশিংটনের সঙ্গে বহুবার যোগাযোগ করেছে বাংলাদেশ। অনেকবার অনুরোধ করা হয়েছে প্রফেসরকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে দিতে, কিন্তু পাত্তা দেয়নি ওরা। কানেই তোলেনি আমাদের আবেদন। সর্বশেষ একটা আবেদন করা হয় এর মাঝে, মানবিক কারণে তাঁকে মুক্তি দেয়ার জন্যে। সেটাও প্রত্যাখ্যান করেছে। বাড়াবাড়ির সীমাও অতিক্রম করে ফেলেছে ওরা। এর একটা বিহিত না করলে আর চলছে না।'

'কি ভাবে কি করবেন, স্যার?' প্রশ্ন করল মাসুদ রানা।

উত্তর দিলেন না বৃদ্ধ। বোধহয় শুনতে পাননি। 'কাল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ডেকে পাঠানো হয়েছিল আমাকে। সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রীর অফিসে। প্রফেসরের ব্যাপারে ওঁদের সঙ্গে আগে থেকেই যোগাযোগ ছিল আমার। কাল সেসব নিয়ে বেশ দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে নতুন করে।'

ঘন ঘন পাইপে টান দিতে লাগলেন বৃদ্ধ। 'পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে

বিষয়টা গত কিছুদিন থেকেই ভাবছিলাম আমি। এখন মনে হয় সময় এসেছে।'

'কি করতে চাইছেন, স্যার।'

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে থেমে থেমে কথা বলে গেলেন বৃদ্ধ। শেষে মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'কাজটা কঠিন কিছু নয়। তোমরা সহজেই সেরে আসতে পারবে।'

'আমরা!' প্রশ্ন করল রানা।

'তুমি আর সোহেল। সঙ্গে সেই লোকও থাকবে অবশ্য। সতর্কতার সঙ্গে করতে হবে কাজটা। একবার হয়ে গেলে ওরাও কিছু সন্দেহ করতে পারবে না। সন্দেহের প্রশ্নই আসে না। রানা আজই রওনা হচ্ছে। সোহেল আর ওই লোক কাল। ভিন্ন ভিন্ন রুটে।'

খানিক ভাবল মাসুদ রানা। 'সম্ভব, স্যার। তবে আলতাফকে অ্যালার্ট রাখা প্রয়োজন। কথা বলতে হবে ওর সঙ্গে।'

'বলো। আভাসে-ইঙ্গিতে।'

# তিন

ব্রিস্টল হোটেল কেমপেনস্কি। পশ্চিম বার্লিন। গদাই লস্করি চালে এন্ট্রান্স হল পেরিয়ে এল কার্ল হফার। রাত পৌনে দশটা।

'গুড ইভনিং, স্যার,' তার উদ্দেশে লম্বা নড করল হল পোর্টার। মানুষটার ওজন ভালই জানা আছে তার। 'আপনার গাড়ি তৈরি।'

মাথা ঝাঁকাল হফার। 'ধন্যবাদ।' স্যুইটের চাবি পোর্টারের হাতে তুলে দিল হফার। সঙ্গে দশ মার্কের একটা নোট। আবার নড করল পোর্টার। দৃঢ়, আত্মপ্রত্যয়ী পায়ে পোর্চে এসে দাঁড়াল কার্ল হফার। কালো ওভারকোট পরে আছে সে। মাথায় চওড়া কিনারার কালো টুপি।

সামনেই দাঁড়িয়ে আছে তার কুচকুচে কালো রোলস রয়েস। পিছনের দরজা মেলে ধরে অপেক্ষা করছে জাপানি শোফার-কাম-কুক সিনোমাকি। তীক্ষ্ণ ছুরির মত ঠাণ্ডা বাতাসের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে ঘাড় গুঁজে দ্রুত এগোল হফার। সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়ল উষ্ণ রয়েসে। দরজা লাগিয়ে নিজের আসনে গিয়ে বসল সিনোমাকি।

'এগারোটায় ব্রান্দেনবুর্গ গেটে জরুরী একটা অ্যাপয়েনমেন্ট আছে আমার,' বলল কার্ল হফার। 'চল্লিশ মিনিটের মধ্যে ফ্রন্টিয়ার পেরোতে হবে তোমাকে।'

'ইয়েস, স্যার।' নিঃশব্দে স্টার্ট নিল ভারি রোলস, পরক্ষণে গড়াতে আরম্ভ করল।

পা যতদূর যায়, লম্বা করে মেলে দিয়ে বসল হফার। তার সামনে, ড্রাইভিং সীটের পিছনের প্যানেলে ফিট করা দর্শনীয় ককটেল কেবিনেটের ওপর রাখা আছে দারু কাঠের তৈরি নকশা করা একটা বাক্স। সিগার কেস। ওর ভেতর

থেকে চুরুট বের করে ধরাল সে। গাড়িটি তার বিশেষ নির্দেশ অনুযায়ী তৈরি করেছে রোলস রয়েস কোম্পানি, অভাব নেই কোন কিছুর।

ককটেল কেবিনেট, শর্ট ওয়েভ রিসিভিং ও সেণ্ডিং সেট, সনি টেলিভিশন সেট, দুটো টেলিফোন, এমনকি পিচ্চি একটা বিল্ট-ইন রিফ্রিজারেটরও আছে ভেতরে। আর আছে একটা কারেন্ট চালিত হিটেড বক্স, যার ভেতরে দীর্ঘক্ষণ সংরক্ষণ করা যায় গরম খাবার। মাথার ওপরের পাইলট ল্যাম্প জ্বেলে দিল কার্ল হফার। পাশে রাখা ব্রিফকেস থেকে একটা ফাইল বের করে নজর বোলাতে লাগল ভেতরে।

দশ মিনিট ঝড়ের বেগে ছোটার পর গতি কমতে আরম্ভ করল রয়েসের। চুরুটটা অ্যাশট্রেতে ফেলে ব্রিফকেস বন্ধ করল হফার। মুখ তুলে সামনে তাকাল। চওড়া রাস্তার দু'পাশে পোঁতা লোহার খুঁটিতে লটকানো আছে বিশাল এক সাইনবোর্ড। প্রথমে ইংরেজি, তারপর জার্মান, এবং সবশেষে রুশ ভাষায় লেখা আছে ওতে:

**ইউ আর নাউ লিভিং দ্য আমেরিকান সেক্টর অভ বার্লিন**

এ তরফের গার্ড হাত নেড়ে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ করল। শামুকের মত গুটি গুটি এগোল রোলস। চল্লিশ গজ গিয়ে কংক্রিটের খুঁটির মাথায় বসানো লাল-সাদা রঙের ব্যারিকেডের সামনে থেমে পড়ল। ওপাশে বার্লিনের রুশ নিয়ন্ত্রিত অংশ। পুরু ওভারকোট, ফার ক্যাপ আর জ্যাকবুট পরা দীর্ঘদেহী এক গার্ড কাছে এসে পাইলট ল্যাম্পের আলোয় ভেতরটা দেখল এক পলক।

সুইচ টিপে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রিত জানালার কাঁচ নামিয়ে দিল কার্ল হফার। বিনা বাক্য ব্যয়ে পাসপোর্টটা তুলে দিল গার্ডের হাতে। তার চর্বিবহুল মুখটা নির্বিকার। কয়েক সেকেণ্ড পর ওটা ফিরিয়ে দিল গার্ড, উঠে গেল ব্যারিকেড। গড়িয়ে গড়িয়ে নো ম্যানস্ ল্যাণ্ডে ঢুকে পড়ল গাড়ি।

সামনে হাঁটু সমান উঁচু অসংখ্য কংক্রিট পিলারের বাধা। ধীরগতিতে, এঁকেবেঁকে পেরোতে হয় জায়গাটা। ব্যারিকেড ভেঙে কেউ দ্রুত গাড়ি চালিয়ে ঢুকে পড়বে ভেতরে, সে উপায় রোধ করার জন্যেই এই আয়োজন। ডানে নিচু ছাতওয়ালা কয়েকটা কাঠের ঘর। সুন্দর রঙ করা, চমৎকার ছিমছাম পরিবেশ। ভেতরে জ্বলছে উজ্জ্বল আলো।

আরও কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে ঘরগুলোর সামনে। ওগুলোর পিছনে এসে থামল সিনোমাকি। বেরিয়ে এসে পিছনের দরজা মেলে ধরল। ধ্বস্তাধ্বস্তি করে বেরিয়ে এল কার্ল হফার। পা বাড়াল প্রথম ঘরটার দিকে। সিনোমাকি অনুসরণ করল তাকে। এখানে দু'জনের পাসপোর্ট চেক করা হলো আবার। তারপর পূরণ করার জন্যে দুটো ফরম দেয়া হলো। নাম, জাতীয়তা, জন্মস্থান, কার কাছে কত টাকা আছে, ইত্যাদি লিখতে হবে।

নীরবে ফরম দুটো পূরণ করল হফার তার সোনার তৈরি পার্কার কলম দিয়ে।

জিনিসটা দেখে বিস্ময়ের আভাস ফুটল পোস্ট-ইন-চার্জ, তরুণ লেফটেন্যান্টের চেহারায়। কাজটা শেষ হতে যার যার ওয়ালেট বের করার নির্দেশ দিল ইন-চার্জ। হাসিমুখে নিজের সবগুলো পকেট ওপর থেকে চাপড়ে দেখাল তাকে সিনোমাকি, মাথা দুলিয়ে বোঝাতে চাইল ওই জিনিস নেই তার। হাত ঝাপটা দিয়ে তাকে সামনে থেকে সরে দাঁড়াতে বলল লোকটা।

সোনার পাত মোড়া সীল মাছের চামড়ায় তৈরি নিজেরটা বের করল হফার। আরেকবার বিস্ময় ফুটল অফিসারের চোখেমুখে। মনে মনে হাসল কার্ল হফার। তার বাড়িয়ে ধরা চারকোনা চারটে লাল টিকেট হাত পেতে নিল সে। তারপর লেফটেন্যান্টের ইঙ্গিতে পাশের ঘরটার দিকে এগোল। এখানে দশ মার্কের দুটো নোট বদলে পুব জার্মান কারেন্সি নিতে হলো তাকে। এটা বাধ্যতামূলক।

কাজ শেষ করে গাড়ির কাছে ফিরে এল কার্ল হফার। হাতে বড় এক ফ্ল্যাশ লাইট নিয়ে ওটার চারপাশে ঘুরঘুর করছে এক গার্ড। হাত ইশারায় সিনোমাকিকে কাছে ডাকল লোকটা। তার সাহায্যে সামনের-পিছনের সীট বের করে তলাটা পরখ করল যথেষ্ট সময় নিয়ে। দূরে দাঁড়িয়ে লোকটার কাজ কর্ম দেখতে লাগল হফার। ঠাণ্ডায় কষ্ট হচ্ছে খুব। কিন্তু কিছুই করার নেই। অপেক্ষা করতেই হবে।

সীট যথাস্থানে বসিয়ে এঞ্জিন আর বুট সার্চ করল গার্ড। সবশেষে চাকার ওপর চিৎ করে বসানো তিন বাই তিন একটা আয়না নিয়ে এসে রোলসের তলায় ঢুকিয়ে দিল। হাঁটু মুড়ে বসে শক্তিশালী ফ্ল্যাশ লাইটের আলোয় আয়নায় প্রতিফলিত গাড়ির তলা দেখতে লাগল মন দিয়ে। এক সময় শেষ হলো পীড়াদায়ক সার্চ। আয়না বের করে মাথা ঝাঁকাল সন্তুষ্ট গার্ড।

গাড়ি ছাড়ল সিনোমাকি। সতর্কতার সঙ্গে পিলারের ধাঁধার ভেতর দিয়ে নো ম্যানস ল্যাণ্ডের শেষ প্রান্তে এসে থামল আবার। এখানে শেষবারের মত পাসপোর্ট চেক করা হলো ওদের। লাল টিকেট চারটে তুলে দিল হফার গার্ডের হাতে। তারপর, মুহূর্তের মধ্যে বেরিকেড পেরিয়ে বৈরী পুব জার্মানে নাক ঢোকাল রোলস রয়েস।

'কেয়ারফুল পিপ্‌ল,' এক্সিলারেটর ফুটবোর্ডের সঙ্গে চেপে ধরে মন্তব্য করল সিনোমাকি।

কথাটা কার্ল হফারের কানে গেছে বলে মনে হলো না। খানিকটা উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে যেন তাকে। এগারোটা বাজতে আর মাত্র তিন মিনিট বাকি। অ্যাপয়েন্টমেন্টটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তবে বিষয়টা সিনোমাকিকে দ্বিতীয়বার স্মরণ করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না হফার। লোকটা জানে তাকে কি করতে হবে। সেই অনুযায়ী কাজও শুরু করে দিয়েছে সে। উড়ে চলেছে গাড়ি এ মুহূর্তে।

ফ্রিয়েডরিখ্‌ট্রাস পেরিয়ে এসে বাঁয়ে, আনটার ডেন লিনডেনে ঢুকে পড়ল গাড়ি। তারপর এক কিলোমিটার মত এগোতেই হফারের চোখ পড়ল সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা আলোয় উদ্ভাসিত ব্রান্দেনবুর্গ গেটের ওপর। ত্রিশ সেকেণ্ড তখনও বাকি এগোরোটা বাজতে।

'রাখো এখানে,' গেটের পাঁচশো গজ আগে অন্ধকার মত এক জায়গা নির্দেশ

করল কার্ল হফার।

দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ছায়া থেকে বেরিয়ে এল এক লোক। দরজা খুলে দিল হফার, দ্রুত পাশে উঠে পড়ল লোকটা। 'চলতে থাকো,' ঝুঁকে শোফারের কাঁধে টোকা দিল হফার। সুইচ টিপে মাঝের গ্লাস পার্টিশনটা তুলে দিল। তারপর পাশে তাকাল। আগন্তুক প্রায় তার মতই খাটো। তবে শুকনো। নাম আলেক্সেই সুরাকভ। লোকটা কেজিবির কর্নেল।

'এবার ফাইন্যাল আলোচনাটা সেরে ফেলা যেতে পারে,' গম্ভীর মুখে বলল কার্ল হফার। 'আর দেরি করতে রাজি নই আমি। তবে আগেই বলে রাখি, আরও কয়েকটা দেশের সঙ্গে কথা বলেছি আমি। যে হাইয়েস্ট বিডার হবে, তার কাছেই বেচব আমি ওটা।'

'আমাদের আলোচনা শোফার শুনতে পাবে না তো?' প্রশ্ন করল লোকটা চোস্ত জার্মানে।

'না। পার্টিশনটা সাউণ্ড-কাম-বুলেট প্রুফ।'

একটু ইতস্তত করল সুরাকভ। 'মস্কোর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে আমার। ওদের ধারণা, কোড ব্রেক না করা পর্যন্ত ওই ফর্মুলার কোন মূল্য নেই।'

'ঠিক। সে জন্যে ওটা ডিকোড করে বিক্রি করার প্রস্তাবই দিয়েছিলাম আমি।'

'আপনি কি সত্যিই মনে করেন কাজটা আপনি পারবেন?'

শীতল, পাথুরে চোখে সুরাকভকে দেখল হফার কয়েক মুহূর্ত। 'আপনি কি সত্যিই মনে করেন কাজটা পারব না জেনেও আমি আপনাকে অফার করেছি? ফ্রন্টিয়ার ঠেঙিয়ে এতদূর ছুটে এসেছি আপনার সঙ্গে মশকরা করতে?'

থতমত খেয়ে গেল কর্নেল। 'না না! আমি ঠিক সেভাবে মীন করিনি, হের হফার।'

'আমি আপনাকে ডিকোডেড ফর্মুলার প্রস্তাবই দিয়েছি। ওটা আপনাদের সন্তুষ্ট করতে পারলে তবেই টাকা দেয়ার প্রশ্ন আসবে।' চুরুটের মাথার আগুন দেখল হফার কিছুক্ষণ। 'অবশ্য কত অফার করছেন, শুনে আগে আমাকে সন্তুষ্ট হতে হবে। বলে ফেলুন, কত?'

'ওয়েল। আমাকে বলতে বলা হয়েছে পাঁচ মিলিয়ন ডলার।'

চুপ করে থাকল হফার। রাগে সারা শরীর জ্বলছে তার। ইচ্ছে হলো ঘাড় ধরে ঠেলে নামিয়ে দেয় লোকটাকে। 'আপনি সিরিয়াস?' বহু কষ্টে উচ্চারণ করল সে। অন্ধকারে তার মুখভাব দেখতে পেল না সুরাকভ।

'হ্যাঁ। তবে টাকা দেয়ার আগে ওটা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হবে আমাদের।'

'তাতে অসুবিধে নেই। এক সপ্তাহ সময় পাবেন সে জন্যে আপনারা।'

'কিন্তু আমরা কি করে নিশ্চিত হব যে ওই ফর্মুলা আর কাউকে বিক্রি করবেন না আপনি?'

'কার্ল হফার যে এ-জাতীয় ডিল নিয়ে কখনও বেঈমানি করে না, সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে হলে কিছুকাল অপেক্ষা করা ছাড়া কোন উপায় নেই আপনাদের।

মনে রাখবেন, ওটা কিনতে আপনাদের আমি বাধ্য করছি না। আরও অনেক পার্টি আছে, যে এসব নোংরা প্রশ্ন না তুলে বিশ্বাস করে কিনতে চাইবে, তাকেই দেব আমি জিনিসটা।'

খানিক ভাবল সুরাকভ। তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'দুঃখিত, ঠিক আছে। তাই হবে। আপনি তাহলে রাজি?'

'রাজি? তাই বলেছি নাকি?'

বিস্ময় ফুটল কর্নেলের কণ্ঠে। 'কিন্তু এই যে আপনি বললেন!'

'উঁহুঁ! ও আপনার বোঝার ভুল। আমি যা বললাম তা বিক্রির শর্তাবলী কেবল। ওগুলোর ব্যাপারে সবে একমত হয়েছি আমরা। এবার আমি আমার দাবি জানাব। তবে তার আগে আপনাকে জানিয়ে রাখা ভাল, বেইজিং এর বিনিময়ে পনেরো মিলিয়ন দিতে এক পায়ে খাড়া।'

সোজা হয়ে গেল সুরাকভ। 'পনেরো মি-লি-য়-ন! অসম্ভব!'

'তাই মনে হয় আপনার?' ঠাণ্ডা স্বরে বলল কার্ল হফার। 'কিন্তু ওরা তা মনে করে না।'

'এত অফার করার পরও রাজি হননি আপনি?' চুলের সীমানায় পৌঁছে গেছে লোকটার দুই ভুরু।

'নাহ্!'

'কেন? মানে...।'

'কারণ আমি চাই পুরো পঁচিশ মিলিয়ন।'

তাড়াতাড়ি রুমাল বের করে ঘাম মুছতে আরম্ভ করল সুরাকভ। অঙ্কটা শুনে ভিরমি খাওয়ার দশা হয়েছে তার। চক্কর দিয়ে উঠেছে মাথা। হতাশা মাখা কণ্ঠে কোন রকমে বলল সে, 'আমার সরকার কখনও এতে রাজি হবে না। এমন সীমা ছাড়া দাবি...'

'ভুল। বিনিময়ে যা অর্জন করতে পারে সোভিয়েত ইউনিয়ন, সেটাই বরং হবে সীমা ছাড়া প্রাপ্তি। তার কাছে এ অঙ্ক কিছুই না। কিচ্ছু না। যাই হোক, আমাদের আলোচনা তাহলে এখানেই শেষ হোক।' একটা হ্যাণ্ড সেট মুখের কাছে তুলে আনল কার্ল হফার। 'গাড়ি রাখো,' নির্দেশ দিল সে শোফারকে। সঙ্গে সঙ্গে থেমে পড়ল রোলস রয়েস। সুরাকভের দিকের দরজা খুলে ফেলল জার্মান। পরিষ্কার ইঙ্গিত চোখেমুখে, বেরিয়ে যাও।

কিন্তু তার কোন লক্ষণ দেখা গেল না লোকটার মধ্যে। 'আপনি তাহলে দামের ব্যাপারে আর কোন...'

'সরি। পঁচিশই আমার প্রথম, শেষ এবং একমাত্র ডিম্যাণ্ড।'

'আপনি...আমি, মানে, আজকের রাতটা এখানেই কোন হোটেলে থেকে যান না হয়, হের হফার? আমি দেখি এমব্যাসির সঙ্গে কথা বলে কিছু করা যায় কি না।'

'দুঃখিত। আপনাদের এইসব থার্ড ক্লাস হোটেলে রাত কাটানোর ইচ্ছে নেই আমার। ব্রিস্টল হোটেলে আছি আমি। দেখুন কথা বলে রাজি করাতে পারেন কি

না। এখন থেকে দু'ঘণ্টার মধ্যে উত্তর জানতে চাই আমি। যদি আপনার সাড়া না পাই, ধরে নেব আলোচনা খতম। অল রাইট?'

ইতস্তত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল সুরাকভ। 'ঠিক আছে।' বেরিয়ে পড়ল সে, দু'চোখে জ্বলজ্বল করছে ঘৃণার আগুন।

দরজা বন্ধ করে মাঝের পার্টিশন নামিয়ে দিল হফার। 'সোজা ফ্রান্টিয়ার।'

পাঁচ মিনিট পর চেকপয়েন্ট চার্লি পৌছল গাড়ি। সময়টা কর্নেল সুরাকভের জন্যে যথেষ্ট। ফোন করে এদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে রেখেছে সে মিনিট তিনেক আগেই। সেই থেকে প্রস্তুত হয়েই আছে এরা হফারকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে।

ব্যারিকেডের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল সিনোমাকি। এখানে হফারের প্রচুর সময় নষ্ট করল পুব জার্মান অফিশিয়াল। পাসপোর্ট দুটো দেখতেই ঝাড়া পনেরো মিনিট পার করে দিল সে। অলস ভঙ্গিতে বই দুটো খুলছে, মেলছে, আনমনে পাতা ওল্টাচ্ছে। থেকে থেকে হাই তুলছে। ত্রিশ মিনিট পর, অনেকটা যেন দয়া করে সীল মারল লোকটা ওগুলোয়। তারপর পিত্তি জ্বালানো হাসির সঙ্গে হাত ইশারায় এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিল শোফারকে।

অসহ্য রাগে ভেতরে ভেতরে তড়পাচ্ছে কার্ল হফার। কেন এসব ঘটছে বুঝতে বাকি নেই তার। গাড়িতে উঠে দড়াম করে দরজা আছড়ে লাগাল সে। এ মাথায় এসে থামতে হলো আবার। ফারের টুপি পরা দুই গার্ড এগিয়ে এল। ওদের দু'জনকে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি চেক করতে আরম্ভ করল তারা। উপায় নেই। নিজেকে গরম রাখার জন্যে হাঁটাহাঁটি করতে লাগল হফার। কিন্তু তাতেও বাধা পড়ল। ছুটে এল শোফার।

'মাফ করবেন, স্যার। ওরা আপনাকে ডাকছে।'

খ্যাঁক করে উঠল হফার। 'কারা?'

'গার্ড, স্যার।'

'কেন?'

'একটু আসুন, স্যার।'

গাড়ির কাছে চলে এল সে। জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল গার্ড দুটোর দিকে।

'ওটা কি?' ফ্ল্যাশ লাইটের বীম ছুঁড়ে ড্যাশবোর্ডের নিচে ফিট করা বড়সড় হিটারটা দেখাল একজন। বেজায় গম্ভীর।

'ওটা হিটার।'

'চেক করে দেখা দরকার। খুলে নামাতে হবে ওটা।'

'কি বলছেন আপনি! খুলে নামাতে হবে মানে? ওটা হিটার, ওর মধ্যে কিছু লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছি না আমি।'

'চেক করে দেখা দরকার। খুলে নামাতে হবে ওটা,' একঘেয়ে সুরে পুনরাবৃত্তি করল গার্ড।

অসহায়ের মত সিনোমাকির দিকে ফিরল কার্ল হফার। 'তুমি পারো ওটা খুলতে?'

'পারি, স্যার। তবে সময় লাগবে।'

'খোলো! দেখাও খুলে।' পিছনে উঠে বসল সে। পাইলট ল্যাম্প জ্বেলে ফাইল দেখায় মন দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করল কিছুক্ষণ। রক্ত টগবগ করছে তার। ঝাঁ ঝাঁ করছে কান-মাথা। নিজেকে সামলে রাখতে প্রচুর এনার্জি ক্ষয় হচ্ছে হফারের। কিন্তু উপায় নেই। এদের সঙ্গে মেজাজ দেখানো চলবে না কোনমতেই। নো ম্যানস ল্যাণ্ডে রয়েছে এখন সে, যেখানে তার মত টাকার কুমিরের চেয়ে এই দুই সেপাইর ক্ষমতা অনেক অনেক বেশি।

বিশ মিনিট চেষ্টার পর সবে হিটারটা নামিয়ে এনেছে সিনোমাকি, এমন সময় আরেকটা গাড়ি এসে দাঁড়াল পাশে। কর্নেল আলেক্সেই সুরাকভ নামল ভেতর থেকে। হাত ইশারায় গার্ড দুটোকে অনেকটা 'দূর হয়ে যাও' ধরনের ইঙ্গিত করল সে। পলকে হিটার চেক করার উৎসাহ হারিয়ে ফেলল তারা। একটা কথাও না বলে অ্যাবাউট টার্ন করে কাছের ঘরটার দিকে পা বাড়াল।

এদিকে অনুমতির তোয়াক্কা না করে রোলসের পিছনের আসনে উঠে বসল সুরাকভ। এত শীতেও ভীষণভাবে ঘামছে সে। 'আমি দুঃখিত, হের হফার। বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই দেরি করিয়ে দিতে হলো আপনাকে। সে যাক, আমরা রাজি। পুরো পঁচিশ মিলিয়নই দেয়া হবে আপনাকে ডিকোডেড এমসিজেড ফর্মুলার জন্যে। আর পেমেন্টের শর্ত সম্পর্কে আপনি যা যা বলেছেন, সে ব্যাপারেও আমাদের দ্বিমত নেই।'

কথা বলল না কার্ল হফার। মুখও তুলল না। একমনে ফাইলে চোখ বোলাচ্ছে। ঘামার জন্যে পুরো পাঁচ মিনিট সময় দিল সে লোকটাকে। তারপর ব্রিফকেসে ফাইল পুরে চোখ তুলল। দু'চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে তার।

'এই অসহ্য ঠাণ্ডার মধ্যে এক ঘণ্টা আটকে রাখা হয়েছে আমাকে। অনর্থক কষ্ট দেয়া হয়েছে। এই অপরাধে ওর সঙ্গে আরও পাঁচ মিলিয়ন ডলার ফাইন দিতে হবে আপনাকে। তিরিশ মিলিয়নের এক পয়সা কমে বেচব না আমি ওটা, বুঝতে পেরেছেন? যান, টেলিফোনে কথা বলুন আবার এমব্যাসির সঙ্গে। ওদের বলুন, আপনার মত এক লোয়ার ক্লাস সিভিল সার্ভেন্ট আমার সময় নষ্ট করার স্পর্ধা দেখিয়েছে বলে দাম চড়িয়ে দিয়েছি আমি। যান! আউট!'

যতটা না অবাক হলো সুরাকভ, তার চেয়ে বেশি পেল ভয়। কয়েক মুহূর্ত হাঁ করে চেয়ে থাকল সে হফারের অগ্নিমূর্তির দিকে, তারপর ছিটকে বেরিয়ে গেল গাড়ি থেকে। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল একটা কাঠের ঘরের উদ্দেশে। পনেরো মিনিট পর বেরিয়ে আসতে দেখা গেল তাকে। পা ফেলছে এলোমেলো, ঝুলে পড়েছে দু'কাঁধ। জানালার কাছে এসে ঝুঁকে দাঁড়াল সে। ঘামে চকচক্ করছে সারা মুখ।

'হ্যাঁ,' কোনমতে বলল সুরাকভ। 'আমরা...আমরা রাজি। তিরিশ মিলিয়ন।'

কাঁচ তুলে দিয়ে সামনে তাকাল কার্ল হফার। শোফারকে বলল, 'সোজা হোটেল।' নিরাপদে ব্যারিকেড পেরিয়ে আসতে পেরে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল জার্মান। হুমকি-ধামকি যতই দেখাক, মনে মনে বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিল। ভয় হচ্ছিল শেষ

পর্যন্ত সুরাকভ হয়তো ছুতোনাতা দেখিয়ে আটকে দেবে তাকে। চাইলে তা সে পারত। কিন্তু ভরসা ছিল, আসল জিনিস হাতে না পাওয়া পর্যন্ত ওদের লেজ যতই মাড়াক হফার, সহ্য করে যাবে ব্যাটারা অসহ্য হলেও। হলোও তাই।

মুখে পরিতৃপ্তির হাসি ফুটল হফারের। আচ্ছামত কান মলে দেয়া গেছে ব্যাটাদের। সঙ্গে বাড়তি পাঁচ মিলিয়ন ডলার। মন্দ কি?

প্যারিস। রাত এগারোটা। সাবধানে দরজা খুলে করিডরে চোখ বোলাল আলেক ওয়াটসন। নেই কেউ। কারও গলা বা পায়ের আওয়াজও শোনা যাচ্ছে না। নিশ্চিত হয়ে পিছিয়ে এল সে। 'যাও, জলদি!' পিছন ফিরে বলল ওয়াটসন।

স্লিম ফিগারের সোনালি চুলো এক তরুণ বেরিয়ে পড়ল তার গা ঘেঁষে। টাইট ফিট জিনস্ আর কালো উইণ্ড চিটার পরে আছে সে। চেহারা অত্যন্ত আকর্ষণীয়। নাম মিশেল। বেরিয়ে যাওয়ার সময় ওয়াটসনের দিকে তাকিয়ে কেমন এক অদ্ভুত হাসি দিল তরুণ। দরজা বন্ধ করে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে লাগল ওয়াটসন। কেন হাসল ছেলেটা ওভাবে? কি অর্থ ওই হাসির?

আলেক ওয়াটসনের বয়স ত্রিশ। দীর্ঘদেহী, হ্যাণ্ডসাম। চোখ দুটো ভাসা ভাসা। ইটনের ব্রিলিয়ান্ট ব্যাকগ্রাউণ্ড আছে তার। বর্তমানে চাকরি করে ওয়াশিংটন ডিসিতে, ইউএস অর্ডন্যান্স রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রধান ম্যাক্স অলব্রাইটের ব্যক্তিগত সচিব। দু'সপ্তাহ হলো চীফের সঙ্গে প্যারিস এসেছে সে। ন্যাটো জোটভুক্ত দেশগুলোর কনভেনশনাল আর্মস্ অ্যাণ্ড অ্যামিউনিশন সম্পর্কিত পক্ষকালব্যাপী এক সম্মেলনে যোগ দিতে।

আর দু'দিন পর শেষ হবে সম্মেলন। ওয়াশিংটন ফিরে যাবে আলেক ওয়াটসন। কেন হাসল মিশেল? ভাবতে ভাবতে ককটেল কেবিনেটের উদ্দেশে পা বাড়াল সে। কিন্তু টেলিফোনের আওয়াজে থামতে হলো। 'হ্যালো।'

'আলেক ওয়াটসন?'

শোনামাত্র কণ্ঠধারীকে চিনতে পারল ওয়াটসন। লোকটার নাম জেরি লাটিমার। আমেরিকান। দু'দিন আগে এখানেই পরিচয় হয়েছে তার সঙ্গে। বিরাট পয়সাওয়ালা মানুষ। জর্জ ভি হোটেলের লাক্সারি স্যুইট ভাড়া করে থাকে। বসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে ভদ্রলোকের। প্রথম আলাপেই অমায়িক মানুষটিকে ভাল লেগে গেছে ওয়াটসনের।

'হাই দেয়ার, জেরি! কি মনে করে?'

'তোমার সঙ্গে খুব জরুরী একটা দরকার আছে। একবার আসতে পারবে আমার হোটেলে?'

ভুরু কুঁচকে উঠল ওয়াটসনের। 'এত রাতে?'

'হ্যাঁ। খুবই জরুরী।'

'ব্যাপারটা কি নিয়ে কিছু আভাস...?'

'সেটা ঠিক হবে না। তুমি বরং চলেই এসো।'

'বেশ.' একটু ইতস্তত করে রাজি হয়ে গেল আলেক ওয়াটসন। ভাবল হয়তো

গেল কোন চাকরির অফার দেবে সে। বলা যায় না, বড়লোক মানুষ। এদের মতিগতিই আলাদা। যখন যে ভূত মাথায় চাপে···। 'আসছি।'

গতকাল লাটিমারের সঙ্গে লাঞ্চ করেছে সে বিখ্যাত এক রেস্তোরাঁয়। নিমন্ত্রণটা সে-ই করেছিল। খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে ওদের। সে সময় আকারে ইঙ্গিতে এমনই এক প্রস্তাব প্রায় দিয়েই ফেলেছিল লোকটা। দেরি না করে বেরিয়ে পড়ল ওয়াটসন।

'মিস্টার জেরি লাটিমারের সঙ্গে দেখা করতে চাই,' জর্জ ভি হোটেলের কনশিয়ার্যকে বলল সে।

মুখ তুলল লোকটা। 'মঁশিয়ে আলেক ওয়াটসন?'

'হ্যাঁ।'

'সোজা ফোর্থ ফ্লোরে উঠে যান, মঁশিয়ে। স্যুইট নাম্বার ফোর সেভেন। উনি আপনাকে আশা করছেন।'

'ধন্যবাদ।'

দু'মিনিট পর নির্দিষ্ট স্যুইটের বন্ধ দরজায় নক করল আলেক ওয়াটসন। কিন্তু যে দরজা খুলল, সে জেরি লাটিমার নয়। লোকটা জাপানি। জীবনেও কখনও তাকে দেখেনি সে। সসম্মানে নড করল সিনোমাকি। 'আসুন, প্লীজ, মঁশিয়ে।'

'মিস্টার জেরি···?'

শুনতে পায়নি হয়তো জাপানি। তাকে ইতস্তত করতে দেখে আবার আহ্বান জানাল। 'আসুন!'

পথ দেখিয়ে তাকে বিশাল এক সেলুনে এনে বসাল সিনোমাকি। চারদিকে বিলাস আর জৌলুসের ছড়াছড়ি দেখে দম আটকে এল ওয়াটসনের। অভিভূতের মত এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল সে। এই ফাঁকে তাকে ফেলে সটকে পড়ল জাপানি। ঘর দেখায় এতই মগ্ন ওয়াটসন যে কার্ল হফারের প্রবেশ টেরই পেল না। লোকটার ওপর হঠাৎ করেই চোখ পড়ল তার।

'আলেক ওয়াটসন?'

লোকটাকে দেখামাত্র কেমন এক অস্বস্তিতে পড়ে গেল ওয়াটসন। অমন করে চেয়ে আছে কেন মানুষটা তার দিকে? কে এ লোক? জেরি-ই বা গেল কোথায়?

'হ্যাঁ।'

একটা পেট মোটা খাম এগিয়ে দিল কার্ল হফার। 'এগুলো দেখুন!'

ওটা নিল ওয়াটসন। কিন্তু খুলল না তখনই। 'আপনাকে ঠিক চিনতে পারলাম না। আমি জেরি লাটিমারকে আশা করছিলাম। উনি···'

প্রায় ধমকে উঠল হফার। 'অহেতুক সময় নষ্ট করবেন না! যা বলছি তাই করুন। দেখুন ওগুলো।'

খাম থেকে ছয়টা গ্লসি ফটো বেরোল। ওর দুটোর ওপর চোখ বুলিয়েই জমে গেল ওয়াটসন। নোংরা অঙ্গভঙ্গির, দেখার-অযোগ্য ছবি সবগুলো। ওর একজন ওয়াটসন স্বয়ং, অন্যটা মিশেল। ক্ষণিকের জন্যে থেমে গেল তার হৃৎপিণ্ডের গতি, পর মুহূর্তেই শুরু হলো দ্বিগুণ বেগে। দেখতে দেখতে মুখমণ্ডল ভিজে উঠল ঠাণ্ডা

খামে। কাঁপা হাতে ছবিগুলো খামে ভরে ফেলল ওয়াটসন, বাকি চারটে দেখার প্রয়োজন মনে করল না।

এর মধ্যেই গায়ে জ্বর উঠে গেছে তার। অপ্রত্যাশিত ধাক্কাটা সামলে ওঠার পর প্রথম যে ভাবনাটা এল মাথায়, তা হলো, শেষ হয়ে গেছি আমি। আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই আমার। লোকটার কর্কশ কণ্ঠে চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল আলেক ওয়াটসনের। 'খামের উল্টো পিঠে কয়েকটা নাম লেখা আছে, ওগুলোও পড়ুন।'

নিশ্চল বসে থাকল ওয়াটসন, তাকাচ্ছে না লোকটার দিকে। আসলে সাহস হচ্ছে না। মাথা ঘুরছে তার। বমি করতে পারলে বোধহয় শান্তি হত কিছুটা।

'পড়ুন!'

আস্তে আস্তে খামটা ওল্টাল ওয়াটসন। সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা আছে কয়েকটা নাম। যাদের সবাই তাকে অন্তর দিয়ে ভালবাসে। স্নেহ করে, শ্রদ্ধা করে। তাদের সবার নাম আছে এখানে। তার দাদী, তার মা, ছোট বোন, হ্যারি স্টুয়ার্ট; তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আরও আছেন ফাদার ম্যাথিউস, যিনি খ্রিস্টমতে অবগাহন করিয়েছিলেন ওয়াটসনকে। আছেন তার ইটনের ব্যাডমিন্টন কোচ...এবং তার বস্, ম্যাক্স অলব্রাইট।

কাজের কথা পাড়ল এবার কার্ল হফার। 'ফর্মুলা এমসিজেডের একটা কপি চাই আমার। আপনি ওটা জোগাড় করে দেবেন। যদি না দেন, এই ছবিগুলোর প্রত্যেকটার একটা করে কপি যার যার নাম আছে ওখানে, তাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়া হবে।'

হাজার ভোল্টের বৈদ্যুতিক শক্ খেল যেন আলেক ওয়াটসন। আপাদমস্তক কেঁপে উঠল সে কথাটা কানে যাওয়া মাত্র। বহু কষ্টে নিজেকে সামাল দিল সে। 'কিন্তু...আপনি নিশ্চয়ই জানেন ওই ফর্মুলার এক পয়সাও দাম নেই, যতক্ষণ না ওটা...। এ তো সবাই জানে। আপনি আমাকে...'

'দাম আছে কি নেই সে আমি বুঝব। আপনাকে যা বললাম, তাই করবেন আপনি।' পকেট থেকে একটা মিনি ক্যামেরা বের করল কার্ল হফার। 'এটা সম্পূর্ণ অটোমেটিক ক্যামেরা। ম্যাক্স অলব্রাইটের অফিসে আছে ফর্মুলার কপি। ওগুলো টেবিলে বিছিয়ে এক হাত দূর থেকে তুলতে হবে ছবি। আগামী ছাব্বিশ তারিখ, রাত আটটায় ছবি নিয়ে ওয়াশিংটনে হিলটন হোটেলে জেরি লাটিমারের সঙ্গে দেখা করবেন আপনি। যদি না আসেন...।' কথা শেষ না করে থেমে গেল হফার। কাঁধ ঝাঁকাল।

'এই...' মুখের ঘাম মুছল আলেক ওয়াটসন। 'এগুলো...মানে, ছবিগুলো আপনি কোথায় পেলেন!'

'মিশেলের মত কিছু চিড়িয়া পুষতে হয় আমাকে বেতন দিয়ে। ওরাই এসব সামলায়। ওয়েল, এবার যেতে পারেন আপনি।'

# চার

হিলটন হোটেল। ওয়াশিংটন ডিসি। ফয়েই-এর এক কোণে বসে আছে জেরি লাটিমার। পুরু, টিনটেড গ্লাসের লম্বা দেয়ালের ওপাশে, হোটেলে প্রবেশ পথের দিকে চেয়ে আছে সে। আটটা বাজতে চলেছে। যে-কোন সময় এসে পড়বে আলেক ওয়াটসন। অন্তত কথা আছে আসার। আসতে পারে।

বসের মত জেরি লাটিমারও ব্যস্ত মৌমাছি। আজ এদেশ কাল ওদেশ করে বেড়ায়। থাকে সেরা হোটেলে, কার্ল হফারের পয়সায় অবশ্যই। খরচ করে দেদারসে। ফলে সহজেই সবার নজর কাড়তে সক্ষম হয় লাটিমার, বিশেষ করে সমাজের উঁচু শ্রেণীর। এত বড় একজন 'আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ীর' সুনজর কে না কামনা করে?

যে সব দেশে আসা-যাওয়া লাটিমারের, সবখানেই এলিট শ্রেণীর এক দঙ্গল শুভাকাঙ্ক্ষী আছে তার। এদের মাধ্যমে সরকারী-বেসরকারী উঁচু মহলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখে লাটিমার। প্রয়োজনের সময় কাজে লাগায়। অত্যন্ত কঠিন কাজও পানির মত সোজা হয়ে যায়।

ঠিক আটটায় গেট দিয়ে একটা ট্যাক্সি ঢুকল ভেতরে। উৎসুক হয়ে উঠল লাটিমার। সোজা হয়ে বসল। পোর্চে এসে দাঁড়াল ওটা। খুলে গেল পিছনের দরজা। হ্যাঁ! এসে গেছে আলেক ওয়াটসন। ভাড়া মিটিয়ে ফয়েই-এ ঢুকে পড়ল সে। ডেস্কে লাটিমারের খোঁজ জানতে চাইল, হাত ইশারায় ক্লার্ক দেখিয়ে দিল কোথায় তাকে-পাওয়া যাবে। ঘুরে পা বাড়াল ওয়াটসন। তার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে হাত নাড়ল লাটিমার। দেখেও পাত্তা দিল না আলেক। কাছে এসে মুখোমুখি বসল।

নীরবে তাকে পর্যবেক্ষণ করল জেরি। আলাপ জমানোর চেষ্টা করে লাভ নেই, জানে সে। কারণ অন্যদিনের আর আজকের সাক্ষাতের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। তাছাড়া তার দরকারও নেই। চেহারা এই ক'দিনেই বেশ শুকিয়ে গেছে ওয়াটসনের। গর্তে বসে গেছে চোখ। নিচে গাঢ় কালসিটে। নিশ্চয়ই আত্মগ্লানিতে ভুগছে যুবক। বরবাদ হয়ে গেছে মনের শান্তি, ঘুম।

'তুমি ব্যর্থ হওনি আশা করি?' বলল সে।

'তোমার জিনিস নিয়ে এসেছি,' কর্কশ, অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল ওয়াটসন। 'ওটা নিয়ে ছবিগুলো দিয়ে দাও।'

'নিশ্চই। এসো আমার সঙ্গে।'

'কোথায়!'

'আমার স্যুইটে। আগে নেগেটিভগুলো ডেভেলপ করে শিওর হতে হবে আমাকে। একটু সময় লাগবে অবশ্য। এসো।'

আধ ঘণ্টা পর, টেম্পরারি ডার্ক রুম, অর্থাৎ বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল লাটিমার হাত মুছতে মুছতে। সন্তুষ্ট। পকেট থেকে ছবি ভরা খামটা বের করে এগিয়ে দিল ওয়াটসনের দিকে। 'এই নাও।'

ভেতরে নেগেটিভ ছয়টা আছে কি না দেখল ওয়াটসন। 'এগুলোর কোন কপি তোমরা রেখেছ কি না বুঝব কি করে?'

অমায়িক হাসি ফুটল লাটিমারের মুখে। 'যে জন্যে কাজটা করতে হয়েছে, সে কাজ হয়ে গেছে। কাজেই ওতে আমাদের আর কোন আগ্রহ নেই। বিশ্বাস করতে পারো তুমি। আমরা আর যা-ই করি, প্রতারণা করি না।'

খানিক চিন্তা করল আলেক ওয়াটসন। 'ওই ফর্মুলা কোন কাজে আসবে না তোমার, তাই দিলাম। নইলে দিতাম না। মরে গেলেও না।'

'তা আমিও জানি। যাই হোক, ভুলে যাও। আমার প্রিন্সিপাল এটা চান। এ জিনিস তাঁর কি কাজে লাগবে, তা তিনিই জানেন। আমাদের মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। তোমার জিনিস তুমি পেয়ে গেছ। অতএব, দ্য ম্যাটার ইজ ক্লোজড্। ধন্যবাদ।'

খামটা পকেটে পুরে ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল আলেক। ওদিকে দরজা বন্ধ করে টেলিফোনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল লাটিমার। 'মিস্টার ক্যাগার আছেন, প্লীজ?'

'ইয়েস, স্যার। এক মিনিট।'

অতক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। দশ সেকেণ্ড পর কর্কশ একটা কণ্ঠ বলল, 'ক্যাগার।'।

'রওনা হয়ে গেছে।'

'অল রাইট।'

পোর্টারের ইশারায় স্ট্যাণ্ড থেকে দ্রুত এগিয়ে এল একটা ট্যাক্সি। দাঁড়াল আলেক ওয়াটসনের সামনে। ড্রাইভারকে নিজের ঠিকানা জানিয়ে উঠে পড়ল সে। সবে দশ গজ এগিয়েছে ট্যাক্সি, এই সময় রাস্তার ওপাশের পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ফোর্ড থাণ্ডারবার্ড স্টার্ট নিল। বেরিয়ে এসে পিছু নিল ওটার।

ড্রাইভিং সীটে রয়েছে চব্বিশ-পঁচিশ বছরের এক যুবক। শিশুসুলভ আকর্ষণীয় চেহারা, ঘাড় পর্যন্ত দীর্ঘ সোনালি চুল। ডিমের মত লম্বাটে মুখ। পাতলা ঠোঁট। নাকের খুব কাছাকাছি বসানো সবুজ চোখ দুটোর চাউনি সাপের মত স্থির, অস্বস্তিকর। নাম ডজ, জ্যাক ডজ। তার পাশে আরেকজন আছে। ডজের চেয়ে বয়সে দশ-বারো বছরের বড় সে।

এর বাঁ চোখটা কাঁচের। ওটার নিচ থেকে থুতনি পর্যন্ত লম্বা একটা কাটা দাগ। চেহারাই বলে এ লোক ভয়ঙ্কর হিংস্র। করতে পারে না এমন কাজ নেই। এর নাম ক্যাগার। আলেক্স ক্যাগার। এরা দু'জন জেরি লাটিমারের রোবট। বোধহীন, বিবেকহীন। কাজ যত কঠিনই হোক, পিছপা হতে জানে না এরা। সে-কারণে টাকাও পায় তেমনি। রীতিমত রাজার হালে থাকে ডজ-ক্যাগার জুটি। দামী গাড়ি চড়ে। পোশাক পরে দামী। পকেটে সব সময় কড়কড় করে নতুন

নোটের তাড়া।

সামনের ট্যাক্সিতে গা এলিয়ে বসে আছে আলেক ওয়াটসন। ভেবেছিল ছবি আর নেগেটিভ হাতে পেলে বুঝি মনে শান্তি আসবে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে উল্টোটা ঘটছে। আরও বেশি অশান্তি লাগছে। জোনাথন লিণ্ডসের অধীনে অনেক দিন থেকে কাজ করছে, বসের খুবই বিশ্বস্ত আলেক। তাঁর সমস্ত গোপনীয় দলিল আলেকই সংরক্ষণ করে। কাজেই ফর্মুলার ছবি তুলতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হয়নি তাকে। কিন্তু নিজের পিঠ বাঁচাবার ব্যবস্থা হলেও বিবেক রেহাই দিচ্ছে না ওয়াটসনকে। কেবলই খোঁচাচ্ছে।

ওই কোড ওরা ভাঙতে পারবে না, বার বার করে নিজেকে শোনাতে লাগল সে। অসম্ভব! কেউ পারেনি, লাটিমার বা তার প্রিন্সিপাল কি করে পারবে? কিন্তু ওরাও তো জানে তা। তারপরও কেন…? নাকি…? ঠাণ্ডা ঘামে মুখ-কপাল ভিজে উঠল আলেক ওয়াটসনের। ওই ফর্মুলা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ জানে সে। যদি ওরা কোন ভাবে…আর ভাবতে পারছে না ওয়াটসন। মাথা ঘুরছে তার।

অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকের সামনে ট্যাক্সি বিদেয় করল সে। লিফটে করে উঠে এল দশ তলায় নিজের তিন রুমের ফ্ল্যাটে। মন খানিকটা শান্ত হয়েছে ততক্ষণে। নিজেকে সে বিশ্বাস করাতে পেরেছে ওই ফর্মুলার কোড দুনিয়ার কারও পক্ষেই ভাঙা সম্ভব নয়। কারও দ্বারাই নয়, কোন মতেই নয়।

দরজা বন্ধ করে কিচেনে এল ওয়াটসন। খালি একটা বিস্কিটের টিন নিয়ে ফিরে এল সীটিং-কাম-ডাইনিং রুমে। নোংরা ছবিগুলো পুড়িয়ে ফেলতে হবে আগে। তারপর অন্য কাজ। খামটা বের করল সে পকেট থেকে, পর মুহূর্তে দরজায় করাঘাতের আওয়াজে জমে গেল। কে! কয়েক মুহূর্ত বুঝে উঠতে পারল না কি করবে সে। তারপর টিনটা নিয়ে ছুটল কিচেনে। ওটা রেখে পায়ের পাতায় ভর করে দৌড়ে ফিরে এল আগের জায়গায়। খামটা সাঁৎ করে গুঁজে দিল সোফার গদির নিচে।

আবার করাঘাত হলো। টাইয়ের নট ঠিক করে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল আলেক ওয়াটসন। পীপহোলে চোখ রেখে বাইরে তাকাল। জ্যাক ডজকে দাঁড়ানো দেখতে পেল সে। 'কে?'

একটা ওয়ালেট পীপহোলের সামনে তুলে ধরল ডজ। 'এফবিআই। দরজা খুলুন, মিস্টার ওয়াটসন।'

অক্সিজেনের অভাব দেখা দিয়েছে যেন হঠাৎ করে। হাঁসফাঁস শুরু করল আলেক। আতঙ্কে অসাড় হয়ে এসেছে হাত-পা। এফবিআই! কেন? ওরা কি চায় আমার কাছে? চোখের সামনে দরজাটা দুলতে শুরু করল আলেকের।

'দরজা খুলুন!' ধমক লাগাল জ্যাক ডজ। 'হারি আপ!'

নিজের অজান্তেই হাত উঠে গেল আলেকের, চেইন-বোল্ট খুলে দরজা মেলে ধরে শূন্য দৃষ্টিতে সামনে তাকাল সে। পরক্ষণেই হুঁশ হলো তার বুকে শক্ত খোঁচা খেয়ে। প্রথম দর্শনেই তার বদ চেহারা দেখে আলেকের মনে সন্দেহ অবিশ্বাস যাতে না ঢোকে তাই। দরজার পাশে দেয়ালে পিঠ দিয়ে এতক্ষণ নিজেকে লুকিয়ে

রেখেছিল ক্যাগার। মাউজারের নলে পরানো চোখা মাথার সাইলেন্সার দিয়ে আরেক গুঁতো মারল লোকটা। 'ঢোকো ভেতরে!'

'কে…কে! কি চান আপনারা?'

'চ্যাচাবে না!' একচোখে শাসাল ক্যাগার। ঠেলে আলেককে ঘরে ঢুকিয়ে দিল। পিছনে দরজা লাগিয়ে দিল ডজ।

বুক কেঁপে গেল আলেক ওয়াটসনের লোক দুটোর ভাবভঙ্গি দেখে। আতঙ্কের শীতল ঢেউ মেরুদণ্ড বেয়ে ওপরে উঠে আসছে। নিজেকে পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত অক্ষম মনে হলো তার, একটা আঙুলও নড়াতে পারছে না। লবি পেরিয়ে সীটিং রূমে নিয়ে আসা হলো আলেককে। ধাক্কা মেরে বসিয়ে দেয়া হলো একটা পিঠ উঁচু চেয়ারে।

'ছবিগুলো কোথায়?' প্রশ্ন করল ক্যাগার।

'কি! কেন…জেরি ওগুলো…' থেমে গেল আলেক লোকটার এক চোখে হিংস্র জিঘাংসা দেখে।

'কোথায়?'

উপায় না দেখে আঙুল ইশারায় জায়গাটা দেখাল সে। 'ওটার গদির নিচে।'

খামটা বের করল ডজ। ভেতরের ছবি আর নেগেটিভগুলো দেখে নিয়ে সঙ্গীর উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল। তুলে দিল খামটা তার হাতে। তারপর আলেকের অজান্তে তার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। হাতে বেরিয়ে এসেছে ফাঁস পরানো সিল্কের একখণ্ড দড়ি। ফাঁসটা চট করে তার গলায় পরিয়ে দিয়েই হ্যাঁচকা এক টান মারল ডজ, তারপর দড়ির অন্য মাথা দু'হাতে শক্ত করে ধরে সটান চিত হয়ে শুয়ে পড়ল মেঝেতে।

চেয়ার নিয়ে উল্টে পড়ল আলেক ওয়াটসন। সঙ্গে সঙ্গে তার দু'কাঁধে দু'পা তুলে দিল জ্যাক ডজ। দুই পা দিয়ে আলেককে হেঁচড়ে সামনে এগিয়ে আসতে বাধা দিচ্ছে সে। ওদিকে দড়ির প্রান্ত ধরে টানছে সর্বশক্তিতে। ভাল করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্রাণ হারাল ওয়াটসন।

বাথরূম ঘুরে এল আলেক্স ক্যাগার। 'বাথরূমে দরজার সঙ্গে হুক আছে একটা। ধরো, ঝুলিয়ে দিয়ে আসি ওখানে।'

কাজ সেরে সীটিংরূমে ফিরে এল ওরা। খামের একটা ছবি বাছাই করল ক্যাগার, গ্লাস টপ্ সেন্টার টেবিলে রাখল। তারপর বেরিয়ে এল নিঃশব্দে।

প্যারিস। অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে বেরিয়ে এল জাঁ পল। লোকটার উচ্চতা মাঝারি, বয়স পঁয়তাল্লিশের মত। সারাক্ষণ মুখে হাসি থাকে তার। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, মাত্র তিন ইঞ্চি ওপরের চোখ পর্যন্ত কখনোই পৌঁছায় না তা। জাঁ পল কার্ল হফারের প্যারিস এজেন্ট। কাজে কর্মে জেরি লাটিমারের মতই করিৎকর্মা এবং বিশ্বস্ত।

দামী গলোইস সিগারেট ধরাল জাঁ পল। হ্যাটটা মাথায় চেপে বসিয়ে নিয়ে দু'হাত ঢোকাল ওভারকোটের পকেটে। গ্যারাজ থেকে নিজের খুদে সিমকা বের

করে রওনা হয়ে গেল। সন্ধে হয়েছে সবে। রূপসী প্যারিস খুলে বসেছে তার রূপের ডালি। যানবাহনের ভিড় অতিরিক্ত। বিশ মিনিট পর কোয়াই দেস গ্র্যাণ্ডস অগাস্টিনে সিমকার নাক ঢোকাল জাঁ পল।

একটা কারপার্কে গাড়ি রেখে হাঁটতে লাগল রু সেগুইয়ের-এর উদ্দেশে। জায়গাটা কাছেই, সস্তা একটা আবাসিক এলাকা। জায়গামত পৌঁছতে নাকে ভীষণ বদ গন্ধ এল পলের। যেখানে-সেখানে আবর্জনা ফেলে রাখে এরা। ছয় তলা এক নোংরা অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে ঢুকে পড়ল জাঁ পল। লিফ্‌ট নেই। সিঁড়িই ভরসা এখানে। টপ্ ফ্লোরে উঠে এল সে। নক করল বারো। এ লেখা দরজায়। কবুতরের খোপের মত চারটে করে ফ্ল্যাট প্রতি তলায়।

দরজা খুলল মিশেল। নোংরা সিঙলেট আর গা কামড়ে থাকা জিনস তার পরনে। চেহারা মলিন। জাঁ পলকে দেখামাত্র হাসি ফুটল মিশেলের মলিন মুখে।

'মঁশিয়ে পল, আপনি! কী আশ্চর্য! নতুন কোন কাজ পড়েছে বুঝি?'

বতু পাঁঠার গন্ধ আসছে হারামজাদার গা থেকে। নাক কুঁচকে উঠতে গেল জাঁ পলের। কিন্তু কোনরকমে সামাল দিল সে। 'হ্যাঁ।' পা বাড়িয়ে ছোট্ট, উৎকট দুর্গন্ধে ভরা রুমে পা রাখল সে। 'দরজা বন্ধ করে দাও। কথা আছে।'

'নিশ্চই!' দ্রুত নির্দেশটা পালন করল সে। ঘুরে দাঁড়াল। দৃষ্টিতে চিক্ চিক্ করছে লোভ। 'বলুন, মঁশিয়ে!'

ওভারকোটের পকেট থেকে ডান হাত বেরিয়ে এল জাঁ পলের। সাইলেন্সার লাগানো একটা পয়েন্ট টু ফাইভ অটোমেটিক ধরে আছে সে। অবাক হওয়ার সময়ও পেল না মিশেল, তার আগেই দু'দুটো গুলি বিদ্ধ হলো তার হৃৎপিণ্ডে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল জাঁ পল। ওই ঘরে আর কিছুক্ষণ থাকতে হলে নির্ঘাত বমি করে দিত সে।

দশ মিনিট পর ফিরতি পথ ধরল পল।

প্যারাডাইস সিটি, ফ্লোরিডা। পাঁচটা বাজতেই বেরোবার জন্যে তৈরি হলো শিলা ব্রাউন। বাথরুমে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে চুল আঁচড়াল। মুখে হালকা করে পাউডারের পরশ বোলাল। গান গাইছে গুনগুন করে। বেরিয়ে এল সে অফিস বিল্ডিঙ থেকে। জোর পায়ে কার পার্কে চলল।

একুশ-বাইশ বছর বয়স শিলা ব্রাউনের। লম্বা, আকর্ষণীয় ফিগার। একমাথা ঘন কালো চুল। গাল দুটো সামান্য ফোলা ফোলা, রুজ ছাড়াই লাল। আড়াই বছর আগে প্রফেসর মারগুব হোসেনের গবেষণা সহকারী ছিল সে। খুব ভাল মানুষ ছিলেন ভদ্রলোক। এখনও তাঁর কথা মনে পড়ে শিলার, খুব খারাপ লাগে অমন একটা প্রতিভা অকালে স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে গেল বলে।

প্রফেসরের ফর্মুলা এমসিজেড আবিষ্কারের কথা এখনও মনে আছে শিলার। কী এক আবিষ্কার! হঠাৎ কি যে হলো, কথা নেই বার্তা নেই ওয়াশিংটনে ইনস্টিটিউটের হেড অফিসে বদলি করে দেয়া হলো শিলাকে। মাস কয়েক আগে আবার আগের জায়গায় বদলি হয়ে এসেছে সে। কিন্তু বর্তমান চাকরি একেবারে

পানসে লাগে শিলার। জুনিয়র এক বিজ্ঞানীর সহকারী। এটা-ওটা টাইপ করা ছাড়া আর কোন কাজ নেই। বিরক্তিকর।

তবে নিজেকে ব্যস্ত রাখার নতুন এক কাজ জুটেছে ইদানীং শিলার। হঠাৎ করেই প্রেমে পড়েছে সে। ছেলেটি প্যারাডাইস হেরাল্ড পত্রিকার এক স্টার রিপোর্টার। নাম জিম ফ্রিম্যান। যাকে বলে দেখামাত্র প্রেম, তাই ঘটেছে ওদের দু'জনের বেলায়। শিলা-জিম বুঝতে পেরেছে, বিধাতা ওদের সৃষ্টিই করেছেন পরস্পরের জন্যে।

আজ জিম ফ্রিম্যানের ছাব্বিশতম জন্মদিন। এই উপলক্ষে নিজের দুই রুমের অ্যাপার্টমেন্টে ওকে ডিনারের নিমন্ত্রণ করেছে শিলা ব্রাউন। এই প্রথম কাউকে নিজের বাসায় নিমন্ত্রণ করেছে সে। কি কি রান্না হবে, আগেই ঠিক করা আছে। কিছু কিছু জিনিস কিনতে হবে শিলাকে শহর থেকে, তারপর বাসায় ফিরে রান্না, কাজেই দেরি করার উপায় নেই। সাড়ে সাতটায় আসবে জিম, তার আগেই কাজ সেরে তৈরি হয়ে নিতে হবে।

নিজের অস্টিন কূপার নিয়ে বড় রাস্তায় উঠে এল শিলা ব্রাউন, তুফান বেগে ছুটল শহরের দিকে। হাইওয়েতে যানবাহনের প্রচণ্ড চাপ। পর পর তিনটে লেন অতিক্রম করল শিলা, উঠে এল ফাস্ট লেনে। খেয়ালই করেনি একটা ফোর্ড থাণ্ডারবার্ড পিছু নিয়েছে তার। কূপারটাকে একটার পর একটা লেন অতিক্রম করতে দেখে মন্তব্য করল ডজ, 'বাপরে! মেয়ে বটে একখানা!'

'মেয়ে দেখতে হবে না,' খেঁকিয়ে উঠল ক্যাগার। 'ওর গাড়ি আর রাস্তার ওপর চোখ রাখো।'

শহরে ঢোকার মুখেই, হাতের ডানদিকে বিশাল এক দোকান। প্যারাডাইস সেলফ সার্ভিস ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। গাড়ি রেখে ব্যস্ত পায়ে দোকানে ঢুকে পড়ল শিলা ব্রাউন। প্রয়োজনীয় এটা-ওটা কিনে খুদে পুশ-ট্রলি প্রায় ভরে ফেলল দশ মিনিটের মধ্যে। তারপর চলল মিট সেকশনে, শেষ আইটেম মাংস কিনতে।

ব্যাপারটা ঘটল এখানে। হাড়সমেত পছন্দসই ভেড়ার কাঁধের মাংস বাছাই করছে শিলা ব্রাউন, সোনালিচুলো এক যুবকের সঙ্গে আচমকা ধাক্কা লাগল তার।

'মাফ করবেন,' ঘন সন্নিবেশিত সবুজ দুই চোখে লজ্জা পাওয়ার ভঙ্গি ফুটল যুবকের। 'পা পিছলে গিয়েছিল।' দাঁড়াল না যুবক, কথা শেষ করেই বেরিয়ে গেল।

যতক্ষণ দেখা গেল, তাকিয়ে থাকল শিলা তার গমন পথের দিকে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে মাংসের কাউন্টার অ্যাটেনডেন্টের উদ্দেশে বলল, 'দেখলেন? একটু অসতর্ক থাকলে ঠিক আছাড় খেতে হত এত মানুষের সামনে।'

অ্যাটেনডেন্ট অল্পবয়সী, রসিক মানুষ। বলল, 'আমি তো সতর্ক থেকেও পারি না, ম্যাম। যতবার আপনাকে দেখি, ততবারই আছাড় খাই।'

ফিক্ করে হেসে উঠল শিলা ব্রাউন।

ওদিকে দোকানের আরেক প্রান্তে, একটা প্যাকিং বক্সের ওপর বসে আছে স্টোর ডিটেকটিভ, রবসন। কাউন্টারে কাউন্টারে বিরতিহীন ঘুরে বেড়ান,

খদ্দেরদের ওপর নজরদারী করা তার চাকরি। হাঁটতে হাঁটতে পা ধরে এসেছে রবসনের। তাই একটু জিরিয়ে নেয়ার জন্যে বসেছে। পাঁচ মিনিটও হয়নি, কাঁধে শক্ত খোঁচা খেয়ে মুখ তুলল সে। চোখে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যাওয়ার দৃষ্টি।

গালে লম্বা কাটা দাগওয়ালা এক লোক ঝুঁকে আছে তার ওপর। লোকটার বাঁ চোখটা নকল, কাঁচের। 'স্টোর ডিক?' প্রশ্ন করল আলেক্স ক্যাগার।

'হ্যাঁ,' নিজেকে সামলে নিয়েছে রবসন লোকটা দোকানের ম্যানেজার বা মালিক নয় দেখে। 'কেন?'

'ওই মেয়েটাকে দেখো। কস্টিউম জুয়েলারি কাউন্টার ঘুরে এসেছে এইমাত্র। চুরি করেছে মনের সুখে।'

স্প্রিঙের মত লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ডিটেকটিভ। 'কোন মেয়েটা!'

'ওই যে, মাংসের কাউন্টারে। কালো চুল।'

'আপনি চুরি করতে দেখেছেন ওকে?'

'নইলে বললাম কি করে?'

'আসুন আমার সঙ্গে,' হাত ধরে টানল তাকে রবসন।

'কোথায়?'

'ঘটনাটা আপনি দেখেছেন। আপনি না হলে…'

'কে বললে আমি দেখেছি? দেখেছে তো স্টোর ডিক, তুমি,' মারফতি হাসি দিল ক্যাগার। 'যাও। তুমিই নাও ক্রেডিটটা।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল রবসন। তারপর মাথা দোলাল। 'ঠিক। ধন্যবাদ, স্যার।' হন হন করে শিলাকে পাকড়াও করতে ছুটল সে। এই সুযোগে বেরিয়ে পড়ল ক্যাগার। মেয়েটি তখন বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে গাড়ির পাশে পৌঁছে গেছে। ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ওগুলো সাজিয়ে রাখছে পাশের সীটে। এই সময় কাঁধের ওপর হালকা চাপড় পড়ল।

চোখ কুঁচকে ঘুরে তাকাল শিলা ব্রাউন। কঠিন চোখে দেখছে তাকে রবসন। 'দোকানে চলুন, মিস্।'

'কেন?' তাজ্জব হয়ে গেল মেয়েটি রবসনকে অভদ্রের মত তার বাহু ধরে টানতে দেখে।

'কেন তা ভেতরে গেলেই বুঝতে পারবেন।'

ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করল শিলা। 'কে আপনি!' রাগে নাকমুখ লাল হয়ে উঠেছে তার।

'স্টোর ডিক।'

থতমত খেয়ে গেল শিলা। 'ডিক! কিন্তু আমাকে কেন… কি করেছি আমি?'

'কথা বাড়াবেন না, মিস্। তাহলে পুলিস ডাকতে বাধ্য হব আমি।'

ওরা কথা কাটাকাটি করছে, এই সময় সেখানে হাজির হলো পুলিসের এক পেট্রলম্যান। এই দোকানের পার্কিং এরিয়ায় একটা অটোমেটিক কোক মেশিন আছে, ওখানে যাওয়ার ইচ্ছে। কিন্তু ওদের উত্তেজিত কথাবার্তার আওয়াজে আকৃষ্ট হয়ে থমকে দাঁড়াল লোকটা। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল। 'কি হচ্ছে এখানে?'

'দেখুন, সার্জেন্ট,' ফুঁসে উঠল শিলা ব্রাউন। 'শুধু শুধু এই লোকটা…'

'শুধু শুধু নয়, সারজ,' ব্যাখ্যা করল রবসন। 'আমি স্টোর ডিক। এই মহিলা দোকান থেকে বেশ কিছু জিনিস হাতিয়েছে।'

'রিয়েলি?' ভুরু নাচাল পেট্রলম্যান।

'অফ কোর্স। এখনই প্রমাণ করে দেব আমি।'

'অল রাইট, মিস,' বলল সার্জেন্ট। 'চলুন, ভেতরে চলুন।'

'আমি চুরি করিনি!' চেঁচিয়ে উঠল শিলা। 'মিথ্যে বলছে লোকটা!'

'বেশ তো। ও যদি মিথ্যে বলে, তাহলে ওকেই ধরব আমি আপনাকে হয়রানি করার অভিযোগে। চলুন।'

দু'মিনিট পর, ম্যানেজারকে কপাল কুঁচকে চেয়ে থাকতে দেখা গেল রবসনের দিকে। 'তুমি দেখেছ চুরি করতে?'

মুহূর্তখানেক ইতস্তত করল রবসন। 'হ্যাঁ…দেখেছি।'

'বাজে কথা!' রাগে দিশে হারিয়ে ফেলেছে শিলা ব্রাউন। কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। 'জুয়েলারি কাউন্টারে আমি মোটেই যাইনি!'

দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগল ম্যানেজার কিছুক্ষণ। তার মনে হলো মেয়েটি সত্যিই বলছে। শেষ সময়ে যদি দেখা যায় রবসনের অভিযোগ ভিত্তিহীন, কেলেঙ্কারির শেষ থাকবে না। 'তুমি ঠিক দেখেছ?' আবারও প্রশ্ন করল সে।

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল রবসন।

'অল রাইট, মিস,' বলল ম্যানেজার। 'যদি কিছু মনে না করেন, আপনার পকেটগুলো চেক করে দেখতে চাই। তারচে' ভাল হয় যদি আপনি নিজেই…।'

'একশোবার! এই দেখুন না…এই যে…' ডার্ট কোটের পকেটে দুই হাত ভরে দিল শিলা ব্রাউন। এবং শক্ত হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। রক্ত সরে গিয়ে পলকে ফ্যাকাসে হয়ে উঠল চেহারা। কয়েকটা আংটি আর চেইন জাতীয় কি যেন ঠেকেছে আঙুলে।

পরিবর্তনটা কারও চোখ এড়াল না। 'হ্যাঁ হ্যাঁ,' বলল পুলিস সার্জেন্ট। 'বের করুন হাত।'

আস্তে আস্তে মুঠো করা ডান হাত বের করল শিলা। চার-পাঁচটা সস্তা ব্রেসলেট, আংটি ইত্যাদি চকচক করে উঠল আলো লেগে। আহম্মক হয়ে গেল মেয়েটি, মহা-বিস্ময়ে আরও আগেই কপালে উঠে গেছে চোখ। 'ইয়ে…,' আমতা আমতা করে বলল, '…নিশ্চই কোন ভুল হয়েছে কোথাও। আমি চুরি করিনি এগুলো। হয়তো আর কেউ…।'

'ঠিক,' কঠোর হয়ে উঠল ম্যানেজারের চেহারা। 'আর কেউ চুরি করেছে। এবং ভুল করে আপনার পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ভাল করে দেখুন, আর কি কি রেখেছে সে।'

'দেখুন, আমি সত্যি…'

পাত্তা দিল না ম্যানেজার। সার্জেন্টের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে ততক্ষণে। 'মহিলার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনছি আমি সারজ। ব্যাপারটা

আপনার ওপর ছেড়ে দিতে পারি?'

'নিশ্চই।' জুয়েলারিগুলো তুলে নিল সে। 'চলুন, মিস। আর অভিনয় করতে হবে না। আসুন।'

লজ্জায় নাকমুখ লাল হয়ে গেছে শিলা ব্রাউনের। চোখে পানি এসে গেছে জিম ব্রাউনের কথা ভেবে। কি মনে করবে সে? 'একটা টেলিফোন করতে চাই।'

'একটা কেন, যত খুশি করতে পারবেন পুলিস স্টেশনে গিয়ে। চলুন।'

কাজে হাত দেয়ার আগে আঁটঘাট বেঁধে নামা জেরি লাটিমারের অভ্যেস। বড় হলে তো কথাই নেই, ছোট হলেও কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুঁটিনাটি যতদূর সম্ভব জেনে নিয়ে তবেই সে পা বাড়ায়। যে কারণে কখনও কোন কাজে হাত দিয়ে ব্যর্থ হতে হয়নি লাটিমারকে।

এসব বিষয়ে একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির সাহায্য নিয়ে থাকে সে সব সময়। সিআইএ, এফবিআই থেকে অতীতে দুর্নীতি বা অসদাচরণের জন্যে বিতাড়িত এক্স-ডিটেকটিভদের নিয়ে গঠিত সংস্থাটি। ওরা কাজ বোঝে, এবং অর্থের বিনিময়ে বিনা প্রশ্নে করে দেয় লাটিমারের কাজ। তা সে যে ধরনের কাজই হোক। চারদিন আগে এঁদেরই তিনজনকে শিলা ব্রাউনের পিছনে লাগিয়েছিল সে।

তার টেলিফোন ট্যাপ করে লোকগুলো। শিলা-ফ্রিম্যানের আজকের অ্যাপয়েন্টমেন্টের খবর জানতে পারে। তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়েছে লাটিমার। শিলা ব্রাউন ও জিম ফ্রিম্যানের দুটো ছবি ক্যাগারের হাতে ধরিয়ে দিয়ে কি করতে হবে বুঝিয়ে দিয়েছে পরিষ্কার। প্রথম কাজ শেষ করেছে তারা একটু আগে। এখন দ্বিতীয়টা সারার জন্যে অপেক্ষা করছে শিলার অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের সামনে, রাস্তার ওপারে।

ঠিক সাতটা আটাশ মিনিটে একটা স্টীল গ্রে রঙের পন্টিয়াক লে ম্যানস স্পোর্টস কুপে এসে দাঁড়াল ভবনের গেটে। গাড়িটা চোখে পড়তে সিধে হয়ে গেল জ্যাক ডজ। জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল সিগারেটটা। 'ওই এল।'

গাড়ি থেকে নামল জিম ফ্রিম্যান। হাতে বড় একটা ফুলের তোড়া। ঢুকে পড়ল ভেতরে। মনটা বেজায় খুশি। ডিনার শেষে বিয়ের প্রস্তাব দেবে আজ সে শিলাকে। ডায়মণ্ডের এনগেজমেন্ট রিঙও সঙ্গে নি. এসেছে ফ্রিম্যান। দোতলায় উঠে এক হাতে টাইয়ের নট ঠিক করল সে, তারপর নক করল শিলা ব্রাউনের দরজায়। সাড়া নেই। অধৈর্য হয়ে উঠলেও এক মিনিট অপেক্ষা করল ফ্রিম্যান, আবার নক করল। খুলল না কেউ দরজা।

ভেতরে শিলা নেই, ব্যাপারটা টের পেতে পুরো পাচ মিনিট ব্যয় হয়ে গেল তার। ব্যাপার কি! এ সময় তো ওর বাইরে থাকার কথা নয়! গেল কোথায়? ভাবতে ভাবতে নেমে এল হতভম্ব, অন্যমনস্ক ফ্রিম্যান। কি করবে এখন সে? ফিরে যাবে? না অপেক্ষা করে দেখবে কিছুক্ষণ? এমন তো হওয়ার কথা নয়! ওর অফিসে একটা টেলিফোন করে দেখবে নাকি, যদি কোন জরুরী কাজে...না, হতে পারে না তা। তেমন কিছু হলে শিলাই তাকে ফোন করত।

ফুটপাথে দাঁড়িয়ে পোনে আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করল জিম ফ্রিম্যান। তারপর হতাশ মনে ফিরে এল গাড়িতে। স্টার্ট দেবে, এই সময় মাথার পিছনে প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে জ্ঞান হারাল সে। পিছন থেকে সামনে চলে এল এবার জ্যাক ডজ। বালি ঠাসা চামড়ার রুলারটা জ্যাকেটের পকেটে রেখে ঠেলে অজ্ঞান দেহটা সরিয়ে দিল। ওপাশের ফুটবোর্ডে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকল ফ্রিম্যান।

পন্টিয়াক স্টার্ট দিল ডজ। ছুটল তীরবেগে। বিশগজ পিছনে তাকে অনুসরণ করছে ক্যাগার থাণ্ডারবার্ড নিয়ে। পাঁচ মিনিট চলার পর শহর ছাড়িয়ে এল ওরা। আগে থেকে ঠিক করে রাখা এক নির্জন কনস্ট্রাকশন সাইটে পৌঁছে থামল। জায়গাটা প্রায় অন্ধকার। ওপাশের দরজা খুলে কলার ধরে ফ্রিম্যানকে টেনে নামাল ডজ। সাড়া নেই লোকটার।

'দেখো, মেরে ফেলো না আবার,' সতর্ক করল তাকে ক্যাগার। 'হপ্তা দুয়েক শুইয়ে রাখার ব্যবস্থা করা গেলেই চলবে।'

দাঁত বের করে হাসল জ্যাক ডজ। 'জানি,' বলেই জুতোর ডগা দিয়ে ভয়ঙ্কর এক লাথি মেরে বসল ফ্রিম্যানের নাকেমুখে। এরপর দশ মিনিট ধরে চলল তার মাপা ওজনের মার। নাক ভেঙে তুবড়ে গেল ফ্রিম্যানের। বাঁ হাত এবং বুকের গোটা চারেক রিবও ভাঙল। কাজটা যখন শেষ হলো, ফোঁস ফোঁস করে দম ফেলছে ডজ।

রাত ন'টায় বসল সিটি ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট। সংক্ষিপ্ত বিচার শেষে চোরাই মালসমেত হাতেনাতে আটক শিলা ব্রাউনের পঞ্চাশ ডলার জরিমানা এবং সাত দিনের জেল হয়ে গেল।

ঘণ্টাখানেক পর বেলিভেডার হোটেলে জেরি লাটিমারকে খবরটা দিতে এল আলেক্স ক্যাগার। 'আপনার নির্দেশমতই সারা হয়েছে সব কাজ। কোন ঝামেলা হয়নি।'

'ফ্রিম্যান?'

'জানতেও পারেনি কিসের আঘাতে জ্ঞান হারিয়েছে। এ মুহূর্তে স্টেট হসপিটালে আছে। নাক-চোয়ালের হাড় ভাঙা, বুকের এক হালি রিব ভাঙা ইত্যাদি ইত্যাদি। মরবে না, হপ্তা দুয়েক ভুগবে আর কি!'

'গুড!' মাথা দোলাল জেরি লাটিমার। 'ছাড়া পাওয়ামাত্র জেল গেট থেকে তুলে আনবে শিলা ব্রাউনকে। কিন্তু খবরদার! একটা ফুলের টোকাও যেন লাগে না ওর গায়ে। যদি লাগে, ব্যক্তিগতভাবে তোমাকে দায়ী করব আমি। পরিষ্কার?'

'পানির মত।'

'কাউকে দিয়ে ওর ফ্ল্যাট খালি করে ফেলো কালই। বকেয়া ভাড়া চুকিয়ে দেবে। তোমরা যেয়ো না। কোন মেয়েকে দিয়ে করাও কাজটা।'

'রাইট, স্যার।'

পঞ্চাশ ডলারের আস্ত একটা বাণ্ডিল ছুঁড়ে দিল লাটিমার। শূন্যে লুফে নিল সেটা আলেক্স ক্যাগার। 'যেতে পারো এখন তুমি।'

# পাঁচ

হারবার ফ্রন্টের প্যারাডাইস ইনের সামনে গাড়ি রাখল জ্যাক ডজ। এ অঞ্চলের বিখ্যাত ক্লাব অ্যাণ্ড রেস্টুরেন্ট এই ইন। বিদেশী নাবিকদের মনোরঞ্জনের জন্যে যা যা প্রয়োজন খাদ্য, পানীয়, রক্ত গরম করা মিউজিক এবং নারী, কোন কিছুর অভাব নেই এদের।

মাতাল নাবিকরা যাতে ইনের কোন ক্ষতি করতে না পারে, সে ব্যবস্থাও রয়েছে। বিশালদেহী জনা ছয়েক পালোয়ানকে বেতন দিয়ে পোষে প্যারাডাইস ইনের মালিক, ডেভিড গিবসন। লোকটা আইরিশ, আরেক বিশালদেহী। বাউন্সার বলা হয় এসব পালোয়ানকে। পুলিসের প্রয়োজন হয় না। এরা ভালই জানে কি ভাবে সামাল দিতে হয় মাতাল, হল্লাবাজ খদ্দেরকে।

শহরের প্রত্যেকটি বার, ক্যাসিনো ইত্যাদিতেই বাউন্সার থাকে। থাকতে হয়। তবে প্যারাডাইস ইনের এরা সেরা। প্রতিষ্ঠানের মতই বিখ্যাত। মেয়েগুলোও তেমনি। সবার বয়স ষোলো থেকে বাইশের মধ্যে। যেমন তাদের চেহারা, তেমনি ফিগার। এদের বেশিরভাগই পেশাদার বারবণিতা। বাকি যারা, তারা সৌখিন। রোমাঞ্চ পিপাসু। এরাও খদ্দের সামাল দেয়ার ব্যাপারে ট্রেনিং পাওয়া। ছোটখাটো ঝামেলা নিজেরাই সামাল দিতে পারে।

কুঁচি দেয়া টকটকে লাল ব্রা, মিনি হাফপ্যান্ট সাইজের তুঁতে রঙের সিল্কের প্যান্টি, সোনালি হাই হিল জুতো এদের ইউনিফর্ম। সঙ্গে একটা করে কার্নেশন ফুল, সার্জিক্যাল টেপ দিয়ে জোড়া থাকে নাভিতে। সবার প্যান্টির সামনে-পিছনে অদ্ভুত সব শ্লোগান ছাপা এখানে পার্ক করা নিষেধ, একান্ত ব্যক্তিগত, প্রবেশ নিষেধ, নিষিদ্ধ সীমানা ইত্যাদি। এদের মধ্যে রূপে-ফিগারে সেরা মেয়ে রোজি। রোজমেরি শেরম্যান। মেয়েটিকে প্রয়োজন জ্যাক ডজের।

ইনের ভেতরে পা রাখল সে। তাকে ভালই চেনা আছে ডোরম্যানের। মৃদু মাথা ঝাঁকিয়ে এক টুকরো তেলতেলে হাসি দিল সে ডজের উদ্দেশে। চেক গার্লের হাতে হ্যাট তুলে দিল ডজ। তারপর ভেতরটা আড়াল করে রাখা কালচে লাল ভেলভেট পর্দা সরিয়ে ঢুকে পড়ল হৈ-চৈ আর সিগারেটের ধোঁয়ায় ভরা প্যারাডাইস ইনে।

প্রথমেই বিশাল এক হলরুম। নাচ-টাচ হয় এ রুমে। হচ্ছেও তাই। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশজন নাবিক মেয়েদের নিয়ে বল নাচছে। ওদের মধ্যে ভদ্র পোশাকধারীও আছে কয়েকজন। পুরো দস্তুর সুটেড-বুটেড। হলরুমের ওপাশে বার। ভিড়ের ভেতর দিয়ে গা বাঁচিয়ে বারে চলে এল জ্যাক ডজ। লম্বা বার কাউন্টারের ওপাশে প্রসন্ন-মুখো আইরিশকে দেখতে পেয়ে সেদিকে এগোল। তার ওপর চোখ পড়তেই চেহারাটা কেমন যেন হয়ে গেল ডেভিড গিবসনের।

গম্ভীর হয়ে গেল লোকটা। ব্যবসার আশায় তিন সুন্দরী পা বাড়িয়েছিল ডজের দিকে, দ্রুত মাথা নেড়ে তাদের সরে যেতে বলল সে। প্রায় সাড়ে ছয় ফুট লম্বা ডেভিড। নাকের হাড় ভাঙা। লাল চুল, চোখ ইস্পাত নীল। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে মাপছে সে ডজকে। একে মোটেই সহ্য করতে পারে না গিবসন। যদিও তা যতদূর সম্ভব চেপে রাখে সব সময়। প্রকাশ করে না।

'হাই, ডেভিড!' একটা উঁচু টুলে বাঁ নিতম্বের ভর চাপাল জ্যাক ডজ। কাউন্টারে কনুই রেখে ঝুঁকল আইরিশের দিকে। 'দারুণ ব্যবসা ফেঁদে বসেছ দেখি!'

'আজই প্রথম দেখলে বুঝি?' এর সঙ্গে কথা বলতে মন চায় না ডেভিডের। ব্যবসায়ী মানুষ সে, খুন-খারাবির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। তাই কোন পেশাদার খুনী, মার্কামারা বিপজ্জনক চরিত্রের সঙ্গে খেজুরে আলাপে সময় নষ্ট করতে চায় না। আপদ যত জলদি বিদেয় হয় ততই মঙ্গল। 'সে যাক, কেন আসা হয়েছে?'

এদিক-ওদিক তাকাল জ্যাক ডজ। মুখে গা জ্বালানো হাসি। 'রোজিকে দেখছি না! কোথায় ও?'

'কি দরকার রোজিকে?' ডেভিড গম্ভীর।

'কোথায় ও?'

'ব্যস্ত আছে।'

'ওকে জরুরী দরকার আমার।'

কপাল কোঁচকাল আইরিশ। 'কোন্ ব্যাপারে?'

'ব্যবসায়িক ব্যাপার-স্যাপার। কথা বলতে চাই ওর সঙ্গে।' হাসিটা চওড়া হলো ডজের। 'ডেকে পাঠাও মেয়েটিকে। নয় তুমিই ডেকে আনো গিয়ে।'

'শোনো,' শান্ত গলায় বলল ডেভিড, 'রোজি আমার ক্লাবের অ্যাসেট। আমি চাই না তোমার সঙ্গে ও...'

'তাই? চাও না?' ডজের ঘন সন্নিবেশিত ছোট দুই সবুজ চোখে প্রচ্ছন্ন রাগের আভাস ফুটল। 'ওয়েল, খুব খারাপ কথা। ছোটো ডেভিড, দৌড় দাও। খুঁজে আনো রোজিকে।'

'দেখ...'

'দেখেছি! এই মুহূর্তে পা তোলো! নইলে ক্যাগারকে নিয়ে ফের আসতে হবে আমাকে। আমাদের দু'জনের বল নাচ কেমন হতে পারে তা তুমিও বোঝো। বোঝো না? ইনের ভাল চাও তো এক্ষুণি স্প্রিন্ট দাও, আইরিশ।'

হুমকিটা শোনামাত্র মনে মনে আত্মসমর্পণ করল গিবসন। এর নির্দেশ না শুনলে বিপদ হবে। শয়তান দুটো করতে পারে না এমন কাজ ত্রিভুবনে নেই। সত্যিই হয়তো বড় কোন ক্ষতি করে দেবে তার ব্যবসার। রোজমেরি যতবড় অ্যাসেটই হোক, ইনের চাইতে বড় নয় নিশ্চয়ই। কয়েক মুহূর্ত ডজকে দেখল ডেভিড, তারপর কাউন্টারের পিছনের এক দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

কয়েক পা পিছিয়ে এসে একটা খালি টেবিলে বসল জ্যাক ডজ। ছ'মিনিট পর এল রোজি। উচ্চতা পাঁচ ফুট ছয়। চমৎকার চেহারা, ফিগার। কুচকুচে কালো ঘন

চুল। প্যারাডাইস ইনের মেয়েদের ভেতর সেরা সুন্দরী সে। পেশাদার। রোজির প্যান্টিতে লেখা : ফর ইওর আইজ ওনলি।

জ্যাক ডজের পাশে এসে দাঁড়াল রোজি। ভাল করে দেখল লোকটাকে। চেহারা-সুরত তো মন্দ নয়, ভাবল সে। যদিও ভেতরে ভেতরে সতর্ক। এর ব্যাপারে ডেভিড তাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। 'হ্যালো!'

তার প্যান্টির শ্লোগান পড়ে হাসল ডজ। 'পোশাক পাল্টে ভদ্র হয়ে এসো। বাইরে গাড়িতে বসছি আমি, দশ মিনিটের মধ্যে এসে দেখা করো।'

'বিষয়টা কি?'

'তোমার জন্যে ভাল একটা ব্যবসায়িক প্রস্তাব আছে।'

'আমি এখানে কাজ করি। চাইলেই এরকম বিজি আওয়ারে বেরোতে পারি না। তাছাড়া তোমার প্রস্তাবের ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ নেই।'

ব্যস্ত ডেভিড গিবসনের ওপর থেকে দৃষ্টি ঘুরে এল জ্যাক ডজের। এক মনে কাজ করছে লোকটা। যদিও নিশ্চিত জানে ডজ, এদিকের আলাপ আলোচনা শোনার জন্যে একটা কান তার খাড়া আছে। নিচু গলায় বলল, 'কাজটা কি শুনলে একশোবার আগ্রহী হবে তুমি, ডার্লিং। প্রচুর টাকার মামলা, পাঁচ সংখ্যার অঙ্ক।'

'বলে কি!' শক্ত হয়ে গেল রোজমেরি। 'ঠাট্টা করছ?'

'কাজ নিয়ে আমি কখনও ঠাট্টা করি না।' পকেট থেকে পাঁচটা একশো ডলারের নোট বের করল জ্যাক ডজ। গুঁজে দিল মেয়েটির হাতে। 'আমার সঙ্গে কথায় যে সময় নষ্ট হবে তোমার, এটা তার ফী। কি! আগ্রহ বোধ করছ?' আসন ছাড়ল সে। দরজার দিকে পা বাড়াল। 'জলদি! দশ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে এসো।'

হতভম্বের মত নোটগুলোর দিকে চেয়ে থাকল রোজি। এমন সৌভাগ্য বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। সামান্য কথা বলবে, তার আবার ফী! তাও পাঁচশো ডলার? এ কি আজব কথা!

'কি দিয়ে গেল হারামজাদা?'

কানের পাশে ডেভিডের কণ্ঠ শুনে চমকে মুখ তুলল মেয়েটি। টাকাগুলো তাকে দেখাল। চোখ ছোট হয়ে এল আইরিশের।

'কিসের টাকা?'

'আমার সঙ্গে কি যেন জরুরী আলাপ করতে চায় লোকটা। তাতে যে সময় নষ্ট হবে, এ টাকা তার ফী।'

'হোয়াট!'

'তাই তো বলল।' খানিক ইতস্তত করে আগ্রহটা প্রকাশ করেই ফেলল রোজমেরি। 'যাবো, ডেভিড?'

ঠোঁট মুড়ে কিছুক্ষণ ভাবল আইরিশ। ফী হিসেবে একে যা দিয়েছে হারামী লোকটা, তা রীতিমত অবিশ্বাস্য। সারা মাসেও রোজির এত রোজগার হয় কিনা সন্দেহ। ওর প্রস্তাব যদি এর জন্যে লাভজনক হয়, তাহলে বাধা দেয়া ঠিক হবে না।

'যেতে চাও, যাও। বাধা দেব না। তবে সতর্ক থেকো। কালকেউটে কি রকম কিউট হয় জানো তো? ওই লোক তেমনি কিউট।'

'ঠিক আছে, সতর্ক থাকব আমি। ধন্যবাদ, ডেভিড।'

পনেরো মিনিট পর ইন থেকে বেরিয়ে এল রোজমেরি শেরম্যান। একটা ফোর্ড থাণ্ডারবার্ডের জানালা দিয়ে হাত নেড়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল জ্যাক ডজ। প্রথমে গাড়িটা দেখল রোজমেরি। অনুমান করার চেষ্টা করল কত দাম হতে পারে ওটার। তারপর উঠে বসল লোকটার পাশে। ততক্ষণে ডেভিডের সতর্কবাণী বেমালুম হজম করে ফেলেছে সে। অর্থের লোভ গ্রাস করে ফেলেছে তাকে পুরোপুরি।

রোজির মনের কথা পড়ে ফেলল জ্যাক ডজ। হাসল মনে মনে। গাড়ি ছাড়ল। হারবার এলাকা ছেড়ে জনবিরল এক রাস্তায় এসে থামল সে। স্টার্ট বন্ধ করল। ঘুরে তাকাল মেয়েটির দিকে। 'এবার কাজের কথা হোক।'

'বলো, কি করতে হবে আমাকে।'

'যে কাজ তোমাকে করতে হবে, তার বিনিময়ে বিশ হাজার ডলার ক্যাশ দেয়া হবে।' সামান্য বিরতি। 'যদি কানে মোম দেয়া থাকে বা অঙ্কটা সঠিক শুনেছ কি না ভেবে মনে সন্দেহ জাগে, সেজন্যে আবারও বলছি, বিশ হাজার ডলার। অ্যাণ্ড ক্যাশ।'

হাঁ করে ডজের দিকে চেয়ে থাকল রোজি। অনেকক্ষণ। কী এক অজানা সুখের শিহরণ বয়ে গেল তার শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে। শোনামাত্রই বুঝেছে সে, মিথ্যে বলছে না লোকটা। সত্যিই বলছে। কম মানুষ ঘাঁটেনি রোজি জীবনে, অভিজ্ঞতা কম অর্জন হয়নি। কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যে, বুঝতে পারে সে।

'বলে যাও,' ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল রোজি। উত্তেজনায় হাত কাঁপছে তার। 'ভালই তো লাগছিল মিউজিকটা, বন্ধ করলে কেন?'

'এই টাকায় তুমি নিজেও একটা ইনের মালিক হতে পারবে, ঠিক না?' সিগারেট ধরাল জ্যাক ডজ। কিন্তু মেয়েটিকে অফার করল না। এসব ভদ্রতার ধারও মাড়ায় না সে। বিশেষ করে মেয়েদের বেলায়। তার কাছে মেয়েরা হচ্ছে নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী।

'ঠিক। কিন্তু কাজটা কি?'

'তোমার বয়-ফ্রেণ্ড, ফিল সিমন্সের ব্যাপারে আগ্রহী আমি।'

'সিমন্স? কেন?' অবাক হলো রোজি। 'ওকে কি দরকার তোমার?'

'শোনো মেয়ে। প্রশ্ন আমি করব। তুমি নয়। যা জানতে চাইব, ঝটপট উত্তর দেবে তার।'

'আচ্ছা, বেশ। করো প্রশ্ন।'

'ছেলেটা ভালবাসে তোমাকে?'

'হ্যাঁ।'

'কি রকম ভালবাসে, খুব?'

'হ্যাঁ, তা বলতে পারো।'

'পর্যাপ্ত টাকা হাতে পেলে ওকে বিয়ে করবে তুমি, ঠিক না?'

'অবশ্যই।'

'বেশ। এবার দেখো।' পিছনের সীটে রাখা একটা ব্রিফকেস নিজের কোলের ওপর নিয়ে এল জ্যাক ডজ। তালা খুলে আস্তে করে ডালাটা মেলে ধরল। 'এই যে।'

দম আটকে গেল রোজমেরির। বিস্ফারিত চোখে ভেতরে সাজানো পঞ্চাশ ডলারের বাণ্ডিলগুলোর দিকে চেয়ে থাকল সে। অজান্তে ফাঁক হয়ে গেছে দু'ঠোঁট। নতুন টাকার গন্ধে ভরে উঠেছে গাড়ির ভেতরটা। একসঙ্গে এত টাকা জীবনেও দেখেনি রোজি। ঝপ করে ডালা বন্ধ করে দিল ডজ। 'পেতে চাও এগুলো?'

চেষ্টা করেও গলায় স্বর ফোটাতে পারল না রোজি। কোনমতে মাথা দোলাল।

'আমার কাজটা যদি করতে পারো, এ টাকা সব তোমার।'

'বলো, কি করতে হবে আমাকে।'

নিচু গলায় শুরু করল জ্যাক ডজ।

শহর থেকে দু'মাইল উত্তরে, গ্রেটার মায়ামিগামী স্টেট হাইওয়ে ফোর এ-র পাশে দাঁড়িয়ে আছে প্যারাডাইস সিটি উইমেনস হাউস অভ কারেকশন। জায়গাটা প্রায় মরুভূমি।

সকাল আটটা। ঘটাং শব্দে খুলে গেল সংশোধনাগারের গেট। ভেতর থেকে বেরিয়ে এল পাঁচটি মেয়ে। আঠারো থেকে বাইশের মধ্যে হবে সবার বয়স। শিলা ব্রাউনও আছে এদের মধ্যে। কড়া রোদে চোখ কুঁচকে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে সে। তার সঙ্গীরা কেউ তিন বছর, কেউ চার বছর জেল খেটেছে।

ওদের কাছে শিলা ছিল পরিবারের ছোট্ট শিশু। হাত পাকেনি, প্রথমবার চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে বেচারী, যে কারণে তার প্রতি এরা এবং ভেতরে যারা রয়ে গেছে, প্রত্যেকেই যথেষ্ট দয়া-মায়া দেখিয়েছে এই সাতদিন। কিভাবে হাত সাফাই সেরে নিরাপদে কেটে পড়া যায়, কি করে স্টোর ডিককে বোকা বানানো যায়, সে ব্যাপারে শিলা ব্রাউনকে সারাক্ষণ নসিহতও করেছে অনেকেই।

চুপচাপ শুনে গেছে শিলা। ইচ্ছে থাকলেও মুখ খোলেনি। সত্য ঘটনা চেপে গেছে। কারণ তা কেউ বিশ্বাস করত না, উল্টে সবার হাসির খোরাক হত শিলা। গরম লাগছে। ডার্ট কোটটা বাঁ হাতে দু'ভাঁজ করে ঝুলিয়ে নিল সে। আরেক হাতে হ্যাণ্ডব্যাগ। চেহারায় দুশ্চিন্তা। এখনও বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে শিলার, সত্যিই ব্যাপারটা ঘটেছে ওর জীবনে। চুরির অপরাধে জেল খাটতে হয়েছে তাকে।

কেন? গত সাতদিনে নিজেকে হাজারোবার একই প্রশ্ন করেছে সে, কেন তাকে এভাবে ফাঁসানো হলো? কার কাছে কি অপরাধ করেছে ও? ভেবেছে আর চোখের পানিতে বুক ভাসিয়েছে শিলা ব্রাউন। ওর পকেটে কে ঢুকিয়েছিল অলঙ্কারগুলো? শিলাকে জেল খাটিয়ে সমাজের চোখে হেয় করে কি লাভ হয়েছে তার?

পঁচিশ-ত্রিশ গজ সামনে বড় রাস্তায়, সংশোধনাগারের ছাপ মারা একটা বাস

দাঁড়িয়ে আছে, মেয়েদের শহরে পৌঁছে দিয়ে আসবে ওটা। ধুলোর পুর স্তর জমে আছে গতরে, রং চেনার উপায় নেই। অন্যদের দেখাদেখি সেদিকে পা বাড়াল শিলা। এই সময় কালো রঙের একটা বুইক কার এসে দাঁড়াল বাসটার পিছনে। সামনের আসনে বসা ছিল দশাসই দুই লোক, নেমে এল তারা। চেহারায় পুলিস পুলিস ভাব। কোমরে হাত রেখে তাকিয়ে থাকল লোক দুটো মেয়েদের দিকে।

জেসি কৃপার এক পেশাদার বারবণিতা। নিজের দালালের সঙ্গে টাকার বখরা নিয়ে ঝগড়ার এক পর্যায়ে তার পেটে ছুরি মারার অপরাধে তিন বছরের সাজা খেটে বেরিয়েছে আজ। এই সাতদিন সারাক্ষণ শিলাকে আগলে আগলে রেখেছে জেসি। কারাবাসের প্রতিটি মুহূর্ত তাকে বিষণ্ন আর চিন্তিত থাকতে দেখে ওর ওপর মায়া পড়ে গেছে জেসির। চালু মেয়ে সে, এটুকু অন্তত বুঝতে পেরেছে যে শিলা ওদের মত খারাপ নয়। ওর সরল চাউনিই তার প্রমাণ। শিলার পিছনেই রয়েছে সে। লোক দুটোকে দেখে কেমন সন্দেহ হলো তার। হাত ধরে শিলাকে টেনে দাঁড় করাল জেসি।

'কি হলো?' প্রশ্ন করল শিলা।

মাথা দুলিয়ে লোক দুটোকে দেখাল জেসি। 'মনে হচ্ছে ঝামেলা!'

'মানে?'

'পুলিস। দাঁড়াও, ওরা কেন এসেছে বুঝে নি' আগে।'

ওদের ফিস্‌ফিসানি দেখে একে অন্যের দিকে তাকাল লোক দুটো, তারপর যেটি বেশি দশাসই, এগিয়ে এসে পাহাড়ের মত রোধ করে দাঁড়াল শিলার পথ। 'শিলা ব্রাউন?'

'হ্যাঁ।' অন্য তিন মেয়ে ততক্ষণে পড়িমরি করে ছুট লাগিয়েছে বাসের উদ্দেশে। যায়নি কেবল জেসি কৃপার। এখনও শিলার হাত ধরে রেখেছে সে। ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লোকটার দিকে।

'পুলিস,' বলল সে। 'আমাদের হেডকোয়ার্টারে যেতে হবে আপনাকে। গাড়ি নিয়ে এসেছি আমরা, চলুন।'

'না,' বলল জেসি কৃপার। 'যাবে না ও। যদি যেতেই হয়, বাসে করে শহরে পৌঁছে তারপর যাবে। এখান থেকে নয়।'

ঝট্‌কা মেরে তার মুঠো থেকে শিলার হাত ছাড়িয়ে নিল লোকটা। তারপর প্রচণ্ড এক ধাক্কায় সরিয়ে দিল তাকে সামনে থেকে। তাল সামাল দিতে পারল না জেসি শেষ পর্যন্ত, পড়ে গেল রাস্তার ওপর।

'রাস্তা মাপো, ডার্লিং,' শাসাল তাকে লোকটা। 'নইলে নাকের পানি চোখের পানি এক করে ছাড়ব তোমার।'

'কিন্তু কেন?' সাহস সঞ্চয় করে জানতে চাইল শিলা। 'আবার কেন হেডকোয়ার্টারে যেতে হবে আমাকে?'

'জানি না, ম্যাম। বলা হয়নি আমাদের। আমরা কেবল হুকুম পালন করছি। চলুন। এখানে দেরি করলে ওখানেও ছাড়া পেতে দেরি হয়ে যাবে আপনার।'

বাধ্য হয়ে পা বাড়াল শিলা। ঘুরে তাকাল জেসির দিকে। ধুলো ঝাড়তে

ঝাড়তে চেয়ে আছে সে ওর দিকে। চোখাচোখি হতে হাত নাড়ল মেয়েটি। শিলাকে পাশে নিয়ে সামনের সীটে বসল লোকটা। অন্যজন বসল পিছনে। রওনা হয়ে গেল বুইক। ঢিলেঢালা ভঙ্গিতে বসে ছিল পিছনের লোকটি। গাড়ি সংশোধনাগারের দৃষ্টি সীমার বাইরে পৌঁছতেই নড়ে উঠল সে। সামনে ঝুঁকে দু'হাতে শিলার গলা টিপে ধরল আচমকা।

তার শক্তিশালী আঙুল মেয়েটির কণ্ঠনালীর ওপর চেপে বসল। লাফালাফি শুরু করে দিল আতঙ্কিত শিলা, পা ছুঁড়তে লাগল উন্মত্তের মত। দু'হাতে প্রাণপণে গলা থেকে হাত সরাবার চেষ্টা করল সে। মৃত্যুভয়ে চোখ দুটো গর্ত ছেড়ে লাফিয়ে বেরিয়ে পড়ার জোগাড়। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। এক সময় নেতিয়ে পড়ল সে সীটের ওপর। জ্ঞান হারাল।

'হারামজাদী মাগী!' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল প্রথমজন, চালক। অসহায়ের মত শিলার প্রচুর লাথি হজম করতে হয়েছে তাকে এতক্ষণ। গাড়ি সোজা রাখতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে।

শিলার দুই বগলের নিচে হাত ঢুকিয়ে দিল পিছনের লোকটা, ধস্তাধস্তি করে ভারী দেহটা সামনের সীটের ওপর দিয়ে গড়িয়ে এপাশে নিয়ে এল। এবার একটা দলা পাকানো নোংরা রুমাল ঠেসে তার গালের ভেতর ঢুকিয়ে দিল সে, অ্যাঢেসিভ টেপ সেঁটে দিল মুখে। দু'টুকরো দড়ি দিয়ে শিলার হাত ও পা কষে বাঁধল। সবশেষে দেহটা ফুটবোর্ডে গড়িয়ে দিয়ে কম্বল চাপা দিল লোকটা। ব্যস, ডিউটি খতম।

'হলো তোমার?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল চালক।

'হ্যাঁ, ফিনিশ।'

শহরের দিকে এক মাইল এগিয়ে একটা ব্রাঞ্চ রোডে ঢুকে পড়ল বুইক। আরও সিকি মাইলখানেক এগোল। নিজেদের থাণ্ডারবার্ড নিয়ে সেখানে অপেক্ষা করছে ক্যাগার-ডজ। দুই ভুয়া পুলিস অজ্ঞান শিলা ব্রাউনকে চ্যাঙদোলা করে তুলে দিল ওদের গাড়িতে।

'কোন সমস্যা হয়নি তো?' প্রশ্ন করল ক্যাগার। সূর্যের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে তার কাঁচের চোখে পড়ে।

'না।'

'কেটে পড় তাহলে। জলদি!' জ্যাক ডজের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল আলেক্স ক্যাগার।

তুফান বেগে ছুটল ফোর্ড থাণ্ডারবার্ড। শহরের দিকে নয়, ব্রাঞ্চ রোড ধরে উল্টোদিকে। আধ ঘণ্টায় প্যারাডাইস সিটি ত্রিশ মাইল পিছনে ফেলে এল জ্যাক ডজ। পথের দু'দিকে ধু-ধু পাথুরে প্রান্তর। বসতি বা জনমানুষের ছায়া পর্যন্ত নেই কোথাও।

'রাখো দেখি!' বলল ক্যাগার। 'মেয়েটার অবস্থা চেক করে দেখা দরকার। উল্টোপাল্টা কিছু ঘটে গেলে বিপদ।'

ব্রেক কষল ডজ। বেরিয়ে এসে পিছনের দরজা খুলে উঁকি দিল ক্যাগার।

কম্বল সরিয়ে শিলার মুখের টেপ তুলল, বের করে আনল রুমাল। ঘাড় ঘুরিয়ে ডজও দেখল মেয়েটিকে। 'বাহ! দারুণ! এই ধরনের মেয়েই আমার পছন্দ,' মন্তব্য করল সে।

'এমন একটা মেয়ে দেখাতে পারো যাকে পছন্দ নয় তোমার?' বিরক্ত কণ্ঠে বলল ক্যাগার। দরজা লাগিয়ে নিজের আসনে ফিরে এল সে। 'চালাও।'

নির্লজ্জের মত দাঁত বের করে হাসতে লাগল ডজ। দেখে পিত্তি জ্বলে গেল ক্যাগারের। সিগারেট ধরিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে থাকল সে। মেয়েদের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই ক্যাগারের। সতেরো বছর বয়সে বিয়ে করেছিল সে। মেয়েটি ছিল তার চার বছরের বড়। সে যে সম্পূর্ণ এক অক্ষম পুরুষ, প্রথম রাতে তা আবিষ্কার করে হতভম্ব হয়ে পড়ে আলেক্স ক্যাগার। মেয়েটির সামনে লজ্জায় একেবারে মাথা কাটা যায় তার। শেষ পর্যন্ত বেডরুম ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল সে।

পরবর্তী দুই সপ্তাহ বলতে গেলে পালিয়ে পালিয়েই কেটেছে ক্যাগারের। স্ত্রীর মুখোমুখি হতে পারেনি সাহস করে। এরপর মেয়েটিই রেহাই দেয় তাকে, বিয়ে ভেঙে যায় ওদের। যৌন অতৃপ্তি থেকে সৃষ্ট হতাশা কাটিয়ে ওঠার আশায় পরের দু'বছর দেহপসারিণীদের পিছনে প্রচুর টাকা উড়িয়েছে ক্যাগার, কাজ হয়নি। হতাশা বাড়তে বাড়তে চরম পর্যায়ে পৌঁছল এক সময়, বিরক্ত হয়ে নারী সংক্রান্ত যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা দূর করে দিল সে মাথা থেকে। আজকাল কোন নারীই তার ভেতর বিন্দুমাত্র আবেদন সৃষ্টি করতে পারে না। তা সে যতই সুন্দরী হোক।

সবাইকে দিয়ে সব কাজ হয় না, স্বীকার করে নিয়েছে আলেক্স ক্যাগার। যেমন তার মত মানুষ খুন করা, ক'জন পারে এমন ঠাণ্ডা মাথায় পিঁপড়ের মত মানুষ মারতে? পাশ থেকে ড্রাইভিঙে ব্যস্ত জ্যাক ডজকে দেখল সে। গর্বে বুকটা ভরে উঠল। ও ব্যাটার আছে মেয়েমানুষের নেশা, আর তার নিজের রক্তের নেশা। খুন জ্যাক ডজও করে, তবে এ লাইনে সবে শিশু ও। কাজ শিখছে ক্যাগারের কাছে।

ডজকে ঘন ঘন ঠোঁট চাটতে দেখে চোখ কোঁচকাল সে। 'হঠাৎ ঠোঁট শুকিয়ে ওঠার কারণ?'

'একটা কথা ভাবছি।'

'কি?'

'জায়গামত পৌঁছার আগে…মানে, তুমি যদি একটু সময় দিতে, এখানেই কোথাও মেয়েটিকে একটু,' হাসল ডজ। 'তুমি তো জানোই মেয়েদের ব্যাপারে আমি…' ক্যাগারের চামড়ার চোখে খুনের নেশা দেখে আপনাআপনি গলা বুজে এল তার।

'এর ব্যাপারে কি নির্দেশ আছে, তুমি জানো। জানো না?' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল ক্যাগার। ধক্ ধক্ করছে ডান চোখটা।

'হ্যাঁ, তা…জা-জানি। জানব না কেন?'

'মেয়েটিকে যদি স্পর্শও করেছ তুমি, ডজ, আমি নিজ হাতে খুন করব

তোমাকে।'

'আরে দূর! আমি কি সত্যি সত্যি...।' হেসে পরিবেশটা সহজ করতে চাইল ডজ, কিন্তু কেন যেন হাসি এল না। এই একটা ব্যাপার বোঝে না সে কিছুতেই। থেকে থেকে কি যে হয় লোকটার। এমনভাবে তাকায়, কথা বলে, তার মত পশুর বুকটাও কেঁপে ওঠে। শিস বাজাতে গেল ডজ, তাও হলো না। আওয়াজ বেরুচ্ছে না। শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে ঠোঁট।

মগবাজার। এক বহুতল অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের সাততলা। শহরের নাম করা এক চিকিৎসকের প্রকাণ্ড লিভিংরুমে বসে আছে মাসুদ রানা আর সোহেল আহমেদ। কথা বলছে দু'জনে।

একটু পর অন্দর মহল থেকে ভেতরে ঢুকল আরেকজন। বয়স পঁয়তাল্লিশ। উচ্চতা পাঁচ ফুট সাত। চওড়া কপাল। দীর্ঘ খাড়া নাক। মাথার তালুতে ছোট্ট টাক। চুল কাঁচাপাকা। রুক্ষ, এলোমেলো। হাঁ হয়ে গেল রানা ভদ্রলোককে দেখে। ঠিক যেন প্রফেসর মারগুব হোসেনের ডুপ্লিকেট।

'পরিচয় করিয়ে দিই,' নাটুকে ভঙ্গিতে বলল সোহেল। হাসছে মিটিমিটি। 'রানা, ইনি হচ্ছেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, প্রফেসর মারগুব হোসেন, ওরফে বিখ্যাত গিটারিস্ট, মুনির হোসেন। আর,' আগন্তুকের দিকে ফিরল ও। 'ইনি হচ্ছেন, মাসুদ রানা।'

উঠে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে হাত মেলাল রানা। 'পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম।'

হাসল বিজ্ঞানী, ওরফে গিটারিস্ট।

'এবার তাহলে কাজের কথা শুরু করতে পারি আমরা, কি বলিস?' বলল সোহেল।

'নিশ্চই!' মাথা দোলাল রানা। এখনও আগন্তুককে দেখছে ও অবাক চোখে। মানুষে মানুষে এত অদ্ভুত মিল হতে পারে, দেখেও পুরো বিশ্বাস হতে চাইছে না।

# ছয়

অপারেশনের পরবর্তী কাজটা নিজেই সামলাবে ঠিক করল জেরি লাটিমার। এ কাজে আলেক্স ক্যাগার বা জ্যাক ডজকে পাঠানো ঠিক হবে না। ডাক্তারকে কাত করার যে মাল-মশলা আছে তার কাছে, তা ওদের জানা নেই। জানাতেও চায় না জেরি।

চারবারের বার পাওয়া গেল লাইন। বিজি টোন আসছিল এতক্ষণ। খটখটে, কর্কশ এক নারীকণ্ঠ উত্তর দিল, 'হ্যালো?'

'ডক্টর পল ম্যাথিয়াসের সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাই আমি,' খুব নরম

কণ্ঠে বলল জেরি। 'আজ সন্ধেয় হলে খুব ভাল হয়, নয়ত কাল সকালে অবশ্যই।'

'আমি দুঃখিত। এ সপ্তাহের ভেতর নতুন কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়া সম্ভব হবে না, ডক্টর খুবই ব্যস্ত। আগামী শুক্রবার হলে যদি চলে আপনার···দুপুর তিনটের দিকে, তাহলে অবশ্য···'

এই উত্তরই আশা করছিল জেরি লাটিমার। ডক্টর পল ম্যাথিয়াস সত্যিই খুব ব্যস্ত মানুষ। প্রখ্যাত ব্রেন স্পেশালিস্ট। রোজ প্রচুর রোগী দেখতে হয় তাঁকে। 'দেখুন, আমিও খুবই দুঃখিত। কিন্তু কিছু করার নেই। ডক্টরকে আমার হয়ে একটু অনুরোধ করুন। তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হওয়া খুবই জরুরী।'

একটু বিরতি। 'আপনার নামটা বলুন।'

'জেরি লাটিমার। ডক্টরকে বলবেন আমি কার্ল হফারের প্রতিনিধিত্ব করছি। আসলে মিস্টার হফারের ব্যাপারেই তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে চাই আমি। নামটা বললেই হবে, তাঁকে ডক্টর চেনেন,' হাড়ে হাড়ে, কথাটা মনে মনে বলল জেরি।

'একটু ধরুন, দেখি।'

প্রায় দু'মিনিট রিসিভার কানে ঠেকিয়ে বসে থাকল জেরি লাটিমার। ধৈর্যের প্রতিমূর্তি। লোকটা সম্পর্কে কার্ল হফারের লিখে রেখে যাওয়া গল্পটা মনে মনে নাড়াচাড়া করছে। এক মিনিট পঞ্চান্ন সেকেণ্ড পর 'খুট' শব্দ উঠল লাইনে। 'হ্যালো?'

'হ্যাঁ, বলুন।'

'ডক্টর আজ ছ'টায় দেখা করতে রাজি হয়েছেন আপনার সঙ্গে।'

ঠোঁট মুড়ে হাসল জেরি। 'অসংখ্য ধন্যবাদ।'

ছয়টা দুই মিনিটে ডক্টর ম্যাথিয়াসের প্রাসাদোপম বাড়ির গেটে এসে দাঁড়াল তার বহুমূল্য ক্যাডিলাক ফ্লিটউড। গেটের দু'পাশের পেভমেন্টের সঙ্গে নাক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য গাড়ি। রোগী নিয়ে এসেছে ডক্টরের ক্লিনিকে। ভেতরে বেশ ভিড়। ব্যস্ত সময় চলছে পল ম্যাথিয়াসের।

বাড়িটা বড় এক টিলার ওপর। সামনের চওড়া বারান্দা থেকে গ্রেটার মায়ামির পুরো ইয়ট হারবার দেখা যায়। সামনের হলরুমে গিজগিজ করছে মানুষ। ভিড় ঠেলে ইনফর্মেশন ডেস্কে গিয়ে নিজের পরিচয় জানাল জেরি লাটিমার। 'একটু অপেক্ষা করতে হবে, স্যার,' বলল বয়স্কা এক নার্স। 'আপনার দেরি দেখে এইমাত্র একজন রোগী ভেতরে পাঠালাম।'

'ঠিক আছে, কিচ্ছু অসুবিধে নেই। আমি একটু বসি।'

দশ মিনিট পর তার সামনে এসে দাঁড়াল নার্সটি। 'আমার সঙ্গে আসুন।'

মহিলার পিছন পিছন অন্দরমহলের দিকে পা বাড়াল লাটিমার। বারতিনেক ডানে-বাঁয়ে করে একটা ওক কাঠের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়াল নার্স। মৃদু নক্ করল দরজায়, তারপর আস্তে করে মেলে ধরল পাল্লাটা। মাথা ঝাঁকিয়ে ভেতরে ঢুকতে ইঙ্গিত করল জেরিকে।

পা চালাল সে। রুমটা বেশ বড়। বিশাল এক ডেস্কের পিছনে এদিকে মুখ

করে বসা ডাক্তার। পরনে হাফ হাতা সাদা ডবল ব্রেস্টেড ওভারল। কাঠামোগত দিক থেকে কার্ল হফারের সঙ্গে প্রচুর মিল এ লোকের। একই রকম মোটা আর খাটো ডক্টর ম্যাথিয়াস। তেমনি চওড়া ভুরু। তবে এর মাথায় চুল খুব বেশি। ঘন, কাঁচাপাকা। চোখে পুরু কাঁচের চশমা। তবে চাউনি মানুষের নয়, মনে হলো জেরির, ঘুঘুর।

ধীরপায়ে এগিয়ে তার মুখোমুখি বসল জেরি লাটিমার। কোন ব্যস্ততা নেই। মুখ খোলারও লক্ষণ নেই। তাকিয়ে আছে ডাক্তারের দিকে। চাইছে, আগে সে-ই মুখ খুলুক। ডাক্তারও তেমনি, দেখছে তো দেখছেই। মাপছে একজন অন্যজনকে। অবশেষে পল ম্যাথিয়াসই প্রথম কথা বলে উঠল। 'আপনি কার্ল হফারের তরফ থেকে এসেছেন?'

'হ্যাঁ। আমি তাঁর কর্মচারী।' পায়ের ওপর পা তুলে বসল জেরি। হাতে তৈরি দামী লব জুতোর চকচকে টো ক্যাপ পর্যবেক্ষণ করল কয়েক মুহূর্ত। আবার তাকাল ম্যাথিয়াসের দিকে। 'তাঁকে মনে আছে নিশ্চই আপনার?'

টেবিল থেকে একটা সোনার ঝর্ণা কলম তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল ডাক্তার। মোটা, খাটো খাটো আঙুল দিয়ে একবার খুলছে, আবার বন্ধ করছে ক্যাপ। 'হ্যাঁ, নামটা পরিচিত মনে হচ্ছে।'

হাসল জেরি লাটিমার। অনেকে আছে যাদের হাসতে দেখলে অন্যেরাও হেসে ওঠে, জেরি সেই ধরনের মানুষ। চেহারার মত হাসিটাও তার চমৎকার। কিন্তু ম্যাথিয়াসের ওপর কোন প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হলো তা। ডাক্তার গম্ভীর। কলম নিয়ে খেলছে। থামল জেরি। আবার নীরবতা। নড়েচড়ে বসল আমেরিকান। অনর্থক সময় নষ্ট হচ্ছে ভেবে সরাসরি আসল প্রসঙ্গে চলে এল সে।

'আমার এক রোগী আছে, ডক্টর। সিরিয়াস মেন্টাল কেস। তার চিকিৎসা করতে হবে আপনাকে। অবশ্য আপনার এখানে নয়, শহরের বাইরে কোথাও বসে। যে কারণে অন্তত তিন সপ্তাহ ক্লিনিক বন্ধ রাখতে হবে আপনাকে। রোগী একজন ভিভিআইপি। টাকার জন্যে ভাববেন না, কাজ সন্তোষজনক প্রমাণিত হলে পঞ্চাশ হাজার ডলার ফী পাবেন আপনি।'

উত্তর দেয়ার আগে কিছুক্ষণ ভাবল ম্যাথিয়াস। কলম রেখে 'মট' 'মট' করে আঙুল ফোটাল দু'বার। 'রোগী আপনার দেখব আমি, কিন্তু তাকে এখানে নিয়ে আসতে হবে। বাইরে যাওয়া আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। রোজ এখানে প্রচুর রোগী দেখতে হয় আমাকে। অনেক দূর দূরান্ত থেকে আসে তারা। তাদের রেখে...' লোকটাকে আবার হেসে উঠতে দেখে থেমে গেল ডাক্তার।

'আপনাকে খানিক বিরক্ত করব ডক্টর। ছোট্ট একটা গল্প বলি। ১৯৪৩ সালে জুরগেন গুন্থার নামে এক মেডিক ছিল বার্লিনে,' সামান্য বিরতি। চাউনি পাল্টে গেল ম্যাথিয়াসের। এতক্ষণ যেন ডালে ছিল ঘুঘু, এইবার ভিটেয় নেমেছে দানা খুঁটতে, এমনি সতর্ক, তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল দৃষ্টি।

'ব্রেন স্পেশালিস্ট ছিল সে,' ফের আরম্ভ করল জেরি। 'একটা বিশেষ এক্সপেরিমেন্ট চালানোর নাম করে নাজি বাহিনীর সহায়তায় তিন হাজার তিনশো

বাইশজন ইহুদী বন্দীর মাথায় ছুরি চালিয়েছিল সেই মেডিক। হাত ছিল একেবারেই কাঁচা। কাজের কাজ কিছুই হয়নি, মাঝখান থেকে এতগুলো মানুষ মারা গেছে। পরে অবশ্য সফল হয়েছিল জুরগেন গুন্থার। তবে আরও প্রায় শ'পাঁচেক ইহুদিকে সোজা কথায় হত্যা করার পর। সংখ্যাটা ভেবে দেখুন একবার, তিন হাজার আটশো বাইশজনকে প্রাণ হারাতে হয়েছে তার এক্সপেরিমেন্টের ঠ্যালায়।

'আমার কাছে ছবি আছে সেই মেডিকের। ইন ফ্যাক্ট, নাজি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের ও.টি.-তে ইহুদিদের খুলিতে বিশেষ করাত চালাবার সময় তোলা হয়েছিল ছবিগুলো। আমি জানি সেই মেডিক, জুরগেন গুন্থার অনেক আগেই মারা গেছে। ইচ্ছে করলে মৃতই থেকে যেতে পারে সে, যদি আমার কাজটা হয়ে যায়। আমি আন্তরিক ভাবেই চাই না এত বছর পর তার কবর খোঁড়াখুঁড়ি করতে। তাতে তার মৃত আত্মার কষ্ট হবে।'

আবার কলমটা তুলে নিল পল ম্যাথিয়াস। বারবার খুলছে, বন্ধ করছে। 'খুব ইন্টারেস্টিং গল্প। ঠিক আছে। তিন সপ্তাহের কথা বললেন না? অসুবিধে নেই। করে নেব সময়।'

'অনেক ধন্যবাদ, ডক্টর।' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জেরি লাটিমার।

'আপনার রোগীর নাম কি?'

'আজ নয়, সময় হলে জানাব তা।'

'বেশ।'

'এ কাজে আপনার যা যা লাগবে, সব আমি জোগাড় করে দেব।'

'কবে ক্লিনিক ক্লোজ করতে হবে আমাকে?'

'সব যদি ঠিকঠাক থাকে, তাহলে আগামী রবি অথবা সোমবার। আগের দিন জানাব আমি আপনাকে।'

'আমার ফী?'

অমায়িক হাসি ফুটল জেরির মুখে। 'কাজ শেষ হলে।'

'বুঝেছি,' সমঝদারের মত মাথা দোলাল ব্রেন স্পেশালিস্ট। বুঝতে পেরেছে, পঞ্চাশ হাজার দূরে থাক, পঞ্চাশ সেন্টও পাবে না সে এ-কাজে। শুধু চামড়া বাঁচবে, এই যা লাভ।

মনটা অস্থির হয়ে আছে রোজমেরি শেরম্যানের। কিছুই ভাল লাগছে না আজ। কাজে মন বসছে না একেবারেই। থেকে থেকে চোখের সামনে টাকার বাণ্ডিল ভেসে উঠছে তার। খানিক পর পর ঘড়ি দেখছে, কখন দশটা বাজবে, কখন কাজ থেকে বাসায় ফিরবে তার প্রেমিক, ফিল সিমন্স। হ্যারিসন ওয়েন্টওঅর্থ অ্যাসাইলামে কাজ করে সে। মেল নার্স।

বছরখানেক আগে পরিচয় ওদের। এক রাতে কি ভেবে প্যারাডাইস ইনে এসেছিল সিমন্স, সেইদিন। প্রথম দেখায়ই যুবককে ভাল লেগে যায় রোজির। সাদাসিধে মানুষ। সে রাতে তার সঙ্গে নেচে ভালই লেগেছিল ওর। অন্য সব

খদ্দেরের মত ইচ্ছেমত ওর দেহে হাত বোলায়নি সিমন্স, প্রয়োজনের তুলনায় বেশি ঘনিষ্ঠ হওয়ার আগ্রহও দেখায়নি। বরং নাচের সময় এমন্ আলতো করে ধরে রেখেছিল রোজিকে, যেন ও মূল্যবান চিনামাটির পাত্র, একটু এদিক-ওদিক হলেই ভেঙে যাবে।

ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করেছিল রোজি। মনে মনে হেসেও ছিল। কারণ পুরুষদের এই আচরণে একেবারেই অনভ্যস্ত ছিল সে। তাই লোকটা আসলেই কেমন, পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিল মন। সে রাতে ইন বন্ধ হওয়ার পর সিমন্সকে নিজের দেড়রুমের ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে গিয়েছিল রোজমেরি। ভেবেছে, লোক-চক্ষুর আড়ালে ওকে কাছে পেলেই বেরিয়ে পড়বে ভাল মানুষটির আসল চেহারা।

কিন্তু হিসেবে ভুল ছিল রোজমেরি শেরম্যানের। ওকে বিছানায় নেয়ার চেষ্টা করা তো দূরে থাক, স্পর্শ পর্যন্ত করেনি ফিল সিমন্স। এমনকি রোজির খাটেও বসেনি। বসেছে একটু দূরে, চেয়ারে। রাত তিনটে পর্যন্ত এটা-ওটা গল্প করেছে সে। রোজির খোঁজ খবর নিয়েছে। নিজের কথাও জানিয়েছে অকপটে। শেষ পর্যন্ত ওরা জেনেছে, ওরা দু'জনেই একা। আত্মীয় বান্ধবহীন। কারও কেউ নেই।

সে রাতের মত রোজির ফ্ল্যাট ত্যাগ করার আগে তার হাতে আলতো করে চুমু খেয়েছিল ফিল সিমন্স। কথাটা আজও ভোলেনি রোজি। কোনদিন কেউ এ ধরনের ভদ্রতা দেখায়নি তার সঙ্গে। ওর পর থেকে সপ্তাহে অন্তত একদিন ইনে আসত সিমন্স, নিয়মিত। রোজির আকর্ষণে। ক্রমে ঘনিষ্ঠ হলো ওরা। এবং দু'মাসের মাথায় তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিল সিমন্স।

রোজমেরির মত মেয়ের জীবনে এ-ও আরেক অভাবনীয় ঘটনা। প্রথমে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেও সামলে নিয়েছিল। 'এখনই বিয়ের জন্যে প্রস্তুত নই আমি, সিমন্স,' পাশ কাটিয়ে যাওয়ার জন্যে উত্তর দেয় রোজি। 'পরে ভেবে দেখা যাবে।'

আসলে যুবকের অর্থনৈতিক অবস্থা তেমন ভাল বলা যায় না। অ্যাসাইলামে যা বেতন পায়, তাতে একজনের মোটামুটি চলে গেলেও দু'জনের চলবে না। তাছাড়া বিয়ে করলে সংসারে দু'দিন পর নতুন মুখ আসবে, তার ব্যাপারটাও ভাবতে হবে। আরও আছে, নিজেকে একজন গৃহিণী ভাবতেই কেমন যেন লেগে উঠেছিল তার। বাজার করা, রান্না করে স্বামীর ফিরে আসার প্রতীক্ষায় থাকা, অসহ্য! সে মুক্ত বিহঙ্গ। ঘরে বসে থাকার মত ধৈর্য, মানসিকতা কোনটাই নেই।

তা-ও না হয় ভেবে দেখা যেত যদি সিমন্সের আয়-রোজগার তেমন হত। খুব সহজভাবেই ব্যাপারটা মেনে নিল যুবক। ঠিক করল নতুন একটা চাকরির চেষ্টায় লাগবে। কিন্তু কি চাকরি? নার্সিং ছাড়া অন্য কোন কাজ জানে না সে। সমস্যাটা হয়েছে ওখানেই। দশ মাস পেরিয়ে গেছে, এখনও কিছুই করতে পারেনি সিমন্স। চেষ্টা অবশ্য চালিয়ে যাচ্ছে, হাল ছাড়েনি।

সুযোগ যখন একটা এসেই গেছে, ভাবছে রোজমেরি, কিছুতেই ছাড়া যাবে না। যে করেই হোক, সিমন্সকে রাজি করাবেই সে। তাছাড়া কাজটাও তেমন

কঠিন কিছু নয়। সাড়ে দশটায় ফোনের রিসিভার তুলল রোজি, এতক্ষণে বাসায় ফিরে এসেছে সিমন্স। ওদিকে, সবে খেতে বসেছে যুবক। এই সময় বেজে উঠল টেলিফোন। বিস্মিত হলো সিমন্স। এত রাতে সাধারণত কেউ ফোন করে না তাকে। কে হতে পারে? সাড়া দিল সে।

'সিমন্স? রোজি।' ওর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মনটা খুশি হয়ে উঠল যুবকের। 'জরুরী কথা আছে তোমার সঙ্গে। আমি আসছি।'

'এখন!' অবাক হয়ে গেল সিমন্স। 'প্রায় এগারোটা বাজে! কাজে যাওনি তুমি আজ?'

'ওসব পরে শুনো। আমি রওনা হয়ে গেলাম।'

ওর গলার স্বরে কিছু একটা আছে, বুঝল ফিল সিমন্স। বেশ উত্তেজিত মনে হলো। বিষয় কি? ভাবতে ভাবতে অভুক্ত স্পাগেটি আর দুই টুকরো শুকনো হ্যাম রিফ্রিজারেটরে তুলে রাখল সে। পরে কাজে লাগবে। পরক্ষণেই খেয়াল হলো, রোজির হয়তো খাওয়া হয়নি। পকেট আর টেবিলের ড্রয়ার হাতড়ে মোট পনেরোটা ডলার পাওয়া গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করল ফিল সিমন্স।

মাসের আরও চার দিন বাকি, অথচ সম্বল তার এই। তা-ও ভাল, রোজিকে না খেয়ে অন্তত ফিরতে হবে না। কিন্তু তার দরকার হলো না। দামী স্কচ আর বড় এক প্যাকেট ক্লাব স্যাণ্ডউইচ নিয়েই এসেছে রোজি। নীল শার্ট আর মিনি স্কার্টে অপরূপ লাগছে আজ মেয়েটিকে। চেহারাও খুব হাসিখুশি।

খেতে খেতে কাজের কথা পাড়ল রোজমেরি শেরম্যান। 'এবার আমরা বিয়ে করতে পারি, সিম। নাকি এর মধ্যে মত পাল্টেছে তোমার?'

হাঁ হয়ে গেল ফিল সিমন্স। চাউনিতে অবিশ্বাস। আধ-খাওয়া স্যাণ্ডউইচ মুখের সামনে ঝুলছে। 'মত পাল্টেছে মানে? রোজি! কী বলছ তুমি এসব?'

'ঠাট্টা করলাম। লাইসেন্সের জন্যে অ্যাপ্লাই করতে পারো এবার তুমি। ওটা পেলে আগামী সপ্তাহেই বিয়ে করব আমরা।'

স্যাণ্ডউইচ রেখে রোজির একটা হাত ধরল সে। 'সত্যি, রোজি? নাকি এটাও ঠাট্টা?'

'সত্যি। শুধু বিয়েই নয়, আগামী সপ্তাহে আরও একটা দারুণ চমক হজম করতে হবে তোমাকে।'

'মানে! কি সেটা?'

'হারবার ফ্রন্টে ওয়াটসন জেটির কাছে একটা রেস্টুরেন্ট আছে, নাম সী গাল। সী ফুডের জন্যে নামকরা। ওটার মালিক আমার পরিচিত। ইদানীং ব্যবসা ভাল চলছে না তার। তাই রেস্টুরেন্ট বিক্রি করে দিতে চাইছে সে। সমস্যা বেধেছে তার বুড়ি বউকে নিয়ে। বুড়ি যেমন মোটা, তেমনি হিংসুটে। অল্প বয়সী মেয়ে ওয়েটার কিছুতেই রাখতে দেবে না সে। যে দু'চারজন ছিল, মাসখানেক আগে বিদেয় করে দিয়েছে সবাইকে। ফলে ব্যবসা মার খেতে শুরু করে সী গালের। বাধ্য হয়ে ওটার মালিক ঠিক করেছে রেস্টুরেন্ট বেচে দেবে।

'আমরা দু'জনে যদি ওটা কিনে নিই, দারুণ হয়। দু'মাসে সীগালকে সোনার

খনিতে পরিণত করতে পারব আমরা। ওটাকে আগের মত চালু করার জন্যে উপযুক্ত কুক, মেয়ে, বাউন্সার সব আমি জোগাড় করব। সঙ্গে আমরা দু'জনও থাকছি। কী সাঙ্ঘাতিক ঘটনা হবে ব্যাপারটা ভেবে দেখো!' চাউনি ঝিলিক দিয়ে উঠল রোজির। 'রেস্টুরেন্টের ওপরতলায় থাকার ব্যবস্থা আছে। বেডরুম, সীটিংরুম সব আছে। কেবল রঙ করিয়ে নিলেই ঝকঝকে নতুন হয়ে যাবে সব।'

ভেতরের আগ্রহ অনেক আগেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ফিল সিমন্সের। শূন্য দৃষ্টিতে রোজিকে দেখছে সে। 'কিন্তু সে তো অনেক টাকার ব্যাপার, রোজি! এত টাকা পাচ্ছি কোথায় আমরা?'

তার কথা কানে গেল না রোজির। বলে চলেছে, 'ওটার মালিকের সঙ্গে আমার পাকা কথা হয়ে গেছে। বারো হাজার পেলেই ছেড়ে দেবে সে রেস্টুরেন্ট। ভেবে দেখো, মাত্র বারো হাজার!'

'আজ তোমার হয়েছে কি, রোজি? বারো হাজার তো পরের কথা, বারোশোই বা কে দেবে আমাদের?'

'দেবে দেবে। আরও অনেক বেশিই দেবে।'

'বেশি দেবে! কে?'

'ওখানেই তো মজা!' ঠোঁট টিপে হাসল রোজমেরি। 'অন্য কেউ নয়, তুমিই দেবে টাকাটা।'

অস্থির হয়ে উঠল ফিল সিমন্স। 'দোহাই, রোজি! হেঁয়ালি ছাড়ো! খুলে বলো দয়া করে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি কোথায় পাব এত টাকা?'

'কেউ একজন দিতে চায় তোমাকে। এখন শুধু তুমি রাজি হলেই হয়।'

'তবু হেঁয়ালি করছ?'

'হেঁয়ালি নয়, সিম। কেউ একজন সত্যিই বড় অঙ্কের একটা অ্যামাউন্ট দিতে চাইছে তোমাকে। বিশ হাজার ডলার। সিম, বিশ হাজার জেনারাস ডলার!'

একটু একটু করে কপালে উঠে গেল সিমন্সের বিস্ফারিত চোখের ভুরু। 'কে! কে সে, রোজি?'

আলোচনার আসল এবং জটিল বাঁকে পৌঁছে গেছি, ভাবল রোজমেরি শেরম্যান। লোভনীয় বেইট ফেলা হয়েছে পানিতে, এবারের কাজ মাছটিকে করতে হবে। করবে সে, রোজি জানে। তাকে করতেই হবে। কারণ খিদে তার শুধু পেটেই নয়, মনেও। 'এ ধরনের সুযোগ খুব কম মানুষের ভাগ্যেই জোটে, সিম,' দার্শনিকের মত বলল সে। 'তুমি যদি লোকটিকে সামান্য সহযোগিতা করো, অনায়াসে এই বিশ হাজার ডলার আমাদের হবে। আমি চাই লোকটাকে সহযোগিতা করো তুমি।'

'কিন্তু কাজটা কি?'

'তোমাদের অ্যাসাইলামের একজন রোগীকে বের করে নিয়ে যেতে চায় লোকটা। সে ব্যাপারে তাকে সাহায্য করবে তুমি। এইটুকুই কাজ।'

চমকে উঠল ফিল সিমন্স। ভয়ের ছাপ দেখা দিল দু'চোখে। 'বুঝলাম না! কাকে নিয়ে যেতে চায় সে, রোজি? এসব কি বলছ তুমি?'

দীর্ঘক্ষণ একদৃষ্টে যুবকের দিকে চেয়ে থাকল রোজি। 'আমি কি এতই কঠিন কিছু বলেছি যা বুঝতে পারছ না তুমি?' শান্ত গলায় বলল মেয়েটি। 'ব্যাপারটা খুব সহজ, সিমন্স। কঠিন কিছুই নয়। কাজটা যদি করে দিতে পারো, বিশ হাজার ডলার, তার সঙ্গে আমাকেও পাবে তুমি। আমাদের ভবিষ্যতের একটা সুরাহা হবে তাহলে। নইলে কোনটাই হবে না। অ্যাসাইলামের ওই বেতনে তোমারও কোনদিন বিয়ে করা হবে না, আর আমাকেও বুড়ি না হওয়া পর্যন্ত যা করছি তাই করে যেতে হবে। এই সুযোগটা যদি গ্রহণ না করো, আমাকে হারাবে তুমি, সিম। সে ক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে আজই আমাদের সম্পর্কের ইতি টানতে হবে। ভেবে দেখো, কোনটা চাও তুমি।'

থমকে গেল ফিল সিমন্স। এ ধরনের আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিল না মোটেই। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল সে। রোজিকে হারানোর প্রশ্নই আসে না। তেমন দিন যদি কখনও আসেই, আত্মহত্যা করা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না তার। রোজি ছাড়া জীবনটা কল্পনাই করতে পারে না সিমন্স এক মুহূর্তের জন্যেও।

'তুমি জানো, রোজি, তোমাকে না পেলে বেঁচে থাকার প্রয়োজনও ফুরিয়ে যাবে আমার। আমি তা চাই না। এবার বলো, কাকে বের করে নিয়ে যেতে চায় লোকটা। তার চাহিদা পূরণ করতে রাজি আছি আমি।'

মারফি ম্যাডেলিন জ্যাক ডজের কেনা বাঁদী।

গত গ্রীষ্মে এ শহরের মিস ফ্লোরিডা প্রতিযোগিতায় রানার আপ হয়েছিল মারফি। ইচ্ছে করলে চ্যাম্পিয়নও হতে পারত। তবে সে জন্যে বিচারকদের দু'চারজনের সঙ্গে রাত কাটাতে হত তাকে। ওতে রাজি হয়নি মারফি।

সে সময় তার সঙ্গে পরিচয় জ্যাক ডজের। এ ধরনের কোন প্রতিযোগিতা কখনই মিস করে না লোকটা। এ সব তার শিকার ধরার জায়গা, ঘুরে ঘুরে সময় মত শিকার ধরে ডজ। দেখামাত্রই মারফিকে তার খুব মনে ধরে। মেয়েটি দীর্ঘাঙ্গী। স্লিম। সোনালী চুল। নীল রঙের বড় বড় মায়াভরা চোখ। ওকে নিভৃতে পাওয়ার ইচ্ছেয় অস্থির হয়ে পড়েছিল জ্যাক ডজ। জানত না, মারফি কেবল ভার্জিনই নয়, যৌনতা সম্পর্কে মারাত্মক এক ভীতিও রয়েছে তার ভেতরে।

প্রতিযোগিতার পরদিন মেয়েটিকে পাকড়াও করার আশায় এগোল জ্যাক ডজ। ছোট একটা বারে কোক পান করছে তখন মারফি ম্যাডেলিন। গভীর রাত। বারম্যান আর দু'চারজন ছাড়া বার ফাঁকা। তার সঙ্গে যোগ দিল সে। আলাপ জমিয়ে ফেলল অল্পক্ষণের মধ্যে। এমনিতে মেয়েদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে জানে না জ্যাক ডজ, বিশেষ করে যারা তার কাছে পুরানো।

কিন্তু নতুনদের ফাঁদে ফেলার বেলায় দারুণ ওস্তাদ সে। তার চমৎকার ব্যবহার, সুদর্শন চেহারা আর আত্মবিশ্বাসী ভাবভঙ্গী খুব সহজেই আকৃষ্ট করল মারফিকে। ছেলেটিকে ভাল লেগে গেল তার। এবং তা বুঝতে পেরেই ভুলটা করে বসল ডজ। প্রথম দশ মিনিট এটা-ওটা নানান বিষয়ে আলোচনা করল সে মারফির সঙ্গে। যখন বুঝল মাছ বড়শি গিলেছে, অমনি ভেতরের পশুটা জেগে

উঠল তার।

এসব কাজে কখনই ধৈর্য ধরে রাখতে পারে না সে। কখন বরফ গলবে, কখন পানি হবে, সে আশায় সময় নষ্ট করা বোকামি মনে করে জ্যাক ডজ। তার ধারণা, এ ব্যাপারে যে যত শর্টকাট পথে এগোতে পারে, সে তত কঠিন পুরুষ। উবু হয়ে একটা জলপাই তুলে আনছে মারফি ম্যাডেলিন, এই সময় তার স্ল্যাকসের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিল ডজ।

মুহূর্তের জন্যে স্থির হয়ে গেল মারফি। ঘৃণায়, আতঙ্কে আর প্রচণ্ড রাগে দিশে হারিয়ে ফেলল। পরক্ষণে ঝটকা মেরে সিধে হলো সে, ভারি হ্যাণ্ডব্যাগটা ঘুরিয়ে দড়াম করে মেরে বসল ডজের নাকেমুখে। ব্যাগের মেটাল ক্ল্যাপের আঘাতে নাকের হাড় ভেঙে গেল তার, রক্ত গড়িয়ে নামতে লাগল স্রোতের মত। ছুটে বার ছেড়ে বেরিয়ে গেল মারফি। লজ্জায়, অপমানে চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এসেছে।

ওদিকে ঘটনাটা প্রথম থেকেই লক্ষ করেছে বারটেণ্ডার লোকটা। সহানুভূতি জানাতে গিয়ে ডজের কাটা ঘায়ে লবণ ছিটিয়ে দিল সে। তার দিকে একটা তোয়ালে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'গুড ট্রাই, বুস্টার। দারুণ তোমার নার্ভ। খুব বেশি লাগেনি তো?'

সাদা তোয়ালে লাল বানিয়ে ফিরিয়ে দিল তাকে জ্যাক ডজ। কোন উত্তর দিল না। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে বেরিয়ে এল বার ছেড়ে। তার সবুজ দু'চোখে তখন কেউটের ছোবল মারার আগমুহূর্তের চাউনি। কি বিপদ ডেকে এনেছে যদি জানত মারফি, ওইদিনই পালাত প্যারাডাইস সিটি ছেড়ে। কল্পনাও করতে পারেনি কেউটের চাইতেও কত ভয়ঙ্কর মানুষটা।

ওদিকে নিজের ফ্ল্যাটে নির্ঘুম রাত কাটল মারফি ম্যাডেলিনের। নিজের দেহে কোন পুরুষের ঘৃণিত আঙুল কিল্‌বিল্‌ করে বেড়াচ্ছে, অনুভূতিটা মুহূর্তের জন্যেও ত্যাগ করেনি তাকে। দুই দফায় এক ঘণ্টা শাওয়ারের পানিতে ভিজেও গরম মাথাটা ঠাণ্ডা করতে পারেনি মেয়েটি। একটু তন্দ্রামত আসে, আবার ছুটে যায়। শেষ রাতের দিকে পৃথিবীর সমস্ত পুরুষ জাতটার ওপরই ঘৃণা জন্মে যায় মারফির।

ছোটবেলা থেকে খুব অনাদরে মানুষ সে। বাপ ছিল এক অ্যালকোহল কারখানার শ্রমিক। বিনে পয়সার অ্যালকোহল খেয়ে বাসায় ফিরত বেহেড মাতাল হয়ে। এরপর শুরু হত তার একে-তাকে পেটানো। স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে কেউ রেহাই পেত না। এই মারের ভয়ে একদিন সংসার ছে়ে পালাল মারফির মা। তারপর তার ছোট ভাইটি।

বিপদে পড়ে গেল মারফি ম্যাডেলিন। বারো বছর বয়স তখন তার। হাতের কাছে ও ছাড়া আর কেউ নেই, কাজেই তিনজনের বরাদ্দ মার একাই হজম করতে হলো তাকে যতদিন না সে-ও পথে নামল। সেই থেকে এখানে ওখানে ঠোক্কর খেতে খেতে এ পর্যন্ত পৌঁছেছে মারফি। মায়ামির এক হোটেলে রিসেপশনিস্টের চাকরি করত এতদিন। সেটা ছেড়ে সুন্দরী প্রতিযোগিতায় নাম দিয়েছিল একটা নতুন কিছুর আশায়।

কিন্তু হলো না। চ্যাম্পিয়ন হতে না পারায় মারফির এজেন্ট হতাশ হয়ে

পড়েছে। সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। তার ওপর এই কাণ্ড! পুরুষ জাতটার বিষ ঝাড়তে ঝাড়তে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল, টেরই পায়নি মারফি। সাড়ে সাতটার দিকে ডোরবেলের আওয়াজে ধড়মড় করে উঠে বসল। এ নিশ্চয়ই তার এজেন্ট, ভাবল মারফি। হয়তো কোন নতুন অফার নিয়ে এসেছে।

ছুটে গিয়ে দরজা খুলল সে। পরক্ষণেই যেন আকাশ ভেঙে পড়ল মারফির চোয়ালে। বাঁ কানের নিচে জ্যাক ডজের প্রচণ্ড এক ঘুসি খেয়ে সিটিংরুমের মাঝ পর্যন্ত উড়ে গেল সে। তারপর আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান যখন ফিরল, নিজেকে বিছানার সঙ্গে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় আবিষ্কার করল মারফি ম্যাডেলিন। কাছেই চেয়ারে বসে আছে ডজ। চেহারায় কোন অভিব্যক্তি নেই। পাথুরে মুখে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

মারফিকে চোখ বড় বড় করে তাকাতে দেখে হেসে উঠল জ্যাক ডজ। একটা ব্রিফকেস নিয়ে এসেছিল, ওটা থেকে হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ ও একটা খুদে শিশি বের করল সে। শুরু করে দিল কাজ। ধৈর্যের সঙ্গে পাঁচ দিন পাঁচ রাত মারফির ওখানে কাটাল ডজ। যখন বুঝল কাজ হয়ে গেছে, পুরোদস্তুর হেরোইন আসক্ত করে তোলা গেছে মেয়েটিকে, তখন নিজের টেলিফোন নম্বরটা রেখে নিশ্চিন্ত মনে বেরিয়ে এল ডজ। জানে, এখন আর তাকে ছাড়া চলবে না দেমাগী মেয়েটির। এখন জ্যাক ডজই তার জীবন-মরণ।

দু'দিন পর সত্যি সত্যি ফোন এল মারফি ম্যাডেলিনের। নেশার জ্বালায় কাতর। ঠিকমত কথা বলতে পারছে না। কাঁদছে, ফোঁপাচ্ছে আর জ্যাক ডজের করুণা ভিক্ষে চাইছে। তৈরি হয়ে এল ডজ। ইঞ্জেকশন পুশ করার আগে দানবীয় আক্রোশে দলিত মথিত করল অনাঘ্রাত মারফিকে। গায়ের ঝাল মিটিয়ে নিল ইচ্ছেমত। সেই দিন থেকেই লোকটার কেনা বাঁদী মারফি ম্যাডেলিন।

দিনে দিনে হেরোইনের চাহিদা বেড়েছে তার। দিনে এখন কম করেও তিন দফা ডোজ নিতে হয়। না হলে চলে না। আগের সেই স্বাস্থ্য নেই মারফির। নেই সেই পুরুষ পাগল করা চেহারা। অতীতের কথা মনে হলে বুক ফেটে কান্না আসে তার।

একটা ওপেল ক্যাডেটে করে শিলা ব্রাউনের অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের মালিকের সঙ্গে দেখা করতে এল মারফি ম্যাডেলিন। মালিক এক বৃদ্ধা। ছোটখাটো মানুষ। স্বাস্থ্য পাখির মত। মিনি স্কার্ট পরা, গায়ে শাল জড়ানো মেয়েটিকে দেখে কেন যেন কঠিন হয়ে উঠল বৃদ্ধার চেহারা। 'কি চাই?'

'আমি মারফি ম্যাডেলিন,' বলল সে। 'শিলা ব্রাউনের কাজিন। আপনি জানেন, ও একটা সমস্যায় পড়েছে।'

'তো?'

'আপনার এখানে আসার আর ইচ্ছে নেই ওর। তাই বাধ্য হয়ে আমাকেই আসতে হলো ওর জিনিসপত্র নিতে।'

'ভালই হয়েছে। শিলার মত চোরকে আমিও রাখতে চাই না। বাজারে সুনাম আছে আমার। এখানে সব ভদ্রলোকেরা থাকে। তা...আমার পাওনা টাকার কি

হবে?'

'কত পান আপনি শিলার কাছে?'

'একশো ডলার।'

যা দাবি করে দিয়ে দিয়ো, আসার সময় মারফিকে বলে দিয়েছে জ্যাক ডজ। যদি দেখো বুড়ি ডাকাতি করছে, তবুও কথা বাড়াবে না। দিয়ে দেবে। দুটো পঞ্চাশ ডলারের নোট বুড়ির দিকে এগিয়ে দিল মারফি।

চাউনি চকচকে হয়ে উঠল বুড়ির। নোট দুটো মুঠোয় পুরে ভাল করে মারফিকে দেখতে লাগল সে। চেহারা খানিকটা প্রসন্ন। 'ওর ফ্ল্যাটের চাবিটা দিন দয়া করে,' হাত পাতল মারফি।

'শিলার কোনও কাজিন আছে জানতাম না,' অন্যমনস্কের মত বলল বৃদ্ধা। 'ও কখনও তোমার কথা বলেনি।'

'আমি টেক্সাসে থাকি,' ডজের শেখানো বুলি আওড়াল সে। 'খবর শুনে নিয়ে যেতে এসেছি ওকে।'

'আই সী।'

'চাবিটা?'

'দিচ্ছি।' ঘর থকে চাবিটা এনে দিল বৃদ্ধা। 'মালগত্র সব আজই নিয়ে যাচ্ছ তো?'

'অবশ্যই।'

'যাওয়ার সময় চাবিটা মনে করে দিয়ে যেয়ো,' বলে দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিল সে। খুব খুশি। মিথ্যে বলে চল্লিশ ডলার বেশি আদায় করা গেছে মেয়েটির কাছ থেকে।

ওদিকে মারফি ম্যাডেলিনও খুশি। জ্যাক ডজ যে ভাবে চেয়েছে, ঠিক সেভাবেই দায়িত্ব পালন করতে পেরেছে সে। বিনিময়ে আজকের রাতটা তাকে রেহাই দেবে বলে কথা দিয়েছে লোকটা। অনেক দিন পর আজ একটু শান্তিতে ঘুমাতে পারবে মারফি।

# সাত

হাত কেঁপে গেল জেরি লাটিমারের। গ্লাস থেকে কয়েক ফোঁটা কোক ছল্‌কে পড়ল কোলের ওপর। আরেকটু হলেই বিষম খাচ্ছিল। আহাম্মকের মত ডেস্ক ক্লার্কের দিকে ঘুরে তাকাল সে। হোটেল বেলিভেডারের লবিতে বসে আছে লাটিমার। আলেক্স ক্যাগারের আসার কথা, তার অপেক্ষায়।

নিতান্তই সৌভাগ্য বলতে হবে যে এই সময় এসেছে কলটা, এবং কাছে ছিল বলে ক্লার্কের প্রতিটি কথা সে স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে। প্রয়োজনের তুলনায় উঁচু

গলায় কথা বলছে লোকটা। 'কি নাম বললেন, মিস্?...মিস্টার মাসুদ রানা?' সঙ্গে হাত চলছে তার, প্যাডে নোট নিচ্ছে। '...হ্যাঁ, হ্যাঁ। কোন অসুবিধে নেই। কখন পৌঁছবেন? আজ রাতে? সাড়ে আটটায়? ঠিক আছে, স্যুইট রেডি থাকবে তাঁর জন্যে। আঁ...আঁ...আঁ, স্যুইট নাম্বার ফাইভ সেভেন। শিওর...ইউ ওয়েলকাম।'

দশ মিনিট মূর্তির মত স্থির বসে থাকল জেরি লাটিমার। ধ্যান করছে। মাসুদ রানা! সেই বিষাক্ত কাল কেউটে? সে আসছে? কিন্তু কেন, এখনই কেন? বস্ বলেছিলেন লোকটা আসবে। কিন্তু সে তো প্রফেসরের অপহরণের খবর পাওয়ার পর। কিছু না ঘটতেই সে আসছে কেন? কোন ভাবে ওদের পরিকল্পনার ব্যাপারে কিছু জেনে ফেলেছে নাকি?

বস্ জানিয়েছেন, হ্যারিসন ওয়েন্টওঅর্থ অ্যাসাইলামের নিরাপত্তার দায়িত্ব রানা এজেন্সির ঘাড়ে প্রায় জোর করে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে বছর দুয়েক আগে। লোকটা কোন রুটিন ট্যুরে আসছে না তো? নাহ্! সম্ভাবনাটা তৎক্ষণাৎ বাতিল করে দিল জেরি। খুব ভাল করে খোঁজ নিয়ে দেখেছে সে, গত তিন বছরে একবারও এ মুখো হয়নি মাসুদ রানা। তার এজেন্সির স্থানীয় স্টাফরাই সামলায় অ্যাসাইলাম। তার মানে হচ্ছে, রুটিন ট্যুর নয়। অন্য কিছু।

কি সেটা? মেরুদণ্ড বেয়ে আতঙ্কের শীতল শিহরণ বয়ে গেল লাটিমারের। হঠাৎ করে বিস্বাদ লেগে উঠল কোক। দিশেহারা বোধ করছে। কার্ল হফার বর্তমানে এ দেশে নেই, জরুরী ব্যবসার কাজে চেকোস্লোভাকিয়া গেছে। সে থাকলে এত অসহায় মনে হত না ওর নিজেকে। কাল রাতে প্রফেসরকে অ্যাসাইলাম থেকে বের করে আনার প্রোগ্রাম ওর।

অথচ আজই কি না আসছে মাসুদ রানা! মাথা ঠাণ্ডা করো! নিজেকে ধমক লাগাল লাটিমার। ওটা গরম হয়ে উঠলে কিছুই করতে পারবে না তুমি। আগে শান্ত হও, তারপর চিন্তা করো। অনেকক্ষণ মাথা ঘামাল লোকটা। তারপর ঠিক করল, কাল নয়, আজ রাতেই সারতে হবে কাজ। রাতে পৌঁছলেও নিশ্চয়ই ক্লান্ত থাকবে মাসুদ রানা। বিশ্রাম নিতেই হবে তাকে। এবং যে জন্যেই এখানে এসে থাকুক সে, কাল সকালের আগে তাতে হাত দেবে না। এই সুযোগটা ছাড়া যাবে না। যে করেই হোক, আজই কাজটা সারতে হবে।

তাহলে? কিছুই করার থাকবে না মাসুদ রানার। সকালে উঠে শুনবে সে প্রফেসর হাওয়া! কোথা দিয়ে কিভাবে কাজটা ঘটে গেল, বুঝবে না কিছুই। কোন সূত্র খুঁজে পাবে না। কাজেই? কাজেই ঘাবড়াবার কিছু নেই লাটিমারের। চিন্তা করারও কিছু নেই। চিন্তা-ভাবনা যা করার করতে হবে মাসুদ রানাকেই। সে কেবল দূরে বসে নাচন দেখবে লোকটার।

জেরি লাটিমার সাপুড়ে। মোহন বাঁশি তার হাতে। অতএব নাচা ছাড়া পথ থাকবে না কেউটের। আপনমনে হেসে উঠল জেরি। উপস্থিত বুদ্ধির জন্যে নিজেরই পিঠ চাপড়াতে ইচ্ছে হলো তার। গ্লাসের দিকে হাত বাড়াল সন্তুষ্ট মনে, কিন্তু কি খেয়াল হতে অর্ধেক দূরত্ব অতিক্রম করার আগেই স্থির হয়ে গেল হাতটা।

আচ্ছা, এমন কি হতে পারে, কিছু সন্দেহ করে অ্যাসাইলামের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কঠোর করার নির্দেশ দিয়েছে রানা তার এজেন্সিকে? অত্যন্ত কঠোর কোন ব্যবস্থা, যার ফলে প্রফেসরের কাছে পৌঁছানো অসম্ভব হয়ে পড়বে ওদের পক্ষে? আবারও আগের চিন্তা গ্রাস করল তাকে, কেন আসছে মাসুদ রানা? কেন? টক-টক পানিতে মুখটা ভরে উঠল জেরি লাটিমারের। সম্ভাবনাটা যাচাই করে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত শান্ত হবে না মন।

নির্দিষ্ট সময়েই এল আলেক্স ক্যাগার। তার উদ্দেশে নিচু কণ্ঠে এক নাগাড়ে দশ মিনিট কথা বলে গেল লাটিমার। পরিকল্পনা কাজে লাগানোর সময় চব্বিশ ঘণ্টা এগিয়ে আনা হয়েছে শুনে বিস্মিত হলো ক্যাগার। কিন্তু কোন প্রশ্ন করল না। 'ঠিক আছে,' দৃঢ় আস্থার সঙ্গে বলল, 'কিচ্ছু চিন্তা করবেন না আপনি। আমি দেখছি সব।'

'রোজির সঙ্গে জ্যাক ডজকে এখনই পাঠিয়ে দাও নার্সটার সঙ্গে দেখা করতে। কিছু একটা বুদ্ধি করে লোকটাকে পাঠাতে হবে ওখানে। গিয়ে দেখে আসুক, সিকিউরিটিতে কোনরকম পরিবর্তন ঘটেছে কি না।'

'বেশ।'

'পরিকল্পনা যেমন ছিল, তেমনিই থাকবে। শুধু সময়টা এগিয়ে আনতে হবে।'

'ঠিক আছে। বুঝেছি।'

'ওদিকে কোন পরিবর্তন ঘটে থাকলে...অবশ্য...। সে যাক্‌গে! তুমি যাও। এক্ষুণি যাও।'

ক্যাগার বেরিয়ে যেতে আরেকবার বিষয়টা পর্যালোচনা করতে বসল জেরি। এবং বুদ্ধিটা তখনই মাথায় এল। মাসুদ রানাকে ঘোল খাওয়ানোর বুদ্ধি। পেন্টহাউস স্যুইটে চলে এল লাটিমার। বসের অনুপস্থিতিতে সে অবস্থান করছে এখানে। বেডরূমের রিডিং টেবিলের ড্রয়ার থেকে ছোট, চৌকো একটা বাক্স বের করল জেরি। ওর মধ্যে আছে কোটের বোতাম আকারের দুটো লিসনিঙ ডিভাইস–খুব শক্তিশালী মাইক্রোফোন। ওগুলো পকেটে পুরে বেরিয়ে এল সে।

সার্ভিস এরিয়া থেকে খুঁজে বের করল হকিনস্‌কে। লোকটা নিগ্রো। পেন্টহাউস গেস্টদের অ্যাটেনডেন্ট। 'হ্যালো, হকিন্‌স্!'

'হ্যালো, স্যার,' ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসল লোকটা। 'গুড মর্নিং।'

'মর্নিং। স্যুইট ফাইভ সেভেন খালি আছে, না?'

'রাইট, স্যার। তবে বুক হয়ে গেছে। রিসেপশন জানাল...'

মাথা দোলাল জেরি লাটিমার। 'জানি আমি। আমারই এক বন্ধু আসছে। ভাবলাম ওর জন্যে কেমন স্যুইটের ব্যবস্থা করছ তোমরা ঘুরে দেখে আসি একবার।'

'নিশ্চই, স্যার। আসুন আমার সঙ্গে। স্যুইট ফাইভ সেভেন আমাদের সেকেণ্ড বেস্ট পেন্টহাউস স্যুইট। রাইট আফটার ইওর স্যুইট।'

করিডর পেরিয়ে নির্দিষ্ট স্যুইটের সামনে এসে থামল ওরা। দরজার তালা খুলে মাথা ঝাঁকাল হকিনস্। 'আপনি দেখুন, স্যার। আমি একটা কাজ সেরে

এখনই আসছি।'

খুশি হলো জেরি লাটিমার। কাজ করার সময় লোকটার চোখে পড়ে যাওয়ার ভয় থাকল না একেবারেই। প্রথমটা টেরেসসহ বিশাল লিভিংরুম। এক প্রান্তে গোল করে সাজানো দুই সেট সোফা। মাঝখানে লম্বা একটা কাঠের সেন্টার টেবিল। ওটার তলায় ঝটপট একটা ডিভাইস সাঁটিয়ে দিল জেরি। জিনিসটার অ্যাডেসিভ লাগানো তলা সংযোগ ঘটামাত্র কামড়ে ধরল কাঠ। পড়ে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

ঘুরতে ঘুরতে মাস্টার বেডরুমে এসে ঢুকল সে এবার। দেড় হাত গদিমোড়া অতিকায় খাটের মাথার কাছের বেডসাইড টেবিলটা পছন্দ হলো। এ ঘরের টেলিফোনটা আছে ওর ওপর। ওটার পিছনে জুড়ে দিল জেরি দ্বিতীয় ডিভাইসটা। লিভিংরুমে এসে ওয়াল পেইন্টিং দেখায় মন দিল সে। মিনিট তিনেক পর ভেতরে ঢুকল হকিনস্। 'কেমন দেখলেন, স্যার?'

'হ্যাঁ, ভাল। বেশ ভাল। ধন্যবাদ।' দশ ডলারের একটা নোট তার হাতে গুঁজে দিল জেরি লাটিমার।

হ্যারিসন ওয়েন্টওঅর্থ অ্যাসাইলাম। দাঁড়িয়ে আছে আধখানা চাঁদের মত। শহরের একদিক ঘিরে থাকা উপসাগরের বাঁ বাহুর একেবারে শেষ মাথায়। সৈকতের এক মাইল আগে। তিন একর জায়গা নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে এই গুরুগম্ভীর কমপ্লেক্স। চারদিকে আট ফুট উঁচু দেয়াল, তার ওপর ইংরেজি 'ভি' আকৃতির কাঁটাতারের বেড়া।

ভেতরের পুরোটা জুড়ে রয়েছে চমৎকার সবুজ ঘাসের পুরু গালিচা। প্রচুর গাছ-গাছালি। মাকড়সার জালের মত অ্যাসফল্টের রাস্তা আছে গাড়ি চলাচলের জন্যে। রোগীদের জন্যে দীর্ঘ দুটো ভবন, দোতলা। কমপ্লেক্সের পিছনদিকে রয়েছে ডক্টরস্ কোয়ার্টার। নার্স, সিকিউরিটি এবং স্টাফ কোয়ার্টারও আছে। এছাড়া আছে স্কুল ঘরের মত টানা একটা ঘর–গ্যারেজ। রেসিডেন্ট ডক্টরদের গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্স ইত্যাদি থাকে এখানে।

ভেতরে আসা-যাওয়ার গেট একটাই। চব্বিশ ঘণ্টা দু'জন সশস্ত্র গার্ড গেটের পাহারায় থাকে। ভেতরেও গার্ড আছে। তিন শিফটে আটজন করে সিকিউরিটি গার্ড রোগীদের ব্লক পাহারা দেয়। 'সেল ব্লক' এর নাম। হ্যারিসন অ্যাসাইলাম আসলে অত্যাধুনিক এক জেলখানা-কাম-হসপিটাল। গার্ডরা প্রত্যেকে রানা এজেন্সির। নেতৃস্থানীয় পদে তিন-চারজন বাঙালি ছাড়া এদের আর সবাই স্থানীয়, সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন শাখা থেকে অবসরপ্রাপ্ত।

এ ধরনের পাহারাদারী রানা এজেন্সির কাজ নয়। কিন্তু তবুও দায়িত্বটা নিতে হয়েছে মাসুদ রানাকে; মানবিক কারণে। বছর আড়াই আগে, এখান থেকে পর পর দু'জন মার্কিন ব্যবসায়ীকে অপহরণ করা হয়। দু'জনেই ছিলেন অত্যন্ত ধনী এবং বৃদ্ধ। বিনিময়ে অপহরণকারীরা বিশাল অঙ্কের মুক্তিপণ আদায় করে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, টাকা পেয়েও তাদের ফিরিয়ে দেয়নি

ওরা। বরং নির্মমভাবে হত্যা করে পশুর দল দুই অসহায় মানসিক রোগীকে। সৈকতে ফেলে রেখে যায় তাদের লাশ।

ঘটনাটা ভীষণ নাড়া দিয়েছিল সারা যুক্তরাষ্ট্রকে। অ্যাসাইলাম বন্ধ করে দেয়ার জোর দাবি উঠেছিল। চাপের মুখে ঘাবড়ে গিয়ে ওটার মালিক রানা এজেন্সির সাহায্য প্রার্থনা করেন। ভদ্রলোক মাসুদ রানার বিশেষ বন্ধু। ব্যবসা তখন লাটে ওঠার অবস্থা তাঁর। রোগীদের নিয়ে যাওয়ার পাঁয়তারা শুরু করেছে তাদের অভিভাবকরা। বাধ্য হয়েই এর নিরাপত্তা রক্ষার কাজে এগিয়ে আসতে হয় তখন মাসুদ রানাকে। এতে নিজের কাজের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে রানার, কিন্তু গা করেনি ও।

রানা এজেন্সি এর নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে আর কোন অঘটন ঘটেনি এখানে। ব্যবসা বেড়ে চার গুণ হয়েছে অ্যাসাইলামের। দিনে দিনে আষ্টেপৃষ্ঠে এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে রানা এজেন্সি।

সন্ধে গড়িয়ে গেছে। বিকেল থেকে ঘন কালো মেঘের ব্যস্ত আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে আকাশে। থেকে থেকে শব্দহীন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। লক্ষণ সুবিধের নয়। যে-কোন মুহূর্তে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়ে যেতে পারে।

ডিউটি ডাক্তারের রূম থেকে বেরিয়ে এল ফিল সিমন্স। হাতে ছোট একটা স্টেইনলেস স্টীলের ট্রে। এক গ্লাস পানি আর দুটো ক্যাপসুল রয়েছে ওতে। রাবার সোল পরা জুতো পায়ে করিডর ধরে নিঃশব্দে হেঁটে চলল সে প্রফেসর মারগুব হোসেনের সেলের দিকে।

বারবার বুক শুকিয়ে আসছে তার আজ। কপাল-হাতের তালু ঘেমে ঘেমে উঠছে। থেকে থেকে চমকে উঠছে সে অকারণে। দুপুরের পর থেকেই দুঃস্বপ্নের মধ্যে আছে ফিল সিমন্স। গতরাতে দশটা-ছয়টা ডিউটি ছিল। সকালে ফ্ল্যাটে ফিরে ঘুমিয়ে পড়েছিল সিমন্স। দুপুর বারোটার দিকে অপ্রত্যাশিতভাবে এসে হাজির হয় রোজমেরি শেরম্যান। তার সঙ্গে আরেক যুবক ছিল। দেখেনি তাকে সিমন্স আগে কখনও। সোনালী চুল যুবকের, সবুজ চোখ।

হলপ করে বলতে পারবে না সিমন্স, তবে মনে হয় যুবকের চোখে কী যেন এক অশুভ ছায়া দেখেছে সে। বুকটা কেন যেন কেঁপে উঠেছিল। ওরা এসেছিল বিশেষ একটা খবর জানতে। অ্যাসাইলামের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন চোখে পড়েছে কি না সিমন্সের, গার্ডের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে কি না হঠাৎ করে ইত্যাদি।

প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরেই নেতিবাচক মাথা দুলিয়েছে হতবিহ্বল ফিল সিমন্স। কাঁচা ঘুম থেকে উঠে এ জাতীয় একের পর এক প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে একাধারে আতঙ্কিত ও শ্রান্ত হয়ে উঠেছিল সে। এর ভেতর এক ফাঁকে যুবকের পরিচয় জানিয়েছে তাকে রোজি।

'আপনি ঠিক জানেন?' ঝাড়া আধঘণ্টা ওকে জেরা করার পরও চেহারা দেখে জ্যাক ডজকে খুব একটা সন্তুষ্ট বলে মনে হলো না।

'ভোর ছ'টায় বেরিয়েছি আমি। তখন পর্যন্ত যা দেখেছি, তাই বললাম

আপনাকে। পরে কিছু হয়েছে কি না জানি না।'

'তাহলে এখনই আরেকবার যান ওখানে। ঘুরে দেখে আসুন পরিস্থিতি।'

'মানে?'

'আমরা গোপনসূত্রে খবর পেয়েছি ওখানকার নিরাপত্তা কড়াকড়ি হতে যাচ্ছে। তবে কখন থেকে তা কার্যকর হবে, বা হয়েই গিয়েছে কি না, জানতে পারিনি। কাজে নামার আগে তা যেভাবে হোক জানতে হবে।'

'কিন্তু অসময়ে আমাকে দেখলে ওরা যদি সন্দেহ করে বসে কিছু?'

'যা হোক বানিয়ে টানিয়ে একটা অজুহাত দেখিয়ে ঘুরে আসুন। নইলে আমরা সবাই বিপদে পড়তে পারি।'

অতএব বাধ্য হয়েই বেরোতে হলো সিমন্সকে। অসময়ে ওকে দেখে অবাক হলো অনেকেই। জনে জনে ব্যাখ্যা করতে হলো সিমন্সকে, পার্সটা কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না সে। খুঁজে দেখতে এসেছে, ভুলে এখানে ফেলে গেছে কি না। এই ফাঁকে সিকিউরিটি সম্পর্কে যতদূর সম্ভব খোঁজ খবর নিয়েছে ও। সব আগের মতই আছে, কোথাও কোন পরিবর্তন দেখেনি সিমন্স। ফ্ল্যাটে ওর ফিরে আসার অপেক্ষায় ছিল জ্যাক ডজ আর রোজি। ওর রিপোর্ট শুনে হৃষ্ট চিত্তে বিদেয় হয়েছে তারা।

দুপুরের খাওয়া সেরে আরেক দফা ঘুম দেয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছিল সিমন্স। ঘুম পুরো না হলে রাতে ডিউটি করতে অসুবিধে হবে। কিন্তু পারা গেল না; ফের এল ওরা। দলে আগেরজনের চেয়েও ভয়ঙ্কর আরেকজন ছিল। এক চোখ কানা তার। গালে বিচ্ছিরি কাটা দাগ। জানান হলো সিমন্সকে, কাল নয়, পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময় এগিয়ে আনা হয়েছে। আজ রাতেই কাজটা সেরে ফেলবে তারা।

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়! কিন্তু এ নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ পায়নি সিমন্স। রোজিকে বিদেয় করে দিয়ে তাকে নিয়ে পড়ল ডজ ও ক্যাগার। শুরু হলো ব্রিফিং। সিমন্সকে কি ভাবে কি করতে হবে, বুঝিয়ে দেয়া হলো। কাজ সেরে যখন বেরোল লোক দুটো, সূর্যের আলো তার অনেক আগেই বিদেয় নিয়েছে পৃথিবী থেকে। ঘুমানোর প্রশ্নই আসে না তখন আর।

রাত দশটা। হারবার ফ্রন্টের এক নামকরা রেস্টুরেন্টের সামনে এসে থামল জেরি লাটিমারের দামী ক্যাডিলাক। ধীরেসুস্থে গাড়ি লক করল সে। রেস্টুরেন্টে এসে ঢুকল। দোতলা রেস্টুরেন্ট। পরিচিত। আগেও কয়েকবার এসেছে সে এখানে। কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা দোতলায় উঠে এল জেরি।

দু'পাশে চারজন বসার মত ছোট ছোট কেবিন। ওর একটায় ঢুকে পড়ল সে নির্দ্বিধায়, কারণ, টেলিফোনে কেবিনটা সন্ধের আগেই রিজার্ভ করে রেখেছিল জেরি। তার পাঁচ মিনিট পর ভেতরে ঢুকল ক্যাগার ও ডজ। মুখোমুখি বসল জেরির।

'কেমন এগোচ্ছে কাজ?' রাতের খাওয়া সেরে নিয়ে কাজের কথা পাড়ল সে।

হাতের কোক ভরা গ্লাসটা দোলাচ্ছে মৃদু মৃদু, ভেতরে বরফের চাকাগুলো কাঁচের গায়ে বাড়ি খেয়ে টুং টাং আওয়াজ তুলছে।

'মন্দ নয়,' বলল ক্যাগার। 'মুঠোয় পুরে ফেলেছি মেয়েটাকে। কোন সমস্যা হয়নি।'

'ভাল। তবে একটা কথা, কেউ যেন ভুলেও কোনভাবে বিরক্ত না করে মেয়েটিকে। সবাইকে কথাটা জানিয়ে দেবে তুমি, ক্যাগার। ব্যাপারটা তোমার ওপর ছেড়ে দিয়েছি আমি।'

'ভাববেন না ভুলে গেছি। মনে আছে আমার। আমি দেখব।'

'ওর যদি কোন ক্ষতি হয়, বসের কাছে তার কৈফিয়ত দিতে হবে আমাকে। কেন জানি না, তবে এ অপারেশনে মেয়েটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

'বললাম তো, কোন চিন্তা নেই।' বুঝল ক্যাগার, ডজের খাসলত জানা আছে বলে তাকে শোনানোর জন্যেই বলছে জেরি কথাগুলো। সে যদি জানতে পারে সকালে কি ঘটাতে চাইছিল ডজ···আড়চোখে ডজকে দেখল ক্যাগার। সে-ও একই কাজে ব্যস্ত। চোরা চোখে দেখছে ক্যাগারকে।

'যাক্‌গে, এবার সেই মেয়ে আর তার বয়-ফ্রেণ্ডের ব্যাপারে বলো, শুনি।'

'ওদিকে সব রেডি। আটটা পর্যন্ত ওর বয়-ফ্রেণ্ডকে ব্রিফ করেছি আমরা। সব বিলকুল ঠিক।' ভাবল ক্যাগার, পরিকল্পনা হঠাৎ একদিন এগিয়ে আনা হলো কেন জিজ্ঞেস করবে। পরে কি মনে হতে করল না।

'এ অপারেশনে কোন লুজ এণ্ড রাখা চলবে না,' ক্যাগারের চোখে চোখ রেখে বলল জেরি। 'চাপে পড়ে নার্স ছেলেটা মুখ খুলতে পারে। তাই একেও আলেক ওয়াটসনের মত···বুঝতে পেরেছ তো?'

'নিশ্চই। আর তার বান্ধবী?'

'মেয়েটাও আরেক লুজ এণ্ড। কোন দুর্ঘটনায় যদি মৃত্যু হয় মেয়েটার, তার জন্যে বরাদ্দ বিশ হাজার ডলার কার পকেটে গেল দেখতে যাব না আমি। রোজি যদি টাকা দাবি করতে না আসে, দেখতে যাবই বা কেন?'

পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল ক্যাগার ও ডজ।

# আট

কংকোর্স থেকে বেরোতেই মাসুদ রানার পথরোধ করে দাঁড়াল ওর চেয়েও ইঞ্চিখানেক লম্বা এক যুবক। হাসছে দাঁত বের করে। 'স্লামালেকুম, মাসুদ ভাই। কেমন আছেন?'

সুটকেসবাহী ট্রলিটা এক পাশে দাঁড় করিয়ে যুবকের সঙ্গে হাত মেলাল রানা। 'ওয়ালাইকুম সালাম। ভাল আছি। তুমি কেমন, আলতাফ?'

সঙ্গে সঙ্গে হাসি মুখটা করুণ হয়ে উঠল যুবকের। 'বেশি ভাল নেই, বস্।

পাগলা গারদের দারোয়ানগিরি করতে করতে জান পেরেশান হয়ে গেল।'

ভিড় ঠেলে এগোল ওরা। ট্রলিটা রানার হাত থেকে প্রায় কেড়েই নিয়েছে যুবক। রানা এজেন্সির স্থানীয় শাখা-ইন-চার্জ সে। শাখা না বলে এটাকে উপশাখা বলাই ভাল। হ্যারিসন অ্যাসাইলামের নিরাপত্তার দায়িত্ব ঘাড়ে চেপে বসার পর মায়ামি থেকে এদের কয়েকজনকে নিয়ে এসে প্যারাডাইস সিটিতে বসিয়ে দিয়েছে মাসুদ রানা। শুধুই লিয়াজোঁ রক্ষার স্বার্থে। অ্যাসাইলামের গার্ড বাহিনী পরিচালনা করা ছাড়া তেমন আর কোন কাজ নেই এদের।

'আর কিছুদিন চালিয়ে যাও কষ্ট করে। তারপর তোমার জন্যে অন্য ব্যবস্থা করব।'

আলতাফের ঝকঝকে জাপানি সেডানে উঠল ওরা। গাড়ি ছাড়ল আলতাফ হোটেল বেলিভেডারের উদ্দেশে। 'আমাদের ওখানে আপনার থাকার তেমন সুবিধে হবে না, মাসুদ ভাই। তাই হোটেলে ব্যবস্থা করেছি।'

শুনতে পেল না মাসুদ রানা। কাজের চিন্তায় ডুবে গেছে। 'ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে?'

'জ্বি।'

'ওরা রওনা হয়েছে?'

'হ্যাঁ। দু'জন আলাদা আলাদা রওনা হয়েছেন গতকাল।'

মাথা ঝাঁকাল মাসুদ রানা। 'সেরকমই কথা।'

'ওঁদের জন্যেও হোটেল বুক করতে চেয়েছিলাম আমি। কিন্তু নিষেধ করলেন সোহেল ভাই।'

'ওরা অন্যখানে উঠবে। সে যাক, আসল কাজের কতদূর?'

'সব কিছু ফাইন্যাল করে ফেলেছি। আপনি যেদিন চাইবেন,' ঘুরে তাকাল আলতাফ। 'আপনি কি আজই...'

'না। আজ নয়। কাল ঠিক করব ওসব।'

হোটেল লবি থেকে আলতাফকে ফেরত পাঠিয়ে দিল মাসুদ রানা। 'রাত হয়েছে। রেস্ট নাও গিয়ে।'

'সকালে আসি?'

'না। ন'টার দিকে আমিই আসব তোমার অফিসে।'

স্যুইটে পা রেখে চোখ চড়কগাছ হয়ে গেল মাসুদ রানার। করেছে কি আলতাফ? কি দরকার ছিল এত বড় স্যুইটের? শুধু শুধু পয়সা নষ্ট! দরজা খুলে দিয়ে বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল সার্ভিস ম্যান হকিনস্। রানার ভাবভঙ্গি দেখে মনে সন্দেহ জাগল তার। 'স্যুইটটা আপনার পছন্দ হয়নি, স্যার?'

'হ্যাঁ, খু-উ-ব! দারুণ স্যুইট!'

'তাই বলুন,' হাসল নিগ্রো। 'আপনার বন্ধু নিজে এসে পছন্দ করে গেছেন।'

'ওর মাথা ভাঙব কাল আমি।'

'ইয়েস, স্যার?'

'না, কিছু না।'

'আমি সার্ভিস ম্যান, স্যার। হকিনস্। প্রয়োজন হলেই বেল বাজাবেন।'
'শিওর হকিনস্, থ্যাঙ্কিউ।'

পাশের স্যুইটে একটা বন্ধ কুজিটে নিঃশব্দে কাজ করে চলেছে বড়সড় এক রেভক্স টেপ রেকর্ডার। থালা সাইজের দুটো রীল ঘুরছে মন্থর গতিতে। ওদের সব কথা স্পষ্ট ধারণ করে নিল যন্ত্রটা।

প্রফেসর মারগুব হোসেনের সেলের তালা খুলল ফিল সিমন্স। ধীরপায়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। ঢোকার আগে ট্রের ক্যাপসুল দুটো বদলে ফেলেছে সে। ও দুটো এখন সিমন্সের প্যান্টের পকেটে। অন্য দুটো ক্যাপসুল দেখা যাচ্ছে সেখানে, বিকেলে কাঁচের চোখওয়ালা লোকটা দিয়েছে তাকে ওগুলো।

এই সামান্য পাল্টাপাল্টি করতেই ঘেমে নেয়ে উঠেছে ফিল সিমন্স। ঢিব্ ঢিব্ করছে বুকের ভেতর। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে। কিন্তু ভয় যতই লাগুক, এখন আর পিছিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। মন জুড়ে বসেছে তার বিশ হাজার ডলার। ও টাকা তার চাই-ই চাই। ওটা পেলেই বিয়ে করতে পারবে সিমন্স আর রোজি। ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে হবে না।

'গুড ইভনিং, স্যার,' জোর করে হাসল সে মারগুব হোসেনের দিকে তাকিয়ে। 'আজ কেমন আছেন আপনি?' জানে, উত্তর পাবে না, তবু প্রশ্ন করল লোকটা। বেশ কয়েক মাস এখানে আছেন প্রফেসর, কখনও তাঁর মুখ থেকে একটা শব্দও বেরোতে শোনেনি সে। আজও তাই হলো। মুখ তুলে সিমন্সকে দেখলেন তিনি চোখ কুঁচকে, পরক্ষণেই নামিয়ে নিলেন দৃষ্টি।

খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে আছেন প্রফেসর। বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে কার্পেট খুঁটছেন। দিন সাতেক আগে পঁয়তাল্লিশে পা দিয়েছেন প্রফেসর। উচ্চতা পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি। চওড়া কপাল। বয়স অনুপাতে কপালের রেখাগুলো সংখ্যায় যেমন বেশি, তেমনি গভীর। দীর্ঘ খাড়া নাক। চোখে পুরু কাঁচের চশমা। মাথার তালুতে ছোট্ট টাক। বাকি চুলের বেশির ভাগই পাকা। রুক্ষ, এলোমেলো।

'ক্যাপসুল দুটো খেয়ে নিন, স্যার। খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। সকালে উঠে দেখবেন একদম সুস্থ হয়ে গেছেন আপনি।'

হাত পেতে নিলেন তিনি ও দুটো। মুখে পুরে পানি খেলেন দুই-তিন ঢোক। সন্তুষ্ট মনে বেরিয়ে গেল নার্স। তালা লাগানোর শব্দে চোয়াল নড়ে উঠল প্রফেসরের, পানি খাওয়ার সময় কায়দা করে জিভের নিচে আটকে রাখা ক্যাপসুল দুটো ফেললেন হাতের তালুতে। এরা কেউ জানে না, সব সময় এই কাজই করে থাকেন মারগুব হোসেন। কোন ওষুধই খান না তিনি।

ডাক্তারের রুমে ফিরে এল সিমন্স। 'তোমার রোগীর কি খবর, সিমন্স। কেমন মনে হলো আজ?' প্রশ্ন করল ডাক্তার।

'একই রকম, স্যার। গম্ভীর।'

'কোন ট্রাবল?'

'একদম না, স্যার।'

'গুড।'

রাত দুটো দশে এল ওরা, চারজন। আলেক্স ক্যাগার, জ্যাক ডজ এবং আরও দু'জন। এই দু'জনই আজ সকালে সংশোধনাগারের সামনে থেকে ধরে নিয়ে গেছে শিলাকে। কাজ করে এক প্রাইভেট গোয়েন্দা সংস্থায়। ওরা যখন এল প্রকৃতি তখন রুদ্র রোষে ফুঁসছে। প্রচণ্ড ঝড় আর বৃষ্টির তাণ্ডব শুরু হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। তেজ একটু একটু করে বেড়েই চলেছে তার। যেন ওদের সহযোগিতা করার জন্যে প্রকৃতিও আজ একজোট হয়েছে।

নিশ্চিন্ত মনে অ্যাসাইলামের মেইন গেটে এসে থামল ওদের নিসান পেট্রল। গার্ডরা বাধা দেবে না, জানে ওরা। সিমন্সের কড়া ঘুমের ওষুধ মেশানো কফি খেয়ে ঘুমিয়ে আছে তারা। গার্ডদের জন্যে কফি তৈরিই থাকে সব সময়, যার যখন ইচ্ছে খায়। সিমন্স কেবল ওষুধটা ঢেলে দিয়েছে ডিস্পেনসারে। ওষুধটা কড়া, তবে কাজ করে ধীরে। ফলে বোঝার উপায় নেই যে ওটাই দায়ী ঘুম পাড়িয়ে দেয়ার জন্যে। অবশ্য সেই ভরসাতেই নয় শুধু, রওনা হওয়ার আগে ফোনে কথাও বলেছে ডজ নার্সটার সঙ্গে, নিশ্চিত হয়ে নিয়েছে সব ঠিকঠাক আছে কি না।

ভেজা রেইনকোট, জুতো, পোর্চে রেখে এগোল ওরা। যাতে মেঝেতে জুতোর দাগ বা পানি জমে না থাকে। গোয়েন্দা দু'জন থাকল করিডরে, ক্যাগার আর ডজ সিমন্সকে অনুসরণ করে প্রফেসরের সেলে গিয়ে ঢুকল। দরজার দিকে পিছন ফিরে ঘুমিয়ে আছেন প্রফেসর। ঝুঁকে তার মুখটা দেখল ক্যাগার। ঠিকই আছে। এর ছবিই তাকে দেখিয়েছিল জেরি।

'ঘুমের ওষুধ খাইয়েছিলে?' জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ।'

'গুড।'

সিমন্সের মনোযোগ ক্যাগারের দিকে, এই সুযোগে তার পিছনে এসে দাঁড়াল ডজ। হাতে বেরিয়ে এসেছে বালি ঠাসা ফুটখানেক দীর্ঘ এক চামড়ার রুলার। গায়ের জোরে জিনিসটা নার্সের মাথায় বসিয়ে দিল সে। মাঝখান থেকে দু'ভাগ হয়ে গেল তার খুলি। ছিটকে দেয়ালে গিয়ে লাগল রক্ত-মগজ। প্রায় নিঃশব্দে কার্পেটের ওপর আছড়ে পড়ল প্রাণহীন দেহটা। রুলারটা হিপ পকেটে ভরে একটা কাঠের চেয়ার মাথার ওপর তুলে ধরল ডজ উল্টো করে। সজোরে আছাড় মারল ওটাকে মেঝের ওপর। মড়াৎ করে ভেঙে গেল একটা পায়া।

আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল প্রফেসরের। ধড়মড় করে উঠে বসলেন তিনি, এবং জমে গেলেন ব্যাপার দেখে। চট্ করে পকেট থেকে মাউজার বের করল বিস্মিত ক্যাগার। 'চুপ!' শাসাল সে। 'কোন আওয়াজ না!' ব্যাটাকে ঘুমের ওষুধ খাওয়ায়নি নাকি নার্স হারামজাদা? ভাবল সে।

একই প্রশ্ন জ্যাক ডজের মনেও জাগল। রেগেমেগে জোর এক লাথি মেরে বসল সে মৃতদেহটার পাঁজরে। 'শুয়োরের বাচ্চা!'

'থাক্, হয়েছে! মরা মানুষের ওপর রাগ ঝাড়তে হবে না আর।'

চেয়ারের ভাঙা পায়াটা তুলে নিল জ্যাক ডজ।

*

সাড়ে তিনটা। বৃষ্টি থেমে গেছে আধঘণ্টা আগে। ঝড়ও নেই। থেকে থেকে ভেজা দমকা বাতাস দিচ্ছে বাইরে। প্যারাডাইস ইনের বারে বসে আছে রোজমেরি। ক্লাব ফাঁকা। সবাই চলে গেছে। সব সময় ভোর চারটে পর্যন্ত খোলা থাকে ইন। কিন্তু আবহাওয়ার জন্যে আজ তেমন জমেনি। রোজি আর বারম্যান ছাড়া ভেতরে আর কেউ নেই এ মুহূর্তে। লোকটা জ্যামাইকান, গ্লাস ধুয়ে-মুছে সাজিয়ে রাখছে।

তার মুখোমুখি বসে আছে রোজি। হাতে পানীয়ের গ্লাস। চোখ আধবোজা। আজ বেশ পান করে ফেলেছে সে। খুশিতে। মাঝেমধ্যে অসংলগ্ন কথাও বলছে, অন্তত বারম্যান লোকটির সে রকমই ধারণা। 'বাসায় যাও, রোজি,' বলল জ্যামাইকান। 'ঝড় থেমে গেছে। ঘুমাও গিয়ে।'

'হ্যাঁ, যাব। কাল থেকে···আর আসব না···এখানে। তাই···যেতে মন চায় না।'

'আসবে না কেন?'

'কথাটা···কিন্তু গোপন রেখো। তুমি বন্ধু···বলেই বলছি। কাল একটা রেস্টুরেন্ট কিনতে···যাচ্ছি আমি।'

'গ্রেট,' দাঁত বের করে হাসল জ্যামাইকান। 'কিনে ফেলো। পরশু তাহলে আমিও হোয়াইট হাউজ কিনে নেব।'

'বি-বিশ্বাস হলো না? ঠিক···আছে, পার্ককে জিজ্ঞেস করে দেখ। ওর সী-গাল কিনছি আমি। আগে ওটা···ঠিকমত চালু···করি। তারপর···একদিন সময় করে···এসো। তোমার জন্যে স-ব ফ্রী। কোন···পয়সা দিতে হবে না।'

চারটা পর্যন্ত বক্ বক্ করে গেল রোজমেরি। তার কিছু শুনল লোকটা, কিছু শুনল না। দেয়াল ঘড়িতে চারটার ঘণ্টা পড়তে মেয়েটিকে প্রায় ঠেলে বের করে দিল সে, ইনে তালা মেরে রোজির হাত ধরে টানল। 'চলো, বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসি তোমাকে।'

'তুমি যাও। আমি একটু পরে আসছি।'

'একা একা কি করবে তুমি এখানে?'

মুখ ঘুরিয়ে কাছের একটা জেটি দেখাল রোজি। 'ওখানে বসে ঠাণ্ডা হাওয়া খাবো।'

কথা না বাড়িয়ে নিজের আস্তানার দিকে পা বাড়াল জ্যামাইকান। ঘুমে চোখ বুজে আসছে তার। রোজি চলল সৈকতের দিকে। সময় কাটানো দরকার। কথা আছে কাজ সেরে টাকা দিতে এখানে আসবে জ্যাক ডজ। ওটা নিয়ে একবারে ফিরবে সে। ইনের উষ্ণ পরিবেশ থেকে ঠাণ্ডা দমকা বাতাসের মধ্যে বেরিয়ে এসে শীত লেগে উঠল রোজমেরির। তবু থামল না সে, দু'হাতে নিজেকে আলিঙ্গন করে জেটিতে এসে উঠল।

জেটিটা ছোট। একটা মাত্র ডিঙ্গি বাঁধা আছে ওর খুঁটির সঙ্গে। হাঁটু সমান ঢেউ আছড়ে পড়ছে সৈকতে, সেই দোলায় দুলছে ডিঙ্গি। ওটার ঠিক ওপরে এসে

দাঁড়াল রোজমেরি শেরম্যান।

ওদিকে, প্যারাডাইস ইনের একদিকের অন্ধকার দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল আলেক্স ক্যাগার। বারম্যানের প্রস্থান এবং রোজির জেটিতে গিয়ে ওঠা, সবই দেখেছে সে। মেয়েটিকে অল্প অল্প দুলতে দেখে বুঝে নিয়েছে ব্যাপারটা। ভালই হয়েছে, নিজেকে শোনাল সে, অনেক সহজ হবে কাজটা। দ্রুত পা চালাল ক্যাগার জেটির উদ্দেশে। কেউ নেই ধারে কাছে, সুযোগটা চমৎকার।

তার পায়ের আওয়াজ কানে এল রোজমেরির। ঘুরে তাকাল সে। আবছা একটা কাঠামো দেখতে পেল, ওর দিকেই আসছে। নিশ্চয়ই কোন নিঃসঙ্গ নাবিক হবে। একা রোজিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রেম করার বাসনা জেগেছে হয়তো। নৌকা দেখায় মন দিল সে। এ ধরনের ঝামেলা প্রায়ই পোহাতে হয় ওদের, গা সওয়া হয়ে গেছে। এবং এসব উটকো চরিত্র সামাল দিতেও জানে রোজি। আসুক ব্যাটা, পরোয়া করে না সে।

জেটিতে উঠেছে লোকটা, টের পেল রোজি। এগিয়ে আসছে, এখনই জড়িয়ে ধরবে পিছন থেকে। যখন মনে হলো সময় হয়েছে, ঘুরে দাঁড়াতে গেল সে। কিন্তু পারল না। এত দ্রুত ঘটে গেল ব্যাপারটা যে কিছুই করতে পারল না রোজমেরি। দুই বজ্র মুঠিতে ওর দুই গোড়ালি শক্ত করে চেপে ধরল লোকটা, পর মুহূর্তে এক হ্যাঁচকা টানে শূন্যে তুলে ফেলল তাকে।

রোজির দু'হাত যখন উন্মত্তের মত বাতাসে কিছু একটা অবলম্বন খুঁজছে নিজেকে সামাল দেয়ার জন্যে, গোড়ালি ছেড়ে দিল আলেক্স ক্যাগার। মাথা নিচে, পা ওপরে, ডাইভ দেয়ার ভঙ্গিতে নিচের দিকে রওনা দিল সে। ডিঙ্গির চোখা গলুইয়ে মাথার তালু দিয়ে পড়ল রোজি, সংঘর্ষের ভয়ঙ্কর আওয়াজটা ছিনিয়ে নিল দমকা বাতাস। ক্যাগার ছাড়া কেউ শুনতে পেল না।

চুরমার হয়ে গেল রোজির খুলি। 'ঝপাৎ' শব্দে হারবারের তেলতেলে পানিতে পড়ল মেয়েটা। পড়ে আর উঠল না। দুই মিনিট স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল আলেক্স ক্যাগার। নিশ্চিত হলো আর উঠছে না মেয়েটি, সত্যি সত্যি মরে গেছে। ধীর পায়ে জেটি ত্যাগ করল সে।

মনটা খুব খুশি। জেরি লাটিমারের দেয়া দায়িত্ব চমৎকারভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছে তারা। শিলা ব্রাউনকে মুঠোয় পুরতে পেরেছে, পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে ছেড়েছে তার প্রেমিক জিম ফ্রিম্যানকে। নির্বিঘ্নে তুলে আনা গেছে প্রফেসরকে। এবং পরপারে রওনা করিয়ে দিতে পেরেছে ফিল সিমন্স এবং তার প্রেমিকা রোজিকে। কাজ আপাতত শেষ। কোথাও কোন লুজ এণ্ড নেই। রাখেনি তারা।

চারজন মৃত, একজন হসপিটালে এবং আরেকজন···হাসল ক্যাগার। নিখুঁত ফিনিশিং।

টেলিফোনের বিরতিহীন আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল আলতাফের। চোখ খুলেই অভ্যেস বশে দেয়ালঘড়ির দিকে তাকাল সে। চারটে বিশ। মুহূর্তে সজাগ, সতর্ক

হয়ে উঠল আলতাফ। এই অসময়ে···কে হতে পারে! 'হ্যালো!'

'স্যার···স্যার, আমি করিম, স্যার!' শক্ত হয়ে গেল ও। করিম হ্যারিসন অ্যাসাইলামের সিকিউরিটি-ইন-চার্জ। কি হয়েছে! অমন করে কথা বলছে কেন ও?

'কি হয়েছে, করিম?'

'স্যা-স্যার! সর্বনাশ হয়ে গেছে! প্রফেসর মারগুব···।'

তড়াক করে উঠে বসল আলতাফ। 'কি! কি হয়েছে তাঁর?'

'তাঁকে খুঁ-খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, স্যার।'

কণ্ঠ চড়ে গেল ওর। 'তার মানে? কি বলছ তুমি?'

'প্রফেসরের সেলের দরজা খোলা, স্যার। ভেতরে এক মেল নার্স মরে পড়ে আছে। মাথায় কিছু দিয়ে আঘাত করে···।' ফুঁপিয়ে উঠল করিম। 'স্যার, কি করব কিছু বুঝতে পারছি না। আপনি···।'

ঘরদোর চোখের সামনে দুলতে শুরু করে দিয়েছে আলতাফের। এত জোরে রিসিভার চেপে ধরেছে, যে-কোন মুহূর্তে মট্ করে ভেঙে যেতে পারে জিনিসটা। 'কি আবোল-তাবোল বকছ তুমি! কি করে ঘটল এমন ঘটনা? তোমরা সব কোথায় ছিলে?' মন বলছে এ দুঃস্বপ্ন, ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখছে আলতাফ। এ কিছুতেই সত্য হতে পারে না।

'স্যার, ঝড় শুরু হতে ঠাণ্ডায়,' ঢোক গিলল করিম, 'ক-কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, টেরই পাইনি। এই ফাঁকে···হঠাৎ জেগে দেখি এই অবস্থা।'

'সে তো রাত একটার কথা! এতক্ষণ পর্যন্ত···ব্যাপারটা কখন তোমার চোখে পড়েছে? আর সবাই কোথায়?'

'এইমাত্র দেখেছি, স্যার। অন্যরা আছে···সবাই···।'

প্রচণ্ড রাগে মাথার চুল সব উপড়ে ফেলতে ইচ্ছে হলো আলতাফের। ফুঁসতে লাগল নিষ্ফল আক্রোশে। 'আশেপাশে ঠিকমত খুঁজে দেখেছ তো?' বলেই বুঝল বোকার মত হয়ে গেল প্রশ্নটা। 'আচ্ছা, শোনো, আমি আসছি এখনই। তুমি খেয়াল রাখো, ওই সেলের কোন কিছু যেন কেউ স্পর্শ না করে।'

'জ্বি, স্যার।'

'আর সবাই কোথায়? কি আশ্চর্য!'

'সব এখানেই আছে।'

'ঠিক আছে। রাখলাম।' রিসিভার রেখে শূন্য দৃষ্টিতে সেটটার দিকে চেয়ে থাকল আলতাফ। মাথা গুলিয়ে গেছে পুরোপুরি। কেমন হলো ব্যাপারটা? কোন মুখে এ খবর দেবে সে মাসুদ ভাইকে? কিন্তু না দিয়েই বা উপায় কি। বরং যত তাড়াতাড়ি দেয়া যায়, ততই মঙ্গল। হোটেলে ফোন করল সে। 'স্যুইট ফাইভ সেভেনে দিন, প্লীজ!'

'কে বলছেন, স্যার?'

'আলতাফ মির্জা।'

'কিন্তু, স্যার, এতরাতে···!'

'ইটস মোস্ট আর্জেন্ট। হারি ইট আপ!'

'ও-কে, স্যার। জাস্ট হোল্ড অন।'

তৃতীয় বাই-পাস রিঙে সাড়া দিল মাসুদ রানা। গলা শুনে পরিষ্কার বোঝা গেল, আলতাফের মত একই রকম বিস্মিত হয়েছে ও। 'ইয়েস?'

'আমি আলতাফ, মাসুদ ভাই।'

'আলতাফ!'

'জ্বি। মাসুদ ভাই, অ্যাসাইলামে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। করিম টেলিফোনে...'

'কাট্ ইট!' ধমকে উঠল রানা। 'সংক্ষেপে বলো কি হয়েছে।'

'প্রফেসরকে পাওয়া যাচ্ছে না।' রানার দম আটকে যাওয়ার শব্দ শুনল আলতাফ।

'কি!'

'তাঁর সেলে একজন মেল নার্সকে মৃত পাওয়া গেছে। খুন করা হয়েছে লোকটাকে। প্রফেসর নেই।'

কয়েক মুহূর্ত বোবা হয়ে থাকল মাসুদ রানা। 'সে কি!' কোনমতে বলল ও। মাথা কাজ করছে না। কিচ্ছু ভাবতে পারছে না রানা। 'কয়জন গার্ড ছিল রাতের শিফটে?'

'দশজন, মাসুদ ভাই। আটজন ভেতরে, দু'জন মেইন গেটে।'

'ওরা কেউ কিছু টের পায়নি?'

'করিমের কথায় তাই মনে হয়েছে আমার ওখানে না যাওয়া পর্যন্ত বোঝা যাবে না।'

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল মাসুদ রানা। অবশেষে বলল, 'হায় খোদা!'

'করিমকে বলেছি ওই সেলের কিছুতে কেউ যাতে হাত না লাগায়, সেদিকে লক্ষ রাখতে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ও। 'পুলিসকে খবর দিয়েছ?'

'এখনও দেইনি।'

'জানাও ওদের। এটা হোমিসাইডাল কেস। সময়মত না জানালে অসুবিধে হবে পরে। তুমি ওদের ফোন করে এসো ওখানে। আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি।' ফোন রেখে দিল মাসুদ রানা।

ওদিকে খবর শুনে সশব্দে আঁতকে উঠল পুলিস চীফ, ফ্রেড উইলিয়ামসন। 'অ্যাঁ! বলেন কি? মারগুব হোসেন...মানে, সেই পাগল বৈজ্ঞানিক?'

'হ্যাঁ।'

'সর্বনাশ করেছে! আপনাদের এতগুলো গার্ড থাকতে...।'

'আমিও তাই ভাবছি,' গম্ভীর গলায় বলল আলতাফ। 'কিন্তু ওখানে না যাওয়া পর্যন্ত উত্তরটা পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।'

'ঠিক আছে, যান আপনি,' চীফের গলায় স্পষ্ট বিরক্তি। 'আমি আসছি।' গজ গজ করতে করতে ফোন রেখে দিল চীফ।

*

হেডফোন খুলে হাসতে লাগল জেরি লাটিমার। টেলিফোনে মাসুদ রানা যা যা বলেছে, সব কানে এসেছে স্পষ্ট। এই শুরু হলো লোকটার নাচন, ভাবল সে। দেখা যাক, কত বুদ্ধি ধরে লোকটা। নিজের উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা করল জেরি। মাথা খাটিয়ে মাসুদ রানার ঘরে লিসনিঙ ডিভাইস প্ল্যান্ট করেছে সে, শুনে বস্ খুশি না হয়ে পারবেন না।

তাছাড়া জেরির ওপর যে দায়িত্ব তিনি দিয়ে গেছেন, সেটাও অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে পালন করতে পেরেছে সে। চমৎকার কাজ দেখিয়েছে ক্যাগার ও জেরি। ওরা কাজের মানুষ বলেই এত সহজে প্রফেসর মারগুব হোসেন আর শিলা ব্রাউনকে হাত করা সম্ভব হয়েছে তার পক্ষে। অথচ কোথাও কোন লুজ এণ্ড নেই। রাখেনি ক্যাগার-ডজ। আরও একবার যোগ্যতা পরীক্ষায় নিজেদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রমাণ করেছে তারা।

এবার প্রফেসরের দায়িত্ব বস্ এবং জুরগেন গুন্থার ওরফে পল ম্যাথিয়াসের। অবশ্য হফার প্রাগ থেকে না ফেরা পর্যন্ত মুক্তি নেই তার। হাসিটা সামান্য চোট খেল জেরির। সার্ভিস ম্যান হকিনসের কথা মনে পড়ে গেছে। লোকটা···লোকটা প্রায় ফাঁসিয়েই দিচ্ছিল তাকে। রেকর্ড হওয়া ওদের কথোপকথন পরে শুনেছে সে। লোকটা···ওর ওপর নজর রাখা দরকার। নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল জেরি লাটিমার। প্রয়োজনে ওকেও···।

হ্যারিসন ওয়েন্টওঅর্থ অ্যাসাইলাম। চারটা পঁয়তাল্লিশ। প্রফেসর মারগুব হোসেনের সেলের দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর বোলাল মাসুদ রানা। রুমটা বেশ বড়– আঠারো বাই আঠারো। গেটের উল্টোদিকের দেয়ালে বড় দুটো আর্মার্ড গ্লাসের জানালা। খোলার ব্যবস্থা নেই। রাখা হয়নি।

বাইরের ফুলের বাগান, লন দেখা যায় জানালা দিয়ে। দুটোর মাঝখানে দেয়ালের গায়ে বসানো বড়সড় 'আমেরিকান এয়ার' এয়ার কণ্ডিশনার। গেটে ডবল লক্। দেখে বোঝা না গেলেও এটা আক্ষরিক অর্থেই জেলখানা। দুর্ভেদ্য। প্রাইভেট হলেও বিশ্বের সর্ববৃহৎ ক্রিমিনাল অ্যাসাইলাম। অস্বাভাবিক ব্যয়বহুল।

ধারণ ক্ষমতা দুইশো। এ মুহূর্তে আছে একশো বাইশজন। এর মধ্যে অন্তত পঞ্চাশজন বদ্ধ উন্মাদ। এবং ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক। একটা ব্যাপারে এদের মিল আছে, সবাই পয়সাওয়ালা। রোগীকে সুস্থ করে তোলার জন্যে প্রতি মাসে বস্তা বস্তা টাকা ঢালে এদের আত্মীয়স্বজনেরা।

মেঝেতে পড়ে থাকা ফিল সিমন্সের লাশটা দেখল মাসুদ রানা। উপুড় হয়ে পড়ে আছে দেহটা। মাথা দু'ফাঁক হয়ে গেছে মাঝখান থেকে। ছিট্কে ওপাশের দেয়ালে গিয়ে লেগেছে রক্ত-মগজ। খুব ভাল করে তার মুখটা লক্ষ করল মাসুদ রানা। মনে হলো, সূক্ষ্ম বিস্ময়ের আভাস যেন জমে রয়েছে মুখটায়। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তের অভিব্যক্তি।

তার মাথার পাশেই পড়ে আছে একটা চেয়ারের ভাঙা পায়া। রক্ত মাখা। ওটা

দিয়েই সম্ভবত আঘাত করা হয়েছে লোকটার মাথায়। আপাতত থাক যেটা যে ভাবে আছে, ভাবল মাসুদ রানা। আগে পুলিস এসে তাদের তদন্ত শেষ করুক। তারপর দেখা যাবে। ওরা কোন পথে তদন্ত চালাতে চায়, সেটাও জানতে হবে রানাকে। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

পিছিয়ে এসে সিকিউরিটি-ইন-চার্জ করিমকে ইঙ্গিতে গেটে তালা মারতে বলল ও। তারপর করিডরে অপেক্ষমাণ ডিউটি ডাক্তারকে নিয়ে তার অফিসের দিকে পা বাড়াল। মিনিট পাঁচেক আগে অ্যাসাইলামে পৌঁছেছে রানা। তখনই পুরো বিষয়টা সংক্ষেপে ডাক্তার এবং করিমের মুখ থেকে জেনে নিয়েছে।

লাশটা প্রথমে আবিষ্কার করে করিম। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের খোঁজে ছুটে আসে সে। এসে দেখে, টেবিলে মাথা রেখে অঘোরে ঘুমাচ্ছে লোকটা। আর যারা ছিল, তাদেরও একই অবস্থা। সবাই ঘুমে।

এদের বক্তব্যে পরিষ্কার বোঝা গেছে যে রাত দেড়টা থেকে দুটোর মধ্যে এরা প্রত্যেকে ঘুমিয়ে পড়েছিল। অথচ আগে কখনও ঘটেনি এমনটা। এদের ডিউটি নাইট শিফটের, ঘুমানোর কথা নয় এদের। তবু ঘুমিয়ে পড়েছিল। সবাই। দশজন সিকিউরিটি, দুই ব্লকে দু'জন করে চারজন মেল নার্স এবং ডিউটি ডাক্তার, প্রত্যেকে। কেন?

'একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারছি না, ডক্টর, আপনারা সবাই ডিউটির সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন আজ। ব্যাপারটা...!'

'হ্যাঁ। আমারও খুব তাজ্জব লাগছে ভাবতে। আগে কোনদিন এমন হয়নি। ঝড় বৃষ্টি শুরু হতে বেশ ঠাণ্ডামত পড়েছিল। সে জন্যেই হয়তো, মানে...।'

'ভাল করে ভেবে বলুন,' বলল মাসুদ রানা। 'ঘুমিয়ে পড়ার আগে কিছু খেয়েছিলেন আপনি? কেউ কিছু খেতে দিয়েছিল?'

চোখ বুজে কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন ডাক্তার। 'নাহ্! খাইনি কিছু।'

'কারও অফার করা সিগারেট? বা আর কিছু...?'

'সিগারেট আমি খাই না। আর কিছু...ও, হ্যাঁ। কফি খেয়েছিলাম এক কাপ।'

সোজা হয়ে গেল মাসুদ রানা। তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে চোখের দৃষ্টি। 'কফি!'

'হ্যাঁ।'

'কে সার্ভ করেছিল আপনাকে কফি?'

'মারা গেছে যে লোকটা, ফিল সিমন্স।'

'ওর মধ্যে কোন কিছু...'

'তা হবে কি করে! আমি কফি খাই সাড়ে বারোটার দিকে। তারপরও প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা সজাগ ছিলাম। কিছু মেশানো থাকলে এতক্ষণ কিছুতেই জেগে থাকতে পারতাম না।'

ঠিক, ভাবল রানা। আরও মিনিট পাঁচেক নানান প্রশ্ন করল রানা লোকটাকে। কিন্তু তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য পাওয়া গেল না তার উত্তরে। বাইরে একটা গাড়ি এসে থামল। দরজা বন্ধ হলো। দু'তিন জোড়া পায়ের শব্দ উঠল, এদিকেই আসছে। আলতাফ মির্জা ঢুকল রুমে। বাইরে করিমের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মখটা পলকের

জন্যে দেখতে পেল রানা। নিঃশব্দে ওর পাশে বসল মির্জা।

'এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল,' অন্যমনস্কের মত মেঝের দিকে তাকিয়ে আছেন ডাক্তার। দু'হাত বুকের ওপর ভাঁজ করে ধরা। 'মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাবে ব্যবসার। আগের বারের চেয়েও মারাত্মক…কী ভয়ঙ্কর পেশেন্ট! তরতাজা জোয়ান এক যুবককে খুন করে পালিয়ে গেল!'

খুক্ করে কেশে উঠল মাসুদ রানা। সম্পূর্ণ উল্টো লাইনে ভাবছেন ভদ্রলোক। কেউ প্রফেসরকে অপহরণ করে থাকতে পারে, সে সম্ভাবনা হয়তো মনেই উদয় হয়নি তাঁর। 'আপনি ভাবছেন, প্রফেসর লোকটাকে ভেতরে ডেকে নিয়ে খুন করেছেন?'

'এ ছাড়া আর কি হতে পারে, বলুন? রাত এগারোটায় প্রফেসরকে শেষবারের মত ওষুধ খাইয়ে দিয়ে এসেছে সিমন্স। এরপর রাতে আর তার সেলের ভেতর যাওয়ার কথা নয় ওর। তবু কেন গেল? নিশ্চয়ই ডেকেছিল লোকটা।'

'সেলের চাবি কার কাছে থাকে?' প্রশ্ন করল আলতাফ।

'আমার, আই মীন, ডিউটি ডক্টরের কাছে,' মুখ ঘুরিয়ে দেয়ালে সাঁটা একটা বোর্ড দেখাল সে। হুকের সঙ্গে অনেকগুলো চাবি ঝুলছে। প্রত্যেকটা হুকের ওপর সেলের নম্বর লেখা। 'প্রতি ব্লকে রাতে দু'জন করে মেল নার্স ডিউটি করে। একজন ঘুমায়, আরেকজন জেগে থাকে। প্রয়োজন পড়লে বেল টিপে ওদের ডাকে রোগীরা। এ ক্ষেত্রে নিয়ম হলো, যে-ই ডাকুক, তাকে অ্যাটেণ্ড করতে যাওয়ার সময় ঘুমিয়ে থাকা নার্সকে ডেকে তুলতে হবে। এটা বাধ্যতামূলক। এখানকার রোগীরা প্রায় সবাই বিপজ্জনক। ভয়ঙ্কর। যে-জন্যে এই নিয়ম। প্রথমজন যদি কোন বিপদে পড়ে, দ্বিতীয়জন সঙ্গে সঙ্গে সিকিউরিটির লোক ডাকতে পারবে বলেই করা হয়েছে নিয়মটা।

'বেচারা সিমন্স! প্রফেসরের বেল শুনে একাই চলে গিয়েছিল বোকার মত। সঙ্গীকে ডাকেনি। নিজের নিরাপত্তার কথা ভাবেনি। তবে…ওকে খুব একটা দোষও দেয়া যায় না। প্রফেসর হোসেনের ভেতর, মানে, তাকে কখনও অন্যদের মত রাগতে দেখা যায়নি। কারও সঙ্গে কোন হিংস্র আচরণও করতে দেখা যায়নি। তাই হয়তো দ্বিতীয়জনকে ডাকার দরকার মনে করেনি সিমন্স।'

# নয়

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন ডাক্তার, থেমে গেলেন গাড়ির শব্দে। পর পর দুটো গাড়ি এসে দাঁড়াল পোর্চে। প্রথমে ঘরে ঢুকলেন পুলিস চীফ, ফ্রেড উইলিয়ামসন। আরও দু'জন রয়েছে তাঁর পিছনে। সবার শেষে ঢুকলেন এমিলি জোনসেন্ট, অ্যাসাইলামের মালিক। ভদ্রলোকের চেহারা দেখে মায়া হলো মাসুদ রানার।

এই ঠাণ্ডার ভেতরেও ঘামে চিক্ চিক্ করছে তাঁর মুখ। টাই পরার সময়

হয়নি, চুল এলোমেলো। মনে হলো ভূতে তাড়া করে নিয়ে এসেছে তাঁকে সারা পথ। ভেতরে রানাকে বসা দেখে ক্ষীণ স্বস্তির আভাস ফুটল ভদ্রলোকের চেহারায়। যদিও পরক্ষণেই তা মিলিয়ে গেল। রানার সঙ্গে সুপারকে পরিচয় করিয়ে দিল আলতাফ মির্জা।

'অনেক নাম শুনেছি আপনার,' ওর হাত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন সুপার। 'পরিচিত হতে পেরে খুব খুশি হলাম।'

'মাই প্লেজার।'

অন্য দু'জনের একজন হোমিসাইড স্কোয়াডের ডিটেকটিভ, জিন মরিস। অন্যজন পুলিসের ডাক্তার, পিটার এডমণ্ড। এদের দু'জনকে প্রফেসরের সেলে পাঠিয়ে দেয়া হলো প্রাথমিক তদন্ত সেরে ফেলার কাজে। চীফ থেকে গেলেন ডিউটি ডাক্তারের মুখে বিস্তারিত শোনার জন্যে। সুযোগ পেয়ে ফিল সিমন্সের মৃত্যু কি ভাবে ঘটেছে সে সম্পর্কে নিজের অভিমত আরেকবার ব্যাখ্যা করলেন তিনি।

'হতে পারে,' মন্তব্য করলেন চীফ। 'অসম্ভব নয়। তবে ব্যাপার যা-ই হোক, দয়া করে এখনই প্রেসের কাছে মুখ খুলবেন না। ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ। অন্তত ওয়াশিংটনের দৃষ্টিকোণ না জানা পর্যন্ত কাউকে কিছু বলবেন না দয়া করে।'

আধ ঘণ্টা পর আসন ছাড়লেন পুলিস চীফ। 'চলুন, মিস্টার রানা। দেখা যাক, আমাদের ডাক্তার আর গোয়েন্দা কি বলেন।'

উঠল রানা। ওর মাথায় অন্য চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। কফির কথা ভাবছে ও। ওর ভেতর কি কিছু ছিল? পো অ্যাকশন কোন ঘুমের ওষুধ? নইলে যা কোনদিন হয়নি; এতগুলো মানুষ কেন ঘুমিয়ে পড়ল? ঝড়-বৃষ্টি, ঠাণ্ডার কারণে হতে পারে না। এটা একটা অজুহাত। উপযুক্ত কারণ খুঁজে না পেয়ে এরা নিজেরাই তৈরি করে নিয়েছে। যে যার নিজেকে প্রবোধ দিচ্ছে, ব্যাপারটা আর কিছু হতে পারে না।

ফিল সিমন্সের লাশ দেখে চোখমুখ কুঁচকে উঠল পুলিস চীফের। 'কিছু পেলে?' ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'মনে হয় পেয়েছি,' বলল এডমণ্ড। 'খুব সম্ভব এই চেয়ারের পায়া দিয়ে হত্যা করা হয়েছে লোকটাকে,' ইঙ্গিতে জিনিসটা দেখাল সে। প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে ফেলা হয়েছে ওটা এর মধ্যে। 'রক্ত, মগজ লেগে আছে ওতে। কিন্তু...!' থেমে গেল ডাক্তার।

'কিন্তু?'

'দেখে যা মনে হয়, তা সত্যি না-ও হতে পারে। অন্তত আমার তাই ধারণা।'

'বুঝলাম না,' বিস্মিত হলেন ফ্রেড উইলিয়ামসন। মাসুদ রানাও আগ্রহ নিয়ে চেয়ে আছে ডাক্তারের দিকে।

'যে ভাবে চুরমার হয়েছে এর মাথা, তাতে এই জিনিস দিয়ে আঘাত করা হয়েছে বলে মনে হয় না। হলে আস্ত থাকত না এটা। খুব সম্ভব বালি ভরা চামড়ার রুলার, অথবা লোহার রড দিয়ে সারা হয়েছে কাজটা। পায়া আস্ত রেখে কারও মাথা এভাবে গুঁড়িয়ে দেয়া অসম্ভব।'

সন্তুষ্ট হলো মাসুদ রানা। ওর সন্দেহের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে ডাক্তারের অনুমান।

'আই সী!' ডিটেকটিভের দিকে ফিরলেন তিনি। 'মরিস?'

'ডাক্তারের ধারণার সঙ্গে আমি একমত। আরও আছে। ওটায় কোন হাতের ছাপ পাওয়া যায়নি।'

'অর্থাৎ ওটা যে ধরেছে গ্লাভস পরে ধরেছে!'

'নিঃসন্দেহে।'

'প্রফেসর কেন গ্লাভস পরতে যাবে!' নিজেকেই প্রশ্ন করলেন চীফ।

'ছিলই না তার গ্লাভস,' বলল জিম মরিস। 'জিজ্ঞেস করেছি আমি।'

'অথবা যদি মুছে ফেলা হয়ে থাকে ছাপ?'

'তেমন কোন প্রমাণও নেই। তাছাড়া মুছতে গেলে এত রক্ত লেগে থাকত না ওটায়।'

চোখাচোখি হলো মাসুদ রানা ও আলতাফ মির্জার।

চিন্তিত ভঙ্গিতে ভাঙা চেয়ারটা দেখলেন চীফ। 'ওটাতেও কোন হাতের ছাপ নেই?'

'না।'

'লোকটা ক'টার দিকে মারা গেছে মনে হয় আপনার?' জিজ্ঞেস করল মাসুদ রানা।

'দুটো থেকে আড়াইটার মধ্যে।'

কথাটা শোনামাত্র ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ফ্রেড উইলিয়ামসন। 'আমি পুলিস স্টেশনে যাচ্ছি। রোড ব্লক করে এখন আর লাভ নেই। দেখি, এয়ার সার্চ করে কিছু হয় কি না।'

রানার সঙ্গে হাত মেলালেন ভদ্রলোক। 'এরা রইল। আপনার আর কিছু জানার থাকলে জেনে নিতে পারবেন।'

গাড়িতে উঠতে উঠতে প্রশ্নটা হঠাৎ করেই মনে উদয় হলো পুলিস চীফের। মাসুদ রানার ফ্লোরিডা আগমন কি পূর্ব-পরিকল্পিত? নাকি হঠাৎ? মানুষটা প্যারাডাইস সিটিতে পা রাখল আর অ্যাসাইলামেও এমন এক ঘটনা ঘটল, বিষয়টা কি? বিশেষ করে যার নিরাপত্তার দায়িত্ব তার নিজের ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির ওপর রয়েছে। কবে এখানে এসেছে মাসুদ রানা জানা হয়নি। জানতে হবে। পুলিস চীফ ভালই জানেন, ও আর প্রফেসর হোসেন দু'জনেই বাঙালি। এবং বাংলাদেশী।

রানা আর ফ্রেড উইলিয়ামসনের ভাবনায় খুব একটা তফাত নেই এ মুহূর্তে। ও নিজেও একই কথা ভাবছে। ভাবছে, আমিও এলাম আর···। এক ঘণ্টা পর অ্যাম্বুলেন্স এল। ফিল সিমন্সের মৃতদেহ তোলা হলো ওতে। এরপর সেল ত্যাগ করল সবাই। এর মধ্যে পুলিসের দু'জন ফটোগ্রাফার এসেছিল, প্রচুর ছবি তুলে নিয়ে গেছে তারা। ডিউটি ডাক্তারের পাশের একটা রূম ডিটেকটিভ জিন মরিসের জন্যে ছেড়ে দেয়া হলো। ওখানে বসে ঘটনার সময় উপস্থিত প্রত্যেককে আলাদা আলাদা জেরা করল সে।

এক সময় মোটামুটি নিশ্চিত হলো মরিস যে কফিতে হয়তো কিছু মেশানো ছিল। তলানিসহ কফি ডিসপেন্সারটা কেমিক্যাল টেস্টের জন্যে সঙ্গে করে নিয়ে গেল সে। এইবার নিজের কাজ শুরু করল মাসুদ রানা। এক এক করে জিজ্ঞাসাবাদ করল সবাইকে। নতুন একটা তথ্য জানা গেল এই সময়। মেইন গেটের এক গার্ড জানাল, রাত দুটোর কিছু পরে গেটে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াবার শব্দ মনে হয় শুনেছে সে। এইমাত্র কথাটা মনে পড়েছে তার।

যদিও নিশ্চিত নয় সে। তবে খুব সম্ভব হেড লাইটের জোরাল আলোও চোখের ওপর পড়েছিল তার।

'গাড়ি?' কপাল কোঁচকাল মাসুদ রানা।

'রাইট, স্যার। কিন্তু শিওর হয়ে...

'দুটোর পরে?'

'ইয়েস।'

'সময় বুঝলে কি করে?'

'তার একটু আগে গার্ডরুমের দেয়ালঘড়িতে দুটোর ঘণ্টা পড়ে।'

কি যেন ভাবল মাসুদ রানা। 'রাতে কতবার কফি খাও তুমি ডিউটির সময়?'

'দু'-তিনবার; স্যার।'

'কাল কত কাপ খেয়েছিলে?'

'দু'কাপ।'

'কখন কখন?'

'প্রথমবার ডিউটিতে এসেই, রাত দশটায়। তারপর ঝড় শুরু হওয়ার একটু আগে।'

'মানে একটার দিকে?'

'রাইট, স্যার।'

ভাবতে বসল রানা। এই লোকটিই সবার শেষে খেয়েছে কফি। এর আধ ঘণ্টা আগে খেয়েছিলেন ডিউটি ডাক্তার। খাওয়ার পর পৌনে এক ঘণ্টামত জেগে ছিলেন তিনি, তারপর ঘুমিয়ে পড়েন। আর এ কফি খেয়ে প্রায় সোয়া এক ঘণ্টা জেগে ছিল। তার মানে এর ওপর ঘুমের ওষুধ মেশানো কফি কাজ করেছে দেরিতে। হতে পারে।

গার্ডটির বয়স অল্প, জোয়ান তাগড়া মানুষ, এমন মানুষের দেহের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে এ জাতীয় ওষুধের সময় বেশি লাগাটাই স্বাভাবিক। হেলিকপ্টারের আওয়াজে মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হলো মাসুদ রানার। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ও। ইউএস আর্মি ছাপ মারা দুটো কপ্টার দেখা গেল, খুব নিচু দিয়ে উড়ে আসছে। অ্যাসাইলামের ওপর দিয়ে ওপাশে, চোখের আড়ালে চলে গেল ও দুটো। লাভ নেই, ভাবল রানা, যারাই অপহরণ করে থাকুক প্রফেসরকে, এতক্ষণে নাগালের বাইরে চলে গেছে। কারা আছে এর পিছনে? রাশিয়া, চিন, না আর কোন দেশ?

এ পর্যন্ত যে-সব তথ্য পাওয়া গেল. মনে মনে সেগুলো গোছাল মাসুদ রানা।

তথ্য এক, নার্সটিকে হত্যার কাজে ওই চেয়ারের পায়া ব্যবহার করা হয়নি। আরও ভারী কিছু ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু সেটা যে কি, জানা যায়নি। নেই সেটা এখানে। বরং চেষ্টা করা হয়েছে, সবাই যেন ভাবে পায়াটা দিয়েই তাকে হত্যা করা হয়েছে। তথ্য দুই, কোনও হাতের ছাপ পাওয়া যায়নি ওটায়। ছাপ মোছার চেষ্টা করা হয়েছে, তেমন কোন আলামতও নেই। তার মানে জিনিসটা যে-ই স্পর্শ করে থাকুক, দস্তানা পরে করেছে। অথচ প্রফেসরের ওই জিনিস ছিল না।

তথ্য তিন, গার্ডদের একজন বলছে; যদিও সে নিশ্চিত নয়, দুটোর খানিক পরে গেটের কাছে একটা গাড়ি এসে দাঁড়ানোর আওয়াজ সে পেয়েছে। হেড লাইটের জোরাল আলোও চোখেমুখে পড়েছে তার। এবং তথ্য চার, কফি। ওতে যে কিছু মেশানো হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহই নেই। এই চার তথ্যের ওপর নির্ভর করে উপসংহারে পৌঁছানো যায়, কাজটা কঠিন কিছু নয়।

কিন্তু কঠিন হচ্ছে পরের কাজটা। কে বা কারা ঘটিয়েছে এ কাজ, সেটা আবিষ্কার করা। এবং তা কেবল আবিষ্কার করলেই চলবে না, প্রফেসর মারগুব হোসেনকে উদ্ধারও করতে হবে তাকে। করতেই হবে, যে কোন মূল্যেই হোক।

ডিটেকটিভ সেকেণ্ড গ্রেড মরভিন ক্রিস্টেনসেন খেয়ালী মানুষ। একটু পাগলাটে। তবে কাজে তার জুড়ি মেলা ভার।

জরুরী তলব পেয়ে পুলিস হেডকোয়ার্টারে যখন পৌঁছল সে, তখন ছ'টা বেজে কয়েক মিনিট। এত ভোরে উষ্ণ বিছানা ছাড়তে হয়েছে বলে মেজাজ পুরোপুরি খাপ্পা হয়ে আছে তার। আজ ক্রিস্টেনসেনের অফ ডে। স্ত্রীকে নিয়ে দিনটা আজ সৈকতে কাটাবে বলে কথা দিয়েছিল সে। কিন্তু হলো না। অসময়ে তলব পেয়েই বুঝে ফেলেছে, কপালে ছুটি নেই তার আজ। নিজে খাপ্পা হয়ে, স্ত্রীকে খাপ্পা করে বেরিয়ে এসেছে ওয়ারেন।

ফ্রন্ট ডেস্কে রিপোর্ট করতে যে কাজের ভার দেয়া হলো তাকে, শুনে তালু ফুঁড়ে মগজ বেরিয়ে পড়ার দশা হলো ক্রিস্টেনসেনের। যদি প্রফেসর মারগুব হোসেনকে খুঁজে বের করার কাজে নিয়োজিত দলে যুক্ত করা হত তাকে, কিচ্ছু মনে করত না সে। বরং খুশিই হত। কারণ তাতে পত্রিকায় তার ছবি ছাপা হওয়ার একটা সুযোগ হলেও হতে পারত।

অথচ দেয়া হলো কি না…রাগে প্রায় বিস্ফোরিত হলো মরভিন। টেবিলের ওপাশে বসা ডেস্ক সার্জেন্টকে লক্ষ করে খেঁকিয়ে উঠল। 'কোথাকার কোন্ বেশ্যার লাশ পাওয়া গেছে বিচে, তার মৃত্যুর কারণ খুঁজে বের করার জন্যে আমাকে বিছানা থেকে উঠিয়ে এনেছ তুমি! আমার অফ ডে-তে?'

হাসি সংবরণ করতে কষ্ট হলো সার্জেন্টের। 'দুঃখিত, ডিক। আমি নই। চীফকে দায়ী করতে পারো তুমি এ জন্যে। আমি শুধু নির্দেশ পালন করেছি তাঁর।'

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল ক্রিস্টেনসেন। হতাশ সুরে বলল, 'কবে যে লোকটা ডাক্তারকে দিয়ে নিজের মাথা পরীক্ষা করাবে, তাই ভাবি একেক সময়। ওটার মধ্যে মগজ বলে যদি কিছু থেকে থাকে আমি শিওর এতদিনে পচে গোবর

হয়ে গেছে। যখন সবাই ছুটছে পাগলা প্রফেসরের পিছনে, তখন কি না···কপাল আর কাকে বলে!' গজ গজ করতে করতে বেরিয়ে পড়ল সে।

ওই পর্যন্তই। রাগ, দুঃখ সব পিছনে ফেলে ছুটল ডিটেকটিভ। হারবারে যখন পৌঁছল, পুরোপুরি কাজের মানুষ বনে গেছে সে। দু'জন পেট্রল পুলিসের ওপর চোখ পড়ল তার, দাঁড়িয়ে আছে একটা কাঠের জেটিতে। তাদের পায়ের কাছে রাবার শীট দিয়ে ঢাকা একটা দেহ।

গাড়ি থেকে নামল মরভিন। তার দিকে তাকিয়ে আছে দুই পেট্রল পুলিস। ওদের একজন বয়স্ক, বিশালদেহী। লোকটা আইরিশ। এই এলাকার সবকিছু তার নখ দর্পণে। অন্যজন তরুণ। আইরিশের সহকারী। 'এই সেই মেয়ে?'

জবাবে মাথা দোলাল বিশালদেহী। সংক্ষেপে লাশটা উদ্ধারের ঘটনা জানাল তাকে।

রাবার শীট তুলে রোজি শেরম্যানের মুখটা ভাল করে লক্ষ করল মরভিন। গাল দুটো আপনাআপনি কুঁচকে উঠল। অভিজ্ঞ ডিটেকটিভের বুঝতে দেরি হলো না, পানিতে পড়ার আগেই মৃত্যু হয়েছে মেয়েটির। শীট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। আইরিশের ইঙ্গিতে জেটির কিনারায় দাঁড়িয়ে উঁকি দিল। সাদা একটা নৌকা বাঁধা আছে জেটিতে। ওটার একদিকের চোখা গলুই লাল হয়ে আছে রক্তে।

'ওয়াগন আনিয়ে লাশটা মর্গে নিয়ে যাও,' তরুণটিকে নির্দেশ দিল মরভিন। তারপর প্রথমজনের বাহু ধরে সামনে টানল। 'এসো। গাড়িতে বসে কথা বলি।'

বিশালদেহী আইরিশ এগোল পিছন পিছন। গাড়িতে বসল দু'জন পাশাপাশি। গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট থেকে হুইস্কির ছোট একটা বোতল বের করে তার দিকে এগিয়ে দিল ডিটেকটিভ। তার আগে দেখে নিয়েছে দ্বিতীয় পুলিসটি নির্দেশ পালন করতে গেছে কি না। বোতলটা দেখে চোখ বড় বড় হয়ে উঠল বিশালদেহীর। ডিউটির সময় হুইস্কি?

কিন্তু ডিটেকটিভ নিজেই যখন দিচ্ছে, নিতে দোষ কি? এমনিতেই সৈকতে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে শীতে কাঁপন ধরে গেছে তার। কাঁপা হাতে ওটা নিল সে। মাঝারি দুটো চুমুক দিয়ে ওভারকোটের হাতায় মুখ মুছল। 'দারুণ হুইস্কি,' বলল লোকটা। ফিরিয়ে দিল বোতল। মুখ লাগিয়ে জায়গায় রেখে দিল ওটা ক্রিস্টেনসেন।

'মেয়েটাকে চেনো তুমি, ম্যাক্স?'

'চিনি।'

'কে ও?'

'রোজমেরি শেরম্যান। কাজ করে প্যারাডাইস ইন নামে এক ক্লাবে। গত দেড় বছর ধরে ওখানে আছে সে। বাস করে ওয়ান এইটি সেভেন, অ্যাঙ্কর রোডে।'

'কেমন ছিল মেয়েটি?'

'পেশাগত ব্যাপারে যাই হোক, এমনিতে ভাল ছিল। মিশুক ছিল। কখনও কোন ঝামেলা বাধাতে দেখিনি।'

'পান করত খুব?'
'কখনও কখনও।'
'তোমার কি মনে হয় মাতাল অবস্থায় জেটি থেকে পড়ে গেছে ও?'
'মনে হয় না, আমার বিশ্বাস তাই ঘটেছে।'
একটু ভাবল মরভিন। অভিজ্ঞতা থেকে জানে, এ ধরনের মৃত্যুর ব্যাপারে এত সহজে কোন সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় না। তাতে ভুল হওয়ার চান্স থাকে। 'রোজির কোন বয় ফ্রেণ্ড ছিল কি না, বলতে পারো?'
'ছিল। একদিন দুইদিন পরপরই ক্লাবে আসত ছেলেটা। ভাল ছেলে।'
'কি করে সে?'
'শুনেছি হ্যারিসন অ্যাসাইলামে চাকরি করে।'
শিরদাঁড়া সোজা হয়ে গেল ডিটেকটিভের। সামনে তাকিয়ে স্টিয়ারিঙ হুইলে তবলা বাজাচ্ছিল। আঙুল থেমে গেল, ঘুরে তাকাল ম্যাক্সের দিকে। 'কোথায় বললে?'
নামটা আবার উচ্চারণ করল লোকটা।
'কি চাকরি করত?'
'মেল নার্স।'
'তুমি শিওর?' অজান্তেই গলা চড়ে গেল তার।
'সেরকমই তো শুনেছি।'
'নাম কি ছিল ছেলেটার?'
'খুব সম্ভব ফিল সাইমন্। না, সিমন্স, ফিল সিমন্স।'
ড্যাশবোর্ডের নিচে হাত চালিয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুলে আনল ডিটেকটিভ। যোগাযোগ করল হেডকোয়ার্টারে। 'সারজ্, হ্যারিসন অ্যাসাইলামে খুন হয়েছে যে মেল নার্স, তার নাম কি?'
'ফিল সিমন্স, কেন?'
উত্তর না দিয়েই রিসিভার রেখে দিল মরভিন। মুখ ঘুরিয়ে চেয়ে থাকল সৈকতের দিকে। নিচের ঠোঁট কামড়াচ্ছে। অন্যমনস্ক। 'ওর আর কোন বন্ধু-বান্ধব সম্পর্কে কতদূর জানো, ম্যাক্স?'
আগ্রহ নিয়ে তাকে লক্ষ করছিল আইরিশ। 'এ ধরনের মেয়েদের বন্ধু-বান্ধবের কি কোন সীমা আছে? ক্লাবের মালিক ডেভিড গিবসনের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক ছিল ওর। এছাড়া বারম্যান, এক জ্যামাইকান, নাম চাহাম। লোকটাকে বেশ পছন্দ করত রোজি। তাছাড়া···নাহ! আর কারও কথা মনে পড়ছে না।'
'জ্যামাইকান লোকটা থাকে কোথায়?'
হাত তুলে দূরের একটা বিল্ডিঙ দেখাল ম্যাক্স। 'ওটায়। দোতলায় একটা রুম নিয়ে থাকে।'
সাইরেনের আওয়াজ শোনা গেল। একটু পর দালান-কোঠার আড়াল ছেড়ে সৈকতের খোলা রাস্তায় এসে পড়ল একটা অ্যাম্বুলেন্স। এদিকেই আসছে।
'ওকে, ম্যাক্স। অনেক কিছু জানা গেল তোমার কাছ থেকে। অনেক

ধন্যবাদ। লাশ নিয়ে তুমি যাও মর্গে। তোমার সঙ্গী থাকুক এখানে। ওকে বোলো, নৌকাটা ওখান থেকে কেউ যেন না সরায়।'

'শিওর। অ্যাণ্ড থ্যাঙ্কস ফর দা ড্রিঙ্ক।'

লোকটা বেরিয়ে যেতে আবার রিসিভার তুলল মরভিন। 'সারজ, একজন ফটোগ্রাফার পাঠাও এখানে, জলদি। হোমিসাইডের একজনকেও সঙ্গে পাঠাও। দেরি কোরো না।'

'হুঁম!' বলল ডেস্ক সার্জেন্ট। 'বেশ বড় ঝামেলা বাধিয়ে নিয়েছ দেখছি!'

'কথা বাড়িয়ো না!' ধমক লাগাল মরভিন। 'যা বলছি তাই করো!' আছড়ে রাখল সে রিসিভার। বেরিয়ে এল গাড়ি থেকে। আইরিশের দেখানো বাড়িটার দিকে পা বাড়াল। প্রচুর বয়স দালানটার। সস্তা একটা লজিং হাউস। ভীষণ নোংরা। ঢোকার মুখেই নড়বড়ে এক ডেস্কের পিছনে বসে আছে তারচেয়েও নড়বড়ে এক বৃদ্ধ।

'হ্যালো!' সন্দিগ্ধ গলায় বলল লোকটা। 'কাকে চাই?'

নিজের আইডি কার্ডটা তার চোখের সামনে কয়েক সেকেণ্ড ধরে থাকল ডিটেকটিভ। 'জ্যামাইকান চাহামকে কোথায় পাব?'

'আপনি বলছেন লোকটা কোন কুকাজ করেছে?'

ঠাণ্ডা চোখে লোকটাকে মাপল সে। 'বলেছি নাকি?'

'না, মানে, সে কোন ঝামেলা বাধিয়েছে কি না, ওই জানতে চাইছিলাম আর কি!'

'কোথায় পাব তাকে?'

'দোতলায়। সিঁড়ির দিকে মুখ করা দরজা।'

কার্ডটা পকেটে পুরে সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করল মরভিন ক্রিস্টেনসেন। হাত মুঠো করে পর পর কয়েকটা হাতুড়ির ঘা লাগাল চাহামের দরজায়। দরজা তো বটেই, মনে হলো পুরো দালানটাই কেঁপে উঠল বুঝি। সামান্য বিরতি দিয়ে আবার হাতুড়ি চালাল সে। ভেতরে পায়ের আওয়াজ উঠল এবার। ঘটাং করে খুলে গেল দরজা। ফোলা ফোলা মুখে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে আছে জ্যামাইকান।

মরভিনের আইডিটা কিসের, বুঝতে কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগল তার। সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে গেল লোকটা, মাথা ঝাঁকিয়ে ভেতরে আহ্বান জানাল ডিটেকটিভকে। তাড়াতাড়ি আলো জ্বেলে দিল। রুমটা ছোট, তবে চমৎকার করে সাজানো। দালানের চেহারার সঙ্গে চাহামের ঘর একেবারেই বেমানান। গদিমোড়া একটা চেয়ারে বসল মরভিন।

'বসুন,' চাহামকে বলল সে। 'অসময়ে আপনার ঘুম ভাঙাতে হলো বলে দুঃখিত। উপায় ছিল না এছাড়া।'

'কি হয়েছে?' তার মুখোমুখি বসল লোকটা শক্ত হয়ে। চোখে সতর্ক চাউনি। 'খারাপ কিছু…? ইয়ে, কফি চলবে?'

'চলবে না মানে? ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ার জোগাড় আমার!'

দুই কাপ কালো কফি তৈরি করে আনল লোকটা। বসল। চুমুক দিল ধূমায়িত

কফিতে। 'রোজি শেরম্যানকে চেনেন আপনি, তাই না?' জিজ্ঞেস করল ক্রিস্টেনসেন।

'নিশ্চই। খুব ভাল মেয়ে, পছন্দ করি আমি ওকে। কেন? কোন সমস্যা?'

'তা বলতে পারেন। কাল রাতে ক্লাবে গিয়েছিল মেয়েটা?'

'হ্যাঁ। ভোর চারটা পর্যন্ত ছিল।'

'খুব বেশি ড্রিঙ্ক করে ফেলেছিল?'

'তা...করেছিল কিছুটা।' চাউনি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল জ্যামাইকানের। 'কিছু হয়েছে রোজির?'

'একটু আগে হারবার থেকে তোলা হয়েছে ওর দেহ। মাথা ছাতু হয়ে গিয়েছে। চেহারা চেনা যায় না।'

বারকয়েক চোখ পিট্ পিট্ করল চাহাম। 'মানে...মারা গেছে?'

'হ্যাঁ,' ওপর-নিচে মাথা দোলাল মরভিন।

বিষণ্ন হয়ে উঠল জ্যামাইকানের চেহারা। মুখ নামিয়ে কয়েক মুহূর্ত নিজের নগ্ন পা দেখল লোকটা। তারপর লম্বা, কাঁপা কাঁপা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল। 'ঈশ্বর! কী দুঃখজনক!'

'রোজির বয়-ফ্রেণ্ড সিমন্স সম্পর্কে কি জানেন আপনি?'

মাথা নাড়ল লোকটা। 'বেশি কিছু না  তবে শুনেছি নিতান্তই ভাল মানুষ। নন্ ড্রিঙ্কার। বারে এলে চুপচাপ বসে থাকত। রোজি ফ্রী হলে নাচত ওর সঙ্গে। ভীষণ ভালবাসত মেয়েটাকে।'

'সম্প্রতি বয়-ফ্রেণ্ডের সঙ্গে কোন মনোমালিন্য হয়েছিল রোজির, জানেন কিছু?'

'মনোমালিন্য! কিসের জন্যে? না না, ওরা খুব সুখী ছিল। কাল অনেক কথা বলেছে আমাকে রোজি। সেরকম কিছু হলে অবশ্যই বলত ও। না না, তেমন কিছু ঘটতেই পারে না ওদের মধ্যে।'

'অনেক কথা বলতে ঠিক কি কি বলেছিল মেয়েটা কাল?'

'তেমন কিছু না। ও নাকি একটা রেস্টুরেন্ট কিনতে যাচ্ছে, এইসব আর কি!'

'রেস্টুরেন্ট কিনবে!'

'ওই কথার কথা আর কি! মাতাল অবস্থায় বলেছে, আমি বিশ্বাস করিনি। মেয়েটিকে অবশ্য বলার সময় বেশ সিরিয়াস মনে হয়েছে।'

'কি বলেছিল খুলে বলুন দেখি।'

'হারবারের পুব মাথায় একটা রেস্টুরেন্ট আছে, তেমন চলে না। নাম সী গাল। ও আর ওর বয়-ফ্রেণ্ড নাকি ওটা কিনতে যাচ্ছে। আর...ও, বলেছিল, আজই প্যারাডাইস ক্লাবে আমার শেষ রাত,' আপনমনে মাথা দোলাল চাহাম। 'হ্যাঁ, সত্যি কথাই বলেছে ও।'

চোখ সরু করে লোকটাকে দেখছে মরভিন। 'আর কিছু?'

'আমাকে দাওয়াত করেছিল সী গালে যাওয়ার জন্যে। আমি গেলে বিনে পয়সায় খাওয়াবে আমাকে। এইসব আবোল-তাবোল!'

‘ওকে, মিস্টার চাহাম,’ উঠে দাঁড়াল ডিটেকটিভ। ‘সাহায্যের জন্যে অনেক ধন্যবাদ। কফির জন্যেও। এত ভাল কফি আর কখনও খাইনি আমি।’

খুশিতে কালো জ্যামাইকানের চেহারা হেসে উঠল। বেরিয়ে এল মরভিন। একেক বারে চার ধাপ করে সিঁড়ি টপকে নেমে এল নিচে। সূর্য উঠেছে। অ্যামেচার ইয়টস্‌ম্যানরা যার যার বোট তৈরির কাজে ব্যস্ত, মর্নিং সেইলে বেরোবে। জেটির দিকে তাকিয়ে তরুণ পেট্রলম্যানকে দাঁড়ানো দেখা গেল দূর থেকে। গাড়ি নিয়ে হারবারের পুব প্রান্তে রওনা হলো মরভিন ক্রিস্টেনসেন।

সী গালের মালিক হ্যারি পার্ক বয়স্ক মানুষ। ভীষণ মোটা। হেঁড়ে গলা। নোংরা সাদা একটা বাথ-রোব পরে আছে লোকটা। পায়ে স্যাণ্ডেল। পরিচয় বিনিময়ের পর কাজের কথা পাড়ল মরভিন। ‘আপনি রেস্টুরেন্ট বিক্রি করে দিচ্ছেন শুনলাম?’

‘দিচ্ছি না, দিয়ে ফেলেছি অল রেডি।’

‘কার কাছে?’

‘একটা মেয়ে, রোজমেরি শেরম্যানের কাছে। অবশ্য মুখে মুখে। মেয়েটা প্যারাডাইস ক্লাবে কাজ করে,’ বলতে বলতে থেমে গেল লোকটা ডিটেকটিভের অস্বাভাবিক চাউনি দেখে। ‘কি ব্যাপার, অফিসার? কি হয়েছে? আজই টাকা নিয়ে আসার কথা ছিল ওর, আসবে না নাকি?’

‘আপনার ভাগ্য খারাপ। আজ কেন, কোনদিনই আর আসবে না সে।’

‘কেন?’ চর্বিবহুল চোয়াল ঝুলে পড়ল হ্যারির।

‘মারা গেছে রোজি।’

‘মারা গেছে!’

‘হ্যাঁ।’

ঝাড়া পাঁচ মিনিট বসে থাকল লোকটা স্থির হয়ে। ক্রিস্টেনসেনের ভয় হল, হয়তো হার্টফেল করেছে। কিন্তু না, চোখের পাতা নড়ল তার। মোনাজাত-শেষের ভঙ্গিতে মুখ ডলল সে কিছুক্ষণ। অন্যমনস্কের মত বলল, ‘মারা গেছে? অথচ…অথচ…।’

‘কবে আপনাকে রেস্টুরেন্ট কেনার প্রস্তাব দিয়েছিল মেয়েটা? নাকি আপনিই…?’

‘ও-ই এসেছিল। অনেকদিন থেকেই এটা বেচতে চাইছিলাম আমি। এ এলাকার অনেকেই তা জানত। লোকসান দিতে দিতে আর পারছিলাম না, তাই…ওহ্, গড! ভেবেছিলাম বুঝি রেহাই পেলাম এ যাত্রা।’

‘কবে প্রথম এটা কেনার প্রস্তাব দিয়েছিল রোজি, বিস্তারিত বলুন।’

আবার কিছুক্ষণ মুখ ডলল হ্যারি জ্যাকব। ‘এই তো…সেদিন, খুব সকালে…।’

# দশ

হোটেল বেলিভেডার। সকাল এগারোটা। ব্যালকনিতে বসে আছে মাসুদ রানা। আনমনা। মাথার মধ্যে গিজগিজ করছে আবোল-তাবোল চিন্তা। অ্যাসাইলামের ঘটনাটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না ও। এমন এক সময় ঘটল ব্যাপারটা, ভাবতেও যেন কেমন লাগে।

আধ ঘণ্টা আগে হোটেলে ফিরেছে রানা। গোসল সেরে, নাশতা করে ব্যালকনিতে এসে বসেছে একটু ভাবনা-চিন্তা করবে বলে। কিন্তু হচ্ছে না। ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে, মাথার মধ্যে জট পাকিয়ে যাচ্ছে সব। ওদিকে পুলিস, সিআইএ, এফবিআই, ট্রুপ, সবাই নেমে পড়েছে প্রফেসর মারগুব হোসেনের খোঁজে। তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে প্যারাডাইস সিটি এবং তার আশপাশের বিরাট এলাকা জুড়ে।

যদিও এতে কাজ হবে বলে মনে করে না মাসুদ রানা। যারা প্রফেসরকে অপহরণ করেছে, ভালমত আঁটঘাট বেঁধেই নেমেছে তারা মাঠে। সন্দেহ নেই, প্রফেসরের মাথার দাম সম্পর্কে ভালই ধারণা রাখে তারা। এস্কেপ রুট ঠিক না করে নিশ্চয়ই তাঁকে অপহরণ করা হয়নি। তার মানে, অনেক আগেই নাগালের বাইরে চলে গেছে ওরা। রাত আড়াইটা বা তিনটায়ও যদি অ্যাসাইলাম ত্যাগ করে থাকে অপহরণকারীরা, প্রচুর সময় পেয়েছে নিরাপদ দূরত্বে সরে যাওয়ার।

টেবিলের ওপর থেকে আজকের প্যারাডাইস হেরাল্ড পত্রিকাটা তুলে নিল মাসুদ রানা। অন্যমনস্কের মত পাতা ওল্টাতে লাগল। পড়ছে না, কি ভাবে কোন পথে এগোবে, ভাবছে। হঠাৎ পলকের জন্যে কোথাও বড় করে ছাপা ক্ষমাপ্রার্থী শব্দটা চোখে পড়ল ওর। ক্ষমাপ্রার্থী! এক পলকের আচমকা দেখা, জায়গাটা হারিয়ে ফেলেছিল। খুঁজে খুঁজে আবার বের করল রানা।

একটা বিজ্ঞাপন ওটা। কালোর ওপর সাদা বড় অক্ষরে লেখা শব্দটা। নিচে লেখা: প্রখ্যাত ব্রেন স্পেশালিস্ট, ড. পল ম্যাথিয়াস, অনিবার্য কারণবশত আজ···তারিখ থেকে আগামী তিন সপ্তাহ রোগী দেখতে পারবেন না। এই আকস্মিক অপরাগতার জন্যে আমরা সকলের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। আগামী···তারিখ থেকে ড. ম্যাথিয়াস আবার নিয়মিতভাবে তাঁর ক্লিনিকে বসবেন।

তাও ভাল, পত্রিকাটা রেখে দিয়ে ভাবল মাসুদ রানা, অসুবিধের কথা পয়সা খরচ করে মানুষকে আগেভাগে জানায় এরা। ক্ষমাও চায়। অথচ বাংলাদেশে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উল্টো। গাঁট ঢিলে করে জায়গামত না পৌঁছলে এসব জানার উপায় নেই। ক্লিনিকের দেয়ালে সাঁটা 'বিজ্ঞপ্তি' পড়ে রোগীকে কখনও কখনও তা জেনে আসতে হয়। যাদের টেলিফোন আছে, তাদের কথা অবশ্য আলাদা।

কেমন যেন খুঁত খুঁত করছে রানার মনটা। কি যেন একটা মনে পড়ব পড়ব

করছে, কিন্তু পড়ছে না। মনের ওপর খানিক জোর খাটাল ও, পরক্ষণেই বুঝল ভুল হচ্ছে। এরকম মুহূর্তে জোর করে কিছু মনে করাতে গেলে বেশিরভাগ সময়ই ফল হয় উল্টো। তারচেয়ে ব্যাপারটা ভুলে থাকার চেষ্টা করা ভাল, এক সময় আপনিই তা মনে পড়ে যাবে।

আড়মোড়া ভাঙল রানা। হাই তুলল লম্বা করে। দীর্ঘ পথ ভ্রমণের ধকল গেছে কাল, তার ওপর রাতে চার ঘণ্টাও ঘুমাতে পারেনি। শরীর ম্যাজ ম্যাজ করছে। উঠে পড়ল ও। বেরিয়ে এল হোটেল ছেড়ে। হোটেলের কার রেন্টাল সার্ভিস থেকে ভাড়া করা ঝকঝকে শেভ্রোলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। প্যারাডাইস হেরাল্ডে ওর এক সাংবাদিক বন্ধু আছে, দেখা করবে তার সঙ্গে। অ্যাসাইলামের দুর্ঘটনা নিয়ে ওরা কোন অ্যাঙ্গেলে ভাবছে জানা দরকার। ওখান থেকে পুলিস হেডকোয়ার্টারে যাবে কফির কেমিক্যাল টেস্টের ফল জানতে।

'জিম ফ্রিম্যান!' রানার প্রশ্নে বিস্মিত হলো যেন রিসেপশনে বসা যুবক।

'হ্যাঁ, কেন? নেই নাকি ও?'

'আপনি ওঁর…?'

'বন্ধু। মাসুদ রানা।'

'উনি তো অফিসে নেই, স্যার। উনি অসুস্থ।'

'অসুস্থ? বাসায় পাব ওকে?'

'না। স্টেট হসপিটালে।'

'হসপিটালে!' এবার বিস্মিত হওয়ার পালা রানার।

'কিছু মনে করবেন না, স্যার, আপনি কি এখানে…আই মীন…'

'না, এখানে থাকি না আমি। গতরাতে এসেছি।'

'তাই বলুন। কয়েকদিন আগে মারাত্মকরকম আহত হয়েছেন ফ্রিম্যান। কারা যেন খুব মারধর করেছে তাঁকে।'

'সে কি!' আঁতকে উঠল রানা।

'তা প্রায় নয়-দশদিন হয়ে গেল। এখনও জ্ঞান ফেরেনি ওঁর।'

'ইয়াল্লা!' প্রায় ছুটে বেরিয়ে এল রানা।

'চারতলায়,' পিছন থেকে চেঁচিয়ে বলল যুবক। 'সাত নম্বর কেবিন।'

'থ্যাঙ্কস।'

স্টেট হসপিটাল। লবিতে বসে আছে ডিটেকটিভ থার্ড গ্রেড ব্রুস অ্যাডকিনস তরুণী ডেস্ক নার্সের গুরু নিতম্বের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে সে। এদিকে পিছন ফিরে কফি ঢালছে মেয়েটি। অতিকায় মানুষ ব্রুস অ্যাডকিনস। বুদ্ধি-শুদ্ধি কম। সহকর্মীদের ধারণা মাথার ভেতর মগজ নেই তার, চেম্বার ফাঁকা। কথা বেশি বলে সে, ভাব দেখায় দুনিয়ার সবকিছু তার জানা। কারণে অকারণে হেসে ওঠে হা-হা করে, প্রায় সময় ওর সঙ্গে ঠাস্ ঠাস্ হাততালিও যোগ হয়।

দুটো ব্যাপারে অ্যাডকিনসের কোন তুলনা হয় না। কোন বিপজ্জনক অ্যাকশনের সময় বেপরোয়া হয়ে ওঠে সে। বিপদের ভয়, প্রাণের মায়া ত্যাগ করে এগিয়ে যেতে পারে খেপা ষাঁড়ের মত। অন্য আর যে ব্যাপারে এক্সপার্ট

অ্যাডকিনস, তা হলো মেয়ে পটানো। ভারি অভিজ্ঞ সে এ লাইনে। আকার আর চেহারা দেখে মেয়েরা খুব সহজেই আকৃষ্ট হয় অ্যাডকিনসের প্রতি। বাকিটুকু সারে সে মিষ্টি ব্যবহারে।

দশ দিন হলো এখানে ডিউটি পড়েছে অ্যাডকিনসের। পাহারা দিচ্ছে সাত নম্বর কেবিনের আহত সাংবাদিককে। এই ক'দিনে এখানকার অল্পবয়সী নার্সগুলোর মধ্যে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে ফেলেছে সে। ওকে নিয়ে রীতিমত কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে মেয়েদের মধ্যে। ঘাড় ঘুরিয়ে হাসল মেয়েটি, কিছু বলতে গেল, তাকে থামিয়ে দিল ডিটেকটিভ।

'পরে, ডার্লিং,' আড়চোখে মাসুদ রানাকে দেখল সে। ঝামেলা এসে গেছে। 'কার কাছে যাবেন, স্যার?'

'সাত নম্বর কেবিনে।'

'সাত নম্বর? সাংবাদিকের কেবিনে?'

'হ্যাঁ।'

'উনি আপনার কে হন?'

'বন্ধু।'

পকেট থেকে নোট বই বের করে ওর নাম-ঠিকানা লিখে নিল অ্যাডকিনস। 'যান, স্যার। তবে ভদ্রলোকের অবস্থা বেশি ভাল না। ঘণ্টাখানেক আগে জ্ঞান ফিরেছে মাত্র। পাঁচ মিনিটের বেশি থাকতে পারবেন না। ডাক্তারের নিষেধ,' বলে চোখ ইশারায় নার্সটিকে দেখাল সে।

হেসে ফেলল মাসুদ রানা। লবিতে পা রেখে ওদেরকে লক্ষ করার সুযোগ হয়েছে ওর, একজনের প্রতি অন্যজনের দুর্বার আকর্ষণ টের পেতে যথেষ্ট ছিল তা। 'উনি ডাক্তার বুঝি?'

'না, মানে···।' লোকটাকে কথা হাতড়াবার কষ্টে না ফেলে পা বাড়াল রানা। পিছনে ফিক্ করে হেসে উঠল মেয়েটি চারতলায় উঠে এল ও। সাত নম্বরে পা রেখেই প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেল। বিছানায় একটা মমি শুয়ে আছে যেন। দুই চোখ আর ঠোঁট ছাড়া পুরো দেহ ব্যাণ্ডেজে মোড়া জিম ফ্রিম্যানের। দোড়গোড়ায় দাঁড়ানো রানাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখল চোখ দুটো, তারপর চঞ্চল হয়ে উঠল হঠাৎ করে। এতক্ষণে চিনতে পেরেছে ওকে। অন্ধ আক্রোশে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠল মাসুদ রানার।

'রা···রানা!' অস্ফুটে গুঙিয়ে উঠল ফ্রিম্যান। চোখের কোণ হঠাৎ করেই ভিজে উঠল তার। হাসির মত কান্নাও সংক্রামক, দেখতে দেখতে পানি এসে গেল রানার চোখেও। একটা চেয়ার টেনে বন্ধুর মাথার কাছে বসল ও, আলতো করে হাত রাখল ডান কব্জির ওপর।

ভাষা খুঁজে পেতে সময় লাগল ওর। বহুকষ্টে উচ্চারণ করল, 'কে···জিম?'

ব্যাণ্ডেজ মোড়া মাথাটা চুল পরিমাণ নড়ে উঠল ফ্রিম্যানের। ফিসফিস করে বলল সে, 'জানি না। অন্ধকারে···কাউকে দেখতে পাইনি।' আবার চঞ্চল হয়ে উঠল তার চাউনি। অস্থির হয়ে পড়েছে। ভাঙা চোয়ালের জন্যে কথা বলতে ভীষণ

কষ্ট হচ্ছে, তবু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'রানা…শিলাকে, শিলার…কোন খোঁজ পাচ্ছি না। দশ দিন হয়ে গেল…একবার…একবার খোঁজ নিতেও…আসেনি ও।'

তার ঠোঁটের সাথে কান প্রায় ঠেকিয়ে কথা শুনতে হচ্ছে রানাকে। চোখ কোঁচকাল ও। 'শিলা কে?'

'আমার…আমার গার্ল-ফ্রেণ্ড। তুমি…তুমি হয়তো চেনো ওকে। প্র-প্রফেসর হোসেনের…অ্যাসিসটেন্ট ছিল।'

কাঁধের পেশী শক্ত হয়ে গেল ওর। 'শিলা ব্রাউন?' চাউনি তীক্ষ্ণ, সতর্ক।

'হ্যাঁ। সেদিন,' ঢোঁক গিলল ফ্রিম্যান। যন্ত্রণায় কুঁচকে উঠল চোখের কোণ। 'সেদিন সন্ধ্যায় ওর ওখানে…নিমন্ত্রণ ছিল আমার। কিন্তু…গিয়ে ওকে পাইনি বাসায়। ওর…ওর নিশ্চই কিছু হয়েছে… রানা…। শিলার বাসার সামনেই…আমাকে…কারা যেন…।'

চিন্তার ঝড় বইতে শুরু করেছে ওর মাথার মধ্যে। 'ঠিকানা বলো শিলার।'

'এতদিনে…আমার একটা…খোঁজও নিল না শিলা। টেলিফোনও…'

'শিলার ঠিকানা বলো।'

'নব্বই, লেক্সিংটন রোড। দোতলা।'

'কিসে চাকরি করে ও এখন?'

'ওআরআইতেই। অন্য এক…অন্য এক সাইনটিস্টের অ্যাসিসটেন্ট।'

'ঠিক আছে, জিম। আমি খোঁজ নিচ্ছি।'

'ওর খোঁজ পেলে…।'

'আমি আবার আসছি। তুমি ভেবো না।'

'রানা…'

'শান্ত হও, জিম,' বেরোবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে মাসুদ রানা। 'শিলার খোঁজ নিয়ে আবার আসব আমি।'

ঝড়ের বেগে কেবিন ত্যাগ করল ও। লবিতে মুখোমুখি হলো ব্রুস অ্যাডকিন্সের। 'এক মিনিট বেশি নিয়ে ফেলেছেন আপনি, স্যার,' অভিযোগের সুরে বলল সে।

কানে গেল না রানার। ছুটে গিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ল। পিছনের চাকার ছাল চামড়া খানিকটা জায়গায় রেখে বিদ্যুৎবেগে বেরিয়ে গেল হাসপাতাল ছেড়ে। শিলার অ্যাপার্টমেন্টের সামনে যখন পৌঁছল ও, দুটো বাজতে তখন বিশ মিনিট বাকি। দোতলার দরজায় অন্য নাম দেখে বিস্মিত হলো রানা। কয়তলায় যেন বলেছিল ফ্রিম্যান? দোতলায়, না তিনতলায়? অন্য ভাবনায় ব্যস্ত ছিল মন, শোনা হয়নি ঠিকমত।

ভাবতে ভাবতে তিনতলায় উঠে এল ও, দরজার নামটা পড়ল, তারপর চারতলা। না, কোথাও নেই শিলার নাম। ব্যাপার কি! কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল মাসুদ রানা। তারপর তরতর করে নামতে শুরু করল। নিচতলার দরজায় প্রোপ্রাইটর সাইন দেখেছে রানা, ওখানে খোঁজ নিয়ে দেখবে। ওর আপাদমস্তক চোখ বোলাল বৃদ্ধা ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে। 'কি চাই?'

'আপনার দোতলার টেনেন্ট শিলা ব্রাউনকে খুঁজছি আমি।'

'শিলা নেই। ভাগিয়ে দিয়েছি ওকে আমি।'

'বুঝলাম না,' ইতস্তত ভঙ্গিতে বলল রানা। 'ওর অপরাধ?'

'এখানে ভদ্রলোকেরা থাকে। ওর মত জেলখাটা চোরকে আমি রাখতে পারি না।'

হতভম্ব হয়ে গেল ও। 'জেলখাটা চোর! কি করেছে সে?'

অল্প কথায় ঘটনা জানাল বৃদ্ধা। শুনতে শুনতে বিস্ময়ের মাত্রা বাড়তে লাগল রানার। 'রায় হওয়ার তিনদিন পর শিলার এক কাজিন এসেছিল। ভাড়া চুকিয়ে ওর মালপত্র নিয়ে গেছে সে।'

'শিলার কাজিন?'

'হ্যাঁ। চেহারা দেখে তাকেও আরেক শয়তান মনে হয়েছে আমার।'

'তার নাম জানেন?'

'হ্যাঁ। মারফি ম্যাডেলিন।'

'চেহারার বর্ণনা...?'

নিখুঁত বর্ণনা দিল বৃদ্ধা জেসির। এমনকি শাল গায়ে থাকলেও তার হাতে যে সে সিরিঞ্জের দাগ দেখেছে, তাও উল্লেখ করল। 'ও যদি আমার মেয়ে হত,' বলল বদ্ধা, 'ওর নিচের শূন্য স্থান আমি জুতোর হিল দিয়ে পূরণ করে দিতাম।'

'বয়স কি রকম হবে তার?'

'হয়তো কিছু কমই হবে। কিন্তু ওইসব ছাইপাঁশ নেয় বলে বেশি মনে হয়। বাইশ...কি তেইশ।'

'ঠিকানা?'

'জানি না, বলেনি। তবে টেক্সাসে থাকে নাকি সে। শিলার খবর পেয়ে এখানে এসেছে।'

এটা ওটা আরও প্রশ্ন করল রানা বৃদ্ধাকে। তারপর সন্তুষ্ট মনে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠল। ও যখন ইগনিশন কী ঘোরাচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে পুলিস চীফ ফ্রেড উইলিয়ামসনের টেলিফোনটা বেজে উঠল। স্টেট হাসপাতাল থেকে জানানো হলো, সাংবাদিক জিম ফ্রিম্যান এখন খানিকটা সুস্থ। কথা-টথা দুয়েকটা বলতে পারবে। পুলিস যদি তার বক্তব্য রেকর্ড করতে চায়, এখনই যেন লোক পাঠায়।

এবারও দায়িত্ব দেয়া হলো ডিটেকটিভ মরভিন ক্রিস্টেনসেনকে। কিছু মনে করল না সে। কারণ এ মুহূর্তে মনটা বেশ প্রসন্ন তার। দিনটা মন্দ যায়নি। ভালই কাজ দেখিয়েছে সে আজ। সাইরেন বাজিয়ে রকেটের বেগে ছুটল সে হাসপাতাল।

তাকে দেখে এগিয়ে এল ব্রুস অ্যাডকিনস। তফাতে দাঁড়িয়ে মরভিনকে দেখছে নার্স মেয়েটি। অ্যাডকিনসের গালে হালকা লিপস্টিকের দাগ দেখে ঠোঁট টিপে হাসল মরভিন। মেয়েটির দিকে তাকাল একবার। 'ভালই চলছে ডিউটি, ব্রুস?'

শুনেও না শোনার ভান করল লোকটা। 'তাড়াতাড়ি ওপরে যাও। যে কোন সময় আবার জ্ঞান হারাতে পারে লোকটা। দেখো, বেশি কথা বলিয়ো না ওকে

দিয়ে।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি ওদিকটা দেখছি, তুমি সিস্টারকে দেখো।'

কিন্তু ছুটে এসে লাভ হলো না। চরম দুর্বলতা আর ক্লান্তির কারণে ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে ফ্রিম্যান। আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করে হতাশ হয়ে ফিরে গেল মরভিন। ওদিকে, রানাও একই সময় সিটি কোর্ট হাউস থেকে বেরোল। শিলা ব্রাউনের গ্রেফতার, তার বিচার এবং রায় সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে ফেলেছে ও এর মধ্যে। গাড়িতে ওঠার আগে একটা পে-ফোন থেকে আলতাফের নম্বর ঘোরাল রানা। কিন্তু পেল না তাকে।

বেরিয়ে এসে গাড়ি ছাড়ল রানা। তুফান গতিতে ছুটল উইমেন'স হাউস অভ কারেকশনের দিকে। গড়ে পঁচানব্বই মাইল গতিতে গাড়ি চালিয়ে জায়গামত পৌঁছল বিশ মিনিট পর, তখন রীতিমত ঘামছে ও। ভাগ্য ভাল, সেই বাসটা ছিল তখন ওখানে। ওর ড্রাইভারের মুখে শিলা ব্রাউনকে সেদিন সকালে জেল গেট থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা শুনল রানা। জেসি কুপারের ঠিকানা সংগ্রহ করল প্রিজন রেকর্ডস থেকে।

তারপর শহরে ফিরে চলল। প্রায় এক ঘণ্টা খোঁজাখুঁজির পর মেয়েটিকে পেল মাসুদ রানা। কথা বলল তার সঙ্গে। সেদিনের দুই প্রাইভেট ডিটেকটিভের বর্ণনা দিল ওকে জেসি কুপার। সঙ্গে ওদের গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বরও।

গাড়িতে ফিরে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে বসল রানা। তথ্য পাঁচ, শিলা ব্রাউন প্রফেসর মারগুব হোসেনের গবেষণা সহকারী ছিল তাঁর এমসিজেড ফর্মুলা আবিষ্কারের প্রায় মাঝ পর্যায় পর্যন্ত। দশ দিন আগে চুরির দায়ে ধরা পড়ে মেয়েটি, সাতদিনের জেল এবং পঞ্চাশ ডলার জরিমানা হয় তার। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর দুই ভুয়া পুলিস জেলগেট থেকেই তাকে হেডকোয়ার্টারের কথা বলে তুলে নিয়ে যায়।

তথ্য ছয়, তারও আগে শিলার কাজিন পরিচয় দিয়ে টেক্সাসের মারফি ম্যাডেলিন নামে এক মেয়ে তার বাসা খালি করে জিনিসপত্র নিয়ে যায়। মেয়েটিকে সারফেস থেকে গায়েব করে ফেলা হয়। কেন? সত্যিই কি চুরি করেছিল শিলা? তথ্য সাত, ঘটনার দিন তার বাসায় নিমন্ত্রণ ছিল জিম ফ্রিম্যানের, কিন্তু বাসায় গিয়ে তাকে পায়নি সে। কেন পায়নি বোঝাই যায়। এরপর ঘটে ফ্রিম্যানকে মারধরের ঘটনা। কেন মারা হলো ওকে? শিলার নিরুদ্দেশ নিয়ে সে যাতে পুলিসকে কিছু জানাতে না পারে সেই জন্যে? উত্তেজিত হয়ে উঠল মাসুদ রানা। কয়েকদিন আগে-পরে শিলা ও প্রফেসর মারগুবের নিরুদ্দেশ হওয়ার বিষয়টি কি নিছক দৈব-সংযোগ, নাকি একই সুতোয় বাঁধা?

হঠাৎ চমকে উঠল রানা। তখনকার মন খুঁতখুঁত করার কারণটা একেবারে বিনা নোটিসে মনে পড়ে গেছে। ওই ক্ষমাপ্রার্থী বিজ্ঞাপনটাই এর কারণ। কি যেন নাম? ডক্টর পল ম্যাথিয়াস। প্রখ্যাত ব্রেন স্পেশালিস্ট। অপারগ সে, আজ থেকে তিন সপ্তাহের জন্যে...কেন? আজ থেকেই কেন? এমন কি অসুবিধেয় পড়ল লোকটা আজ থেকেই? গতকাল থেকে পড়তে কি হয়েছিল? অথবা আগামীকাল

পড়লে কি হত?

ডাক্তারের সঙ্গে কি···চিন্তাটা মাথার ভেতর ঘুরপাক খেতে খেতে এক সময় জমাট বেঁধে বসল কংক্রিটের মত। কেন যেন মন বলছে শিলা-মারগুব হোসেনের বিষয়টার সঙ্গে এরও একটা যোগসূত্র আছে। নিচের ঠোঁট কামড়ে চোখ কুঁচকে সামনে তাকিয়ে রয়েছে মাসুদ রানা। এখনও যথেষ্ট ঝাপসা ছবিটা। তবে আশার কথা, একটু একটু করে স্পষ্ট হতে আরম্ভ করেছে।

প্যারাডাইস সিটি সেলফ সার্ভিস স্টোরের ডিটেকটিভের সঙ্গে কথা বললে হয়তো আরও স্পষ্ট হবে তা। এরপর খুঁজে বের করতে হবে সেই দুই ভুয়া পুলিসকে। ওটা সম্ভব হলে বাকিটা নিয়ে সমস্যা হবে না। ওদের মুখ খোলাবে ও। হাতটা নিশপিশ করে উঠল মাসুদ রানার। স্টার্ট দিল ও, আরেকবার যেতে হবে হাসপাতালে। শিলার কোন কাজিন আছে কি না জানতে হবে। কিন্তু লাভ হলো না গিয়ে। ঘুমিয়ে পড়েছে ফ্রিম্যান।

.পেট ঠাণ্ডা করতে ছুটল মাসুদ রানা। খিদেয় জান বেরিয়ে যাওয়ার দশা।

# এগারো

কমার্শিয়াল হারবারের তৈলাক্ত পানির দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে চমৎকার সাজসজ্জার দোতলা এক রেস্টুরেন্ট, দ্য ক্র্যাব অ্যাণ্ড লবস্টার। এদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে খদ্দেরকে খোলামেলা জায়গায় বসে খেতে হয় না। মাঝখানে চলাচলের পথ, দু'পাশে চারজন বসার মত খুদে কেবিন। ওর ভেতর খাওয়া, আলাপ-আলোচনা বা অন্য কিছু, ইচ্ছে মত চালাতে পারে খদ্দের।

চারটে বাজতে কয়েক মিনিট বাকি থাকতে জেরি লাটিমারের ক্যাডিলাক ফ্লিটউড এসে থামল রেস্টুরেন্টের সামনে। মালিক একজন গ্রীক। হাসিখুশি, আমুদে স্বভাবের মানুষ। খাতির করে দোতলার সেরা কেবিনটিতে তাকে বসাল সে। আকারে এটা অন্যগুলোর চাইতে বেশ বড়। ডেকোরেশনও চমৎকার।

ইদানীং ঘন ঘন তার রেস্টুরেন্টে আসছে মানুষটা। ভাব-চক্কর দেখে বোঝা যায় প্রচুর পয়সার মালিক। প্রায় সময়ই আরও দু'জন থাকে এর সঙ্গে। সবাই এক সঙ্গে আসে না অবশ্য। এই লোক আসে আগে, অন্য দু'জন পরে। পরের দু'জন যেন কেমন। দামী গাড়ি চড়ে আসে, দামী পোশাক পরে, কিন্তু চাউনি-কথাবার্তা অন্যরকম, এই ভদ্রলোকের সঙ্গে একেবারেই বেমানান। গ্রীকের ধারণা, লোক দুটোর ভেতর অশুভ কিছু একটা রয়েছে।

তবু ব্যাপারটা মেনে নিয়েছে সে। হাজার হোক, খদ্দের। তার হচ্ছে খাবারের বিল নিয়ে কথা। ওটা ঠিকমত পেলেই হলো। কার ভেতর কি আছে দেখার দরকার কি। কেবিনে বসে লবস্টার স্যাণ্ডউইচ আর কোকের অর্ডার দিল জেরি। পিছনের জানালা দিয়ে হারবারের দিকে তাকাল। অসংখ্য রংচঙে ফিশিং ট্রলারে

ভরে আছে হারবার। খোলা ডেকে ধূমপান করছে জেলেরা, গল্প করছে। কখনও কখনও প্রাণখোলা হাসিতে ফেটে পড়ছে। মোটরের ধক্ ধক্ কোরাস ছাপিয়ে তীরে আছড়ে পড়ছে এসে সে আওয়াজ।

জেরি লাটিমারের মনটা ভার হয়ে আছে। হফারের অর্পিত দায়িত্ব ঠিকমতই পালন করতে পেরেছে সে। কিন্তু বেশি যাকে ভয় তার, সেই মাসুদ রানার কোন খোঁজ পাচ্ছে না সকাল থেকে। অ্যাসাইলামের খবর পেয়ে ভোরে বেরিয়েছিল লোকটা। ফিরেছিল এগারোটার দিকে, আধঘণ্টা পর আবার বেরিয়ে গেছে। এরপর আর কোন খবর নেই মাসুদ রানার। কোথায় আছে লোকটা, কি করে বেড়াচ্ছে, অনুমান করাও মুশকিল। তার ফিরে আসার প্রতীক্ষায় থাকতে থাকতে ক্লান্ত, উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে লাটিমার। সকালে যে তৃপ্ত, সন্তুষ্ট ভাবটা ছিল, এখন তার ছিটেফোঁটাও নেই। মনে কেবলই খারাপ খারাপ আশঙ্কা জাগছে।

গেল কোথায় মাসুদ রানা? প্রফেসরের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা তদন্ত করছে? কিন্তু ওর হাতে তো কোন সূত্র নেই। তাহলে? স্যাণ্ডউইচ শেষ করে কোকে চুমুক দিল জেরি লাটিমার। এই সময় ভেতরে ঢুকল ক্যাগার ও ডজ। ইশারায় তাদের বসতে বলল সে।

'খবর কি?'

'সব ঠিক। কোথাও কোন গণ্ডগোল নেই,' বলল আলেক্স ক্যাগার। 'পুলিসি সার্চ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখন যেখানে আছে, সেখানেই থাকবে ওরা তিন জন। তারপর সরিয়ে নিয়ে যাব আসল জায়গায়। আর যদি এর মধ্যে কাজ হয়ে যায়, তাহলে তো কথাই নেই।'

মাথা দোলাল জেরি লাটিমার। ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর পুলিস খুব জোর তৎপরতা শুরু করে দেবে, হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল কার্ল হফার। এয়ার সার্চ হবে, তা-ও বলেছিল। পরামর্শ দিয়েছিল, প্রফেসর এবং তার দুই সঙ্গী, শিলা আর গুস্থারকে দু'চার দিন শহরের বাইরে কোথাও লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে। তারপর, পুলিসি তৎপরতায় ভাটা পড়লে নিয়ে যেতে হবে তাদের আসল জায়গায়।

'এদিকে কোন অসুবিধে হয়নি তো?' জানতে চাইল ক্যাগার।

উত্তরটা জানা নেই জেরির, তাই ভেতরে ভেতরে অসহিষ্ণু হয়ে উঠল খানিকটা রাগও হলো ক্যাগারের ওপর। পাল্টা প্রশ্ন করল সে। 'কেন ভাবছ অসুবিধে হবে?'

এক চোখের ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তাকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল লোকটা। চেহারা অভিব্যক্তিহীন। সঙ্গে সঙ্গে মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা দেখা গেল জেরি লাটিমারের মধ্যে। সে জানে, ওকে খুব একটা পাত্তা দেয় না ক্যাগার। কার্ল হফারের অনুপস্থিতিতে তার সব নির্দেশ ঠিকই মানে লোকটা, কিন্তু তা সে হফারের প্রতিনিধি বলে, এবং টাকাটাও তার হাত দিয়ে আসে তাই। নইলে ব্যক্তি লাটিমারের মূল্য তার কাছে নেই তেমন। সে কেন, আসলে কাউকেই পাত্তা দেয় না মানুষটা।

'আমি ভাবছি না,' ভয়ঙ্কর শান্ত গলায় বলল আলেক্স ক্যাগার। 'ফ্যাক্টস্ জানতে চাইছি। কারণ এর সঙ্গে কেবল আপনার নয়, আমাদের নিরাপত্তার প্রশ্নও জড়িত।'

জ্যাক ডজ খুব বিব্রত বোধ করল। ক্যাগার স্পষ্টবাদী, জানে সে। কিন্তু তাই বলে জেরির সঙ্গে এ ধরনের ঠাস্‌ঠোস্ কথা বলা তার উচিত হয়নি। 'আরে, বাদ দাও। খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে। কোথায় এলাম খাব বলে। তা না...' বাকি কথা ঠোঁট পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে জমে গেল ডজের।

অত্যন্ত ধীর ভঙ্গিতে ঘাড় ঘুরিয়ে তার দিকে তাকাল ক্যাগার। তাকিয়েই থাকল পলকহীন। বুকের ভেতর ধড়ফড় করে উঠল জ্যাক ডজের। জিভ, গলা শুকিয়ে গেল। অবস্থা বেগতিক দেখে তাড়াতাড়ি বেল বাজিয়ে দিল জেরি লাটিমার। 'তোমরা কে কি খাবে, বলো।'

তাকাল না আলেক্স ক্যাগার। চিবিয়ে চিবিয়ে ডজকে বলল, 'সিরিয়াস ব্যাপারকে সিরিয়াসলি নিতে শেখো। নইলে কখন মৃত্যু এসে দরজায় টোকা দেবে, টেরও পাবে না।'

দরজায় গ্রীক স্বয়ং উদয় হয়েছে তাই ব্যাপারটা ওখানেই চাপা পড়ে গেল। পেট পুরে খেয়ে বেরিয়ে গেল ওরা। জেরির দিকে আর একবারও তাকায়নি আলেক্স ক্যাগার।

ব্যাপারটা অস্বস্তিতে ফেলে দিল তাকে। ওকে খেপিয়ে দেয়াটা বোধহয় ঠিক হয়নি। লোকটার সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাতের কথা মনে পড়ল জেরির। চার বছর আগের কথা, কার্ল হফারের নির্দেশে একজন ঠাণ্ডা মাথার খুনীর সন্ধানে অন্ধকার জগৎ চষে বেড়াচ্ছিল তখন সে। তবে জেরি ক্যাগারকে খুঁজে বের করেনি, বাস্তবিকপক্ষে সে-ই খুঁজে বের করেছে তাকে। জেরির খোঁজাখুঁজির খবর কিভাবে যেন পেয়ে নিজেই চলে আসে দেখা করতে।

তখন দেখতে মোটামুটি সুন্দর ছিল লোকটা। অন্তত এখনকার মত এক চোখ কাঁচের ছিল না। গালে অমন বিচ্ছিরি কাটা দাগটাও ছিল না। কথাবার্তা শেষে লোকটাকে পছন্দ হলো জেরির। বিশেষ একটা কাজে নিয়োগ করল সে তাকে। সিআইএ-র এক এজেন্ট, কার্ল হফারের বিরুদ্ধে এমন কিছু তথ্য-প্রমাণ জোগাড় করে ফেলেছিল, যা তাকে অন্তত দু'শো বছর সশ্রম কারাদণ্ড খাটানোর জন্যে যথেষ্ট ছিল। ব্যাপার টের পেয়ে লোকটাকে কিনে ফেলতে চেয়েছিল হফার, কিন্তু পারেনি।

এরপর তাকে ঠাণ্ডা করে দেয়া ছাড়া হফারের সামনে আর কোন পথ ছিল না। কাজটা করার জন্যেই খোঁজা হচ্ছিল লোক। সফল হতে পারলে নগদ বিশ হাজার। সব শুনে আলেক্স ক্যাগারের মনে হয়েছিল এ কোন কাজই নয়। সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল নিয়ে যাবে, বেল টিপবে, তারপর, লোকটা দরজা খুললেই...।

কিন্তু যত সহজ ভেবেছিল সে, ততই কঠিন হয়ে পড়েছিল কাজটা। উদ্যত পিস্তল হাতে ক্যাগার বেল পিটতে এজেন্টের স্ত্রী খুলল দরজা। ব্যাপারটা মুহূর্তের

জন্যে সিদ্ধান্তহীনতার মধ্যে নিক্ষেপ করল তাকে। পরমুহূর্তেই অবশ্য সামলে নিল সে, মহিলাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। আন্দাজও করতে পারেনি যে দরজার পিছনেই লুকিয়ে আছে তার স্বামী, পিস্তল আছে তার হাতেও।

মাথার পিছনে শক্ত নলের স্পর্শ পেয়ে জমে গেল আলেক্স ক্যাগার। অস্ত্র ফেলে দিল এজেন্টটির নির্দেশে। এরপর ঠেলতে ঠেলতে তাকে সীটিংরূমে নিয়ে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য করল লোকটা। স্ত্রীকে বলল পুলিসে ফোন করতে। পলকহীন চোখে লোকটাকে দেখছিল ক্যাগার। দেখে যাই মনে হোক, আসলে বিন্দুমাত্র ভয় পায়নি সে। এজেন্টটি যখন মুখ ঘুরিয়ে মুহূর্তের জন্যে স্ত্রীর দিকে ফিরে তাকে কাঁপাকাঁপি বন্ধ করে সঠিক নম্বর ঘোরাবার নির্দেশ দিচ্ছিল, কোমর থেকে বড় এক ছোরা বের করেই ঝাঁপ দিল ক্যাগার।

ছোরাটা আমূল ঢুকিয়ে দিল এজেন্টের বুকে। পরমুহূর্তে বিস্ফোরণের প্রচণ্ড আওয়াজ ও অসহ্য ব্যথায় জ্ঞান হারাবার দশা হলো ক্যাগারের। বাঁ চোয়ালের হাড় গুঁড়িয়ে দিয়ে এবং বাঁ চোখ নিয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট। লোকটা ততক্ষণে মারা গেছে। রক্তে মুখ ভেসে গেছে ক্যাগারের, চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, ওরই মাঝে বাকি কাজ সারল সে মরিয়া হয়ে। ওই ছোরা দিয়েই খুন করল এজেন্টটির স্ত্রীকে। তারপর নিজের পিস্তল কুড়িয়ে নিয়ে কিভাবে যে ওখান থেকে পালিয়ে এসেছিল সে, তা এক ইতিহাস। তার দুর্দান্ত সাহসই আজ তার কার্ল হফারের চীফ অ্যাসাসিন হতে পারার মূল কারণ।

এরপর থেকে লোকটার সঙ্গে কথা বলার সময় হিসেব করে বলতে হবে, নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল জেরি লাটিমার। কি দরকার শুধু শুধু বিপদ বাড়িয়ে!

আস্তে আস্তে চোখ মেলল শিলা ব্রাউন। মাথার ওপর এবড়োখেবড়ো পাথুরে সিলিং, কেমন এক আলোছায়া আলোছায়া ভাব। আমি কোথায়? ভাবল সে, উঠে বসল ঝট করে। খেয়াল করল, একটা ক্যাম্পখাটে শুয়ে ছিল সে। মেঝের দিকে তাকাল, পাকা নয়, বেলে মাটি।

মুহূর্তে সজাগ, সতর্ক হয়ে উঠল শিলা। নিশ্চিত হলো, কোন পাহাড়ের গুহায় রয়েছে সে। দু'পা নামিয়ে দিল খাট থেকে। মাথার ভেতরটা কেমন যেন ফাঁপা, শূন্য মনে হচ্ছে তার। কোন ওজন নেই যেন, তুলোর মত হালকা। গলা ব্যথা করছে এখনও।

'তাড়াহুড়ো কোরো না,' ছায়া থেকে বেরিয়ে এল মারফি ম্যাডেলিন। 'বসে থাকো। কেমন বোধ করছ এখন?' অভয়ের হাসি হাসছে সে।

'আমি কোথায়?' মেয়েটিকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করল শিলা। 'তুমি কে?' দাঁড়িয়ে পড়ল। কিন্তু পায়ে জোর পাচ্ছে না। হাঁটু কাঁপছে।

'উঠো না, বসো,' আরও এগিয়ে এল মারফি। 'আমি বুঝতে পারছি তুমি ঘাবড়ে গেছ। কিন্তু আসলে ঘাবড়াবার কিছু নেই। এখানে তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। কোন ভয় নেই। বসে পড়ো।'

ওর ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে খাটের কিনারায় বসল শিলা।

'কিছু খাবে তুমি? যা খেতে ইচ্ছে করে– কফি? যা মন চায় বলে ফেলো।' এগিয়ে এসে ওর পাশে বসল মারফি। আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল পিঠে। 'আমি জানি, জানোয়ার দুটো খুব একটা ভাল ব্যবহার করেনি তোমার সঙ্গে। তবে আর ভয় নেই। আমি আছি তোমার...'

'কে তুমি?' হাত খানেক সরে বসল শিলা ব্রাউন। 'আমাকে কেন নিয়ে আসা হয়েছে এখানে?'

'ঠিক আছে, বলছি।' সামান্য বিরতি। 'সোজা কথায় তোমাকে হাইজ্যাক করা হয়েছে। আমি তোমার দেখাশোনার জন্যে আছি, আপাতত। মারফি বলে ডেকো আমাকে।'

'হাইজ্যাক...?' চোখ কপালে উঠে গেল শিলার।

'হ্যাঁ। কিন্তু তাতে ঘাবড়াবার কিছু নেই। কেউ কোন ক্ষতি করতে যাচ্ছে না তোমার। এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ তুমি। ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। এ মুহূর্তে, দেখতেই পাচ্ছ একটা গুহায় আছ তুমি। তোমাকে তুলে আনা হয়েছে বিশেষ একটা কাজ করে দেয়ার জন্যে।'

'কাজ!'

'হ্যাঁ।'

'কি কাজ?'

'বলছি। তবে তার আগে কিছু ব্যাপার তোমার বুঝে নেয়া দরকার। যারা কিডন্যাপ করেছে তোমাকে, খুব ভয়ঙ্কর মানুষ তারা। ওদের হাড়ে হাড়ে চিনি আমি। বলতে পারো, আমিও তোমারই মত ওদের একজনের হাতে বন্দী। অনেকদিন থেকে। যতক্ষণ ওদের নির্দেশমত চলবে, ততক্ষণ তোমার কোন ক্ষতি করবে না ওরা। কিন্তু কথা না শুনলেই বিপদ। এই দেখো,' গায়ের শালটা ফেলে দিল মারফি। ডান হাতটা সোজা করে ধরল মেয়েটির চোখের সামনে। সারা হাতে দেখা যাচ্ছে অসংখ্য বিন্দু। 'এগুলো কি, জানো?'

'সুঁই!' গলা কেঁপে গেল শিলার।

'হ্যাঁ। ওদের একজনকে অমান্য করেছিলাম বলে আজ আমার এই অবস্থা। রোজ চারটা ফিক্স না হলে পাগল হয়ে যাই আমি। কথা না শুনলে তোমারও এই অবস্থা করবে ওরা। ফিক্সের জন্যে এমন কোন জঘন্য, নাংরা কাজ নেই যা আমি করতে পারি না। তাই আমি চাই না আমার মত তোমার জীবনটাও বরবাদ হোক। একবার যদি এই জিনিসে অভ্যস্ত হয়ে পড়ো, কোনদিন আর মুক্তি নেই।'

'কি...কি করতে হবে আমাকে?' অদম্য কাঁপুনি উঠে গেছে মেয়েটির সারা দেহে। আতঙ্কে ঘেমে উঠেছে সে। ঢোঁক গিলছে ঘন ঘন।

'এক সময় প্রফেসর মারগুব হোসেনের ল্যাব অ্যাসিসটেন্ট ছিলে না তুমি?'

কাঁপুনি বন্ধ হয়ে গেল শিলার। তাজ্জব হয়ে মারফির দিকে চেয়ে থাকল। 'হ্যাঁ! তাতে কি?'

'আমি যা শুনেছি, তাঁর কোন এক গুরুত্বপূর্ণ ফর্মুলা ডিকোড করার ব্যাপারে এদের সাহায্য করতে হবে তোমাকে।'

'আমি সে ব্যাপারে কি সাহায্য করব? আমি তার কি জানি?'

'তুমি প্রফেসরকে ফর্মুলাটা ডিকোড করে দিতে রাজি করাবে কেবল।'

'প্রফেসরকে রাজি...প্রফেসরকে কোথায় পাচ্ছি আমি?'

'সে নিয়ে তোমাকে ভাবতে...'

'তাছাড়া আমি বললেই উনি তা করবেন কেন?'

'যাতে করেন, সেই ব্যবস্থাই করতে হবে তোমাকে। নইলে এরা ছাড়বে না। সে যাই হোক। পরেরটা পরে দেখা যাবে। আগে থেকে মাথা গরম করে লাভ নেই কোন। বলো, কি খাবে? কফি?'

পাঁচটার একটু পরে আবার স্টেট হাসপাতালে এল মরভিন ক্রিস্টেনসেন। এইমাত্র ঘুম ভেঙেছে জিম ফ্রিম্যানের। সে পৌঁছার ঠিক দু'মিনিট আগে দ্বিতীয় দফা ঘুরে গেছে মাসুদ রানা এখান থেকে। দেখা হয়নি ওর ফ্রিম্যানের সঙ্গে। ঘুমিয়ে ছিল সাংবাদিক।

পাঁচ মিনিটে যা জানার ছিল জানা হয়ে গেল ডিটেকটিভের। নোট বই পকেটে গুঁজে ছুটল সে শিলা ব্রাউনের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙের উদ্দেশে। সেখান থেকে কোর্ট বিল্ডিং, কোর্ট বিল্ডিং থেকে প্যারাডাইস সিটি নারী সংশোধনাগার। তারপরই আবার ফিরে এল শহরে, জেসি কুপারের খোঁজে।

জট একটু একটু করে খুলছে, সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একচুল একচুল করে কপালে উঠছে ডিটেকটিভ মরভিনের ভুরু।

# বারো

'ঘুমের ওষুধ?' কপাল কুঁচকে ডিটেকটিভ জিন মরিসের দিকে তাকালেন পুলিস চীফ।

'এক্সপার্ট তো তাই বলছে।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন ফ্রেড উইলিয়ামসন। 'এর মানে কি?'

'সম্ভবত পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বাইরের সাহায্য পেয়েছে প্রফেসর। কিন্তু...একটা বিস্ময় আমার মাথায় আসছে না।'

'কোনটা?'

'চেয়ারের ভাঙা পায়ার ব্যাপারটা, চীফ। ওটা দিয়ে পিটিয়ে নার্সকে হত্যা করা হয়েছে, কেন তা আমাদের বিশ্বাস করাবার চেষ্টা করা হলো?'

'হুঁম! বোঝা মুশকিল।'

'এখনও কোন খবর হলো না প্রফেসরের। সারাদিন গেল। স্টেট অ্যালার্ম ঘোষণা করলে কেমন হয়, চীফ?'

'সম্ভব না। নিষেধ আছে ওয়াশিংটনের। প্রেস জেনে যাবে।'

'ওরা জেনে গেছে। ইভনিং এডিশনে ছাপা হয়েছে খবরটা।'

'ওহ্, গড! কি করে জানল ওরা?'

'বলতে পারি না। তবে এত বড় খবর, চাইলেও চেপে রাখা যায় না।'

'কি লিখেছে?'

'তেমন কিছু না। একজন নার্সকে হত্যা করে প্রফেসর মারগুব হোসেন পালিয়ে গেছে, এইসব। ডিটেল নয় খবরটা। আরেকটা ব্যাপার, চীফ, সকালে অ্যাসাইলামের ডিউটি ডক্টরের সঙ্গে প্রফেসরের আচার-আচরণ নিয়ে অনেক কথা হয়েছে আমার। তার মতে আগে কখনোই প্রফেসরকে ভায়োলেন্ট, এমনকি রেগে উঠতে পর্যন্ত দেখা যায়নি। এ-ও আরেক চিন্তার বিষয়। যতদূর বোঝা যায় মানুষটা ছিল ঠাণ্ডা মেজাজের। তার হঠাৎ এভাবে খেপে ওঠা, জলজ্যান্ত একজন মানুষকে খুন করে বসা…ঠিক খাপ খায় না।'

কফির জন্যে বেল বাজালেন ফ্রেড উইলিয়ামসন। একই সঙ্গে টেলিফোনের বেলও বেজে উঠল তাঁর। রিসিভার তুললেন পুলিস চীফ।

'দিস ইজ ম্যাক্স অলব্রাইট, চীফ অভ ইউএস অর্ডন্যান্স রিসার্চ ইনস্টিটিউট।'

সিধে হয়ে বসলেন উইলিয়ামসন। 'ইয়েস, স্যার।' নামে ভদ্রলোককে চেনেন তিনি। জানেন, মানুষটি অমায়িক মার্জিত স্বভাবের। ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট পার্সন।

'কোন খোঁজ পাওয়া গেল প্রফেসর মারগুব হোসেনের?'

'না, স্যার। এখনও কোন খবর নেই। তবে চেষ্টা চলছে। ওভারহেড সার্চ চলছে। তাছাড়া ফেডারেল এজেন্ট, ট্রুপস…

'বুঝেছি। আমি কাল সকালে আসছি প্যারাডাইস সিটিতে

'ইয়েস, স্যার।'

'আপনাকে নিশ্চই বুঝিয়ে বলতে হবে না প্রফেসর হোসেন কত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের কাছে?'

'না, স্যার। আমি জানি।'

'দুনিয়ার সমস্ত অর্থ-সম্পদের বিনিময়েও ওরকম একটা মাথা পাওয়া যাবে না। যে করেই হোক, উদ্ধার করতেই হবে তাকে।'

'বুঝতে পেরেছি, কিন্তু এদিকে খানিকটা সমস্যা হয়ে গেছে, স্যার।'

'কিসের?'

'খবরটা লিক করেছে, স্যার। জেনে গেছে প্রেস।'

'জানুক, অসুবিধে নেই। প্রেস বরং এখন আমাদের প্রধান ভরসা। লোকাল ওআরআইকে বলে দিয়েছি আমি প্রফেসরের ছবি রেডি রাখতে, আপনাকে পৌঁছে দিতে। ছবিগুলো আজ রাতের মধ্যে স্থানীয় সব পত্রিকায় রিলি করবেন আপনি। কাল প্রথম পাতায় ওই ছবি ছাপতে বলবেন সবাইকে। সঙ্গে কি নিউজ যাবে, তা সন্ধে নাগাদ আপনার হাতে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করব আমি। সেন্সরড্ নিউজ। ওর বাইরে বাড়তি একটা শব্দও যেন কেউ না বসায়, সেটা আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে।'

'শিওর, স্যার।'

'বিষয়টা খুবই স্পর্শকাতর। ওর সঙ্গে কেউ যদি কোন মন্তব্য জুড়তে যায়, মারাত্মক বিপদ হতে পারে।'

'জ্বি, বুঝেছি। আমি সামাল্ দেব, স্যার। চিন্তা নেই।'

'এয়ারপোর্টে আমার জন্যে গাড়ি পাঠাবেন। সকাল আটটায় ল্যাণ্ডিং আমার। ফ্লাইট ফোর থ্রী।'

'রাইট।'

'এবং অ্যাসাইলাম ঘটনার লিখিত পূর্ণ বিবরণও তৈরি রাখবেন।'

'রাখব স্যার, মাসুদ রানাও বর্তমানে এখানে আছেন।'

'মাসুদ রানা?'

'রানা এজেন্সির চীফ। অ্যাসাইলামের সিকিউরিটির দায়িত্ব পালন করছে ওর এজেন্সি।'

'ও, হ্যাঁ। তাতে কি?'

'লোকটা প্যারাডাইসে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে ঘটল দুর্ঘটনাটা। সন্দেহ হচ্ছে এতে ওর কোন হাত আছে কি না।'

'না, বোধহয়। আচ্ছা, ঠিক আছে। এসে দেখব আমি ব্যাপারটা।'

'অল রাইট, স্যার।'

ফোন রেখে দিলেন ম্যাক্স অলব্রাইট। কফি শেষ করে কাগজ কলম নিয়ে বসলেন চীফ উইলিয়ামসন। ঘটনার পূর্ণ বিবরণ লিখতে হবে।

ভাবতে ভাবতে হোটেলে ফিরে চলেছে জেরি লাটিমার। ক্যাগার লোকটা আস্ত অকৃতজ্ঞ, চোয়াড়। সম্মান করতে জানে না মানুষকে। তুচ্ছ এক ঘটনা নিয়ে ডজ ছোকরার সামনে কি অপদস্থই না করল ওকে হারামজাদা।

না হয় একটা ভুল সে করেই ফেলেছে, তাই বলে এত দেমাগ? নিরাপত্তার ভাবনা কেবল ওরই আছে, জেরির নেই? যত ভাবছে, ততই মাথা গরম হয়ে উঠছে লাটিমারের। হারামজাদা, কুত্তার বাচ্চা! ওর মত থার্ড ক্লাস গুণ্ডাকে থোড়াই কেয়ার করে জেরি। বলতে গেলে তার জন্যেই আজ এত ওপরে উঠতে পেরেছে ক্যাগার, অথচ তাকেই কি না আজ…।

হাতের কাজ শেষ হোক, তারপর ওর ব্যাপারটা দেখবে জেরি। চিনি ছড়ালে পিঁপড়ের অভাব হয় না। ক্যাগারকে যেমন যোগ্য দেখে কাজে নিয়োগ করেছিল সে। তেমনি ওর চেয়ে আরও যোগ্য লোকও খুঁজে নেবে। তারপর শুয়োরের বাচ্চার…তবে এ-ও ঠিক, নিজেকেই বোঝাতে লাগল জেরি। পদ্ধতিটা হয়তো ঠিক হয়নি, তবে যা করেছে ক্যাগার, এক সেন্সে মন্দ করেনি। অশিক্ষিত এক গুণ্ডা, ওর কাছে কতই বা মার্জিত ব্যবহার আশা করা যায়?

জাহান্নামে যাক, এসব নিয়ে অনর্থক মাথা গরম করে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। মনে মনে ক্ষমা করে দিল সে আলেক্স ক্যাগারকে। মাথা গরম হওয়া মানেই ক্ষতি। কে যেন বলেছিল, ক্রোধের পরিণতি আফসোস? স্যুইটে ঢুকে প্রথমেই ক্লজিট খুলল জেরি লাটিমার। স্পূল দুটো ঘুরছে মন্থর বেগে।

হেডফোন তুলে কানে লাগাল সে। বোতাম টিপে রিওয়াইণ্ড করতে লাগল ফিতে। স্পূল ঘোরা শেষ হতে ফাস্ট প্লে বোতাম চাপল সে।

মিটার রিডিং দেখে নিয়েছে আগেই। এক কানের ফোন খানিকটা পিছনে সরিয়ে টেপের বক্তব্য শোনায় মন দিল জেরি। অন্য কান ব্যস্ত হেডফোনে। নেই। কোনদিকেই শোনার কিছু নেই। আগের রিডিং পর্যন্ত ঘুরে এল টেপ শব্দহীন। ওদিকে হেডফোনও কথা বলছে না। মনটা আরও অস্থির হয়ে উঠল লাটিমারের। তার মানে এখনও ফেরেনি মাসুদ রানা! কী যন্ত্রণা! গেল কোথায় মানুষটা? ওর স্যুইটে লিসনিং ডিভাইস প্ল্যান্ট করে তারই বা কি কচু লাভ হলো?

গ্লাসে কোক ঢেলে ক্রজিটের সামনে বসে পড়ল সে চেয়ার নিয়ে। কানে হেডফোন। এক সময় প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। সাড়ে পাঁচটায় ফিরল মাসুদ রানা। কিছুক্ষণ গুনগুন শোনা গেল তার। গান গাইছে বোধহয়। তারপর কোন দরজা বন্ধ হওয়ার 'দড়াম' শব্দ। অনেকক্ষণ আর কোন আওয়াজ নেই। গোসল করছে হয়তো। প্রায় এক ঘণ্টা পর লোকটার সাড়া পাওয়া গেল। টেলিফোনে রূম সার্ভিসকে হালকা নাশতা, কফি ইত্যাদির অর্ডার দিল সে।

আবার আধ ঘণ্টা চুপচাপ। এরমধ্যে রূম সার্ভিসের আগমন এবং এঁটো বাসন-কোসন নিতে আসা টের পেয়েছে লাটিমার। এর একটু পরই বেজে উঠল মাসুদ রানার টেলিফোন। ভরাট, কর্তৃত্বপূর্ণ গলা শোনা গেল তার। 'ইয়েস! আলতাফ? হ্যাঁ,' মৃদু হাসল রানা, 'তোমাদের এখানকার হাওয়া খুব স্বাস্থ্যকর। ঘুরে ঘুরে প্রচুর হাওয়া খেলাম সারাদিন। ...তুমি আটটার দিকে একবার এসো। ...না, রাতেই। সকালে নয়। ...হ্যাঁ, আবার বেরুচ্ছি আমি। ...ভাল কথা, প্যারাডাইস সেলফ সার্ভিস স্টোরটা কোনদিকে?' নামটা শোনামাত্র শক্ত হয়ে গেল জেরি লাটিমার। বিপদের ডঙ্কা বেজে উঠল বুকের ভেতর। পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে, তারপরও আরও ভাল করে শোনার জন্যে হেডফোন কানের সঙ্গে ঠেসে ধরল সে দু'হাতে। '...আচ্ছা! হ্যাঁ, চিনেছি। ...অ্যাঁ? ...না, কিছু কিনতে নয়, ওদের ডিটেকটিভের সঙ্গে একটু গপ্পো-সপ্পো করতে যাচ্ছি।'

দম আটকে এল জেরির। বিশুদ্ধ অক্সিজেনের অভাবে খাঁচার ভেতর হাঁসফাঁস করছে হৃৎপিণ্ড। সামনেই উদ্যত ফণা বিষাক্ত সাপ দেখতে পেয়েছে যেন সে, এমন ভাবে আঁতকে উঠল। বলে কি! ঘামতে শুরু করল জেরি। মাসুদ রানাকে ফোন রেখে দিতে শুনে হেডফোন ছুঁড়ে ফেলল। কী সর্বনাশ! মরে গেছি! ইত্যাদি অসংলগ্ন চিন্তা করতে করতে ঝাঁপিয়ে পড়ল টেলিফোনের ওপর।

অপারেটরকে বাইরের লাইন দিতে বলল সে অধৈর্য কণ্ঠে। ডায়াল টোন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাগারের নাম্বার ঘোরাল। হাত-পা এরই মধ্যে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে তার। ভাগ্যিস ডিভাইসগুলো প্ল্যান্ট করেছিল সে। নইলে যে কি...।

'হ্যালো!'

'ক্যাগার? বিপদ! সেই স্টোর ডিক ধরা পড়তে যাচ্ছে। ধরা পড়লে মুখ খুলবে লোকটা, তোমার বর্ণনা প্রকাশ...'

'কারা ধরতে যাচ্ছে, পুলিস?' খবর শুনে চমকে উঠেছে লোকটা।

'পুলিসের বাবা! এক্ষুণি ছোটো, নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থা করো ডিকের।'

'ঠিক আছে, যাচ্ছি আমি।'

সেলফ স্টোরে ঢোকার মুখে এক লোকের সঙ্গে ধাক্কা লাগল রানার। বেরিয়ে আসছিল লোকটা। প্রায় ওরই সমান লম্বা সে। হালকা পাতলা গড়ন। একটা চোখ কাঁচের। বাঁ গালে দীর্ঘ কাটা দাগ। 'দেখে হাঁটুন,' বলল রানা।

'মাফ করবেন,' বলে বেরিয়ে গেল লোকটা। জোর পায়ে কারপার্কের দিকে চলেছে।

ভেতরে বেজায় ভিড়। সামনে উপচে পড়া ট্রলি নিয়ে এ শেলফ ও শেলফ করছে ক্রেতারা। বেশিরভাগই মহিলা। সংঘর্ষ এড়াবার জন্যে এঁকেবেঁকে এক কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়াল মাসুদ রানা। এক সেলস্ গার্লকে সামনে পেয়ে জানতে চাইল, 'তোমাদের ডিটেকটিভ কোথায়?'

হ্যাণ্ডসাম যুবকটির আপাদমস্তক চোখ বোলাল মেয়েটি। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে বলল, 'ঠিক বলতে পারছি না। পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে বোধহয়।' বেগুনী নেইলপলিশ লাগানো দীর্ঘ তর্জনী তুলে দূরে 'প্রাইভেট' লেখা একটা বন্ধ দরজা দেখাল মেয়েটি। 'ওখানে গিয়ে দেখুন। না পেলে বলতে পারি না, সার্চ করে দেখতে পারেন আমাকে।'

মুচকে হাসল রানা। 'এখন ব্যস্ত আছি। অন্য সময় সার্চ করব।' পা বাড়াল ও। দরজাটা খোলা, ফাঁক হয়ে আছে সামান্য। আস্তে করে পাল্লাটা ঠেলা দিল রানা। 'হ্যালো!' সাড়া দিল না কেউ। ভেতরে ঢুকল ও। বড়সড় একটা স্টোররুম এটা। দরজার কাছেই বড় একটা কাঠের বাক্সের ওপর বসে আছে এক লোক এদিকে পাশ ফিরে।

মেয়েটি ঠিকই বলেছিল, ঘুমাচ্ছে। দু'পা এগোল মাসুদ রানা, জমে গেল জায়গায়। রক্ত! নাকের ডগা বেয়ে টপ্ টপ্ করে রক্ত ঝরছে ডিটেকটিভের। তার কপালের ঠিক মাঝখানে গোল একটা ফুটো। ওখান থেকে নাক বেয়ে বুক-পেট ভিজিয়ে ফেলেছে গড়িয়ে নামা রক্ত। গায়ের সঙ্গে লেপটে আছে শার্ট।

অবাক চোখে কিছুক্ষণ লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা। তারপর বেরিয়ে এল। চিন্তায় কুঁচকে উঠেছে কপাল। কাজটা যে-ই করে থাকুক, দু'-তিন মিনিটের ভেতরেই করেছে। কোন সন্দেহ নেই তাতে।

***

# নকল বিজ্ঞানী-২

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৫

## এক

ব্রেন স্পেশালিস্ট পল ম্যাথিয়াসের ডোরবেল চাপল আলতাফ মির্জা। রাত আটটা। সাড়ে আটটায় অফিসে আসার কথা ছিল মাসুদ রানার। কিন্তু সাড়ে সাতটা বাজতে না বাজতে এসে হাজির ও। মুখটা গম্ভীর, চিন্তিত। প্যারাডাইস সেলফ সার্ভিস স্টোর থেকে আসছে মাসুদ ভাই, কেবল এটুকুই জানতে পেরেছে আলতাফ।

ওদের ডিটেকটিভের সঙ্গে কি নিয়ে কথা বলতে গিয়েছিল রানা, জানে না সে। জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সাহস হয়নি। এসেই ওকে বলল, এই ডাক্তারের হঠাৎ ক্লিনিক বন্ধ করার কারণ জেনে আসতে। ব্যাপারটা নাকি সন্দেহজনক। তাই এসেছে আলতাফ। সন্দেহ কেন জেগেছে মাসুদ ভাইয়ের মনে, বুঝে ফেলেছে সে। শুধু সন্দেহজনকই নয়, ব্যাপারটা রীতিমত বিস্ময়করও। অ্যাপয়েন্টেড রোগীদের সমস্যার কথা চিন্তা না করে…কি ব্যাপার! খুলছে না কেন কেউ? আবার বেল চাপল ও।

তিনবার বেল চাপার পর দরজা খুলল সেদিনের বয়স্কা নার্সটি।

'বলুন?'

'ডক্টর ম্যাথিয়াস…?'

'উনি তো নেই। ক্লিনিক বন্ধ করে দেয়া হয়েছে তিন সপ্তার জন্যে।'

'তা জানি,' হাতের ভাঁজ করা পত্রিকাটা দোলাল আলতাফ মির্জা। 'পত্রিকায় দেখেছি। কিন্তু হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত কেন নিয়েছেন আপনারা, বুঝতে পারছি না। পরশু আমার ছোট ভাইকে তাঁর দেখার কথা, অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। এই সময় হঠাৎ…'

'আমি দুঃখিত,' যদিও মোটেই দুঃখিত মনে হলো না নার্সটিকে। 'ক্লিনিক খুললে আসুন।'

বেশ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে হলো আলতাফকে। 'ডক্টর কি শহরের বাইরে কোথাও গেছেন? নাকি অসুস্থ?'

'বাইরে গেছেন।'

'কোথায় গেছেন…?'

'জানি না। বলে যাননি আমাদের।'

'দেখুন, আমার ভাইয়ের অবস্থা খুব খারাপ। বেশি দেরি হলে হয়তো আরও মারাত্মক হয়ে উঠবে।'

'সরি, মিস্টার। কিছু করার নেই আমাদের। ক্লিনিক খুললে আসুন।'

হতাশার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল আলতাফ। 'আচ্ছা!' দু'পা গিয়ে কি ভেবে ঘুরে দাঁড়াল। 'তাহলে তিন সপ্তাহ পর খুলবে ক্লিনিক, তাই না?'

'সেরকমই কথা আছে। তবে বলা যায় না, আরও বেশিও লাগতে পারে। আসার আগে টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসবেন। পুরানো সব অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল করে দেয়া হয়েছে।'

ঘুরে গেটের দিকে পা বাড়াল আলতাফ।

রানা এজেন্সি।

রানার মুখোমুখি বসে আছে আলতাফ মির্জা। কপাল কুঁচকে আছে মাসুদ রানার। আলতাফকে ম্যাথিয়াসের খোঁজ জানতে পাঠিয়ে ও নিজেও বেরিয়েছিল। গিয়েছিল পুলিস স্টেশনে, চীফের সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু পাওয়া যায়নি তাঁকে। বাইরে ব্যস্ত। ডিটেকটিভ জিন মরিসের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে রানার।

কফির কেমিক্যাল টেস্টের ফল পজিটিভ। পো অ্যাকশন ঘুমের ওষুধ মেশানো হয়েছিল ওতে। ওখান থেকে আবার অফিসে। আসার পথে প্যারাডাইস হেরাল্ড এবং আরও কয়েকটা পত্রিকার সান্ধ্য সংস্করণ কিনে এনেছে রানা। সবগুলো পত্রিকা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছে। প্রফেসর মারুগুব হোসেন যে একজন নার্সকে হত্যা করে পালিয়ে গেছেন অ্যাসাইলাম থেকে, সবগুলো পত্রিকাই সে ব্যাপারে মোটামুটি একমত। কেউ কেউ গার্ডদের দায়িত্বহীনতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে। ওদিকে অ্যাসাইলামের অতীতের দুর্ঘটনার কথাও পাঠকদের মনে করিয়ে দিয়েছে কোন কোন পত্রিকা।

এটা ছাড়াও আরেকটা খবর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে রানার। সেটা হলো রোজমেরি শেরম্যান নামে এক কলগার্লের মৃত্যু সংক্রান্ত। সব পত্রিকাতেই আছে সংবাদটা। পত্রিকাগুলো সরিয়ে রেখে মুখ তুলল ও। 'ডাক্তারের খবর তাহলে পাওয়া গেল না?'

'জ্বি না,' হতাশ কণ্ঠে বলল আলতাফ। 'খুব চেষ্টা করেছি। বুড়ি সাংঘাতিক চতুর। আমার মনে হচ্ছে আপনার সন্দেহই ঠিক, মাসুদ ভাই। ওটা ছাড়া এত লম্বা সময়ের জন্যে লোকটার গায়েব হয়ে যাওয়ার আর কোন যুক্তি দেখি না আমি। আসার সময় নার্স বলল, আরও বেশিও লাগতে পারে তার ফিরতে।'

'হুঁম!'

কিছুক্ষণ উসখুস করে প্রশ্নটা করেই বসল আলতাফ। 'সেলফ সার্ভিস স্টোরে গিয়েছিলেন···দেখা হয়েছে ওদের ডিটেকটিভের সঙ্গে?'

'হয়েছে। তবে জ্যান্ত নয়, মৃত ডিটেকটিভের সাথে।'

'জ্বি?'

ব্যাপারটা আলতাফকে খুলে জানাল রানা। 'সে কি!' বিস্মিত হলো সে।

'যেই খুন করে থাকুক লোকটাকে, আমি পৌঁছার দুই কি তিন মিনিট আগে ঘটনাটা ঘটেছে। কোন সন্দেহ নেই। পরে ভাবলাম ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলি। কিন্তু হঠাৎ করে এক সেলসম্যানের চোখে পড়ে যায় মৃতদেহটা। হুলস্থুল শুরু হয়

দোকানে। ফিরে আসা ছাড়া কোন উপায় ছিল না।'

ঘড়ি দেখল আলতাফ মির্জা। 'পৌনে নয়টা বাজে। এতক্ষণে পরিস্থিতি শান্ত হয়েছে হয়তো। চলুন, আরেকবার ঘুরে আসি ওখান থেকে।'

'আজ থাক। সকালে যাব।'

'ঠিক আছে।'

'মারফি ম্যাডেলিন নামে এক মেয়ের খোঁজ বের করতে হবে, আলতাফ। মেয়েটা জাঙ্কি, হেরোইন অ্যাডিক্ট।' শিলা ব্রাউনের বাড়িওয়ালির মুখে শোনা মারফির বর্ণনা দিল তাকে মাসুদ রানা।

'মেয়েটা কি এর সঙ্গে জড়িত?'

'হ্যাঁ, জড়িত। শিলা ব্রাউনের কাজিন পরিচয় দিয়ে ক'দিন আগে মেয়েটি তার বাসা খালি করে জিনিসপত্র সব নিয়ে এসেছে। শিলা ব্রাউন জেলে ছিল সে সময়।'

'শিলা ব্রাউন! জেলে ছিল! ঠিক বুঝলাম না, মাসুদ ভাই, কে এই মেয়ে?'

'এক সময় প্রফেসর মারগুব হোসেনের ল্যাব সহকারী ছিল শিলা।'

চোখ কপালে উঠল আলতাফের।

'শিলাও লাপাত্তা।'

'জ্বি?'

'গত পরশু সকালে সাত দিনের জেল খেটে মুক্তি পায় শিলা ব্রাউন। কিন্তু বাসায় ফেরার সুযোগ পায়নি। নারী সংশোধনাগারের গেট থেকে দুই ভুয়া পুলিস তুলে নিয়ে যায় তাকে। তারপর থেকে খোঁজ নেই শিলার।'

'ইয়াল্লা! কি করে জানলেন আপনি এসব?' বলেই জিভ কাটল আলতাফ মনে মনে। 'মানে, মেয়েটিকে চিনতেন আপনি?'

দাঁতে দাঁত চেপে মাথা দোলাল রানা। 'ওর প্রেমিক আমার বন্ধু। সাংবাদিক। আজ থেকে দশ দিন আগে, ওই সেলফ সার্ভিস স্টোরে চুরির দায়ে ধরা পড়ে শিলা ব্রাউন, বিকেল সাড়ে পাঁচটা-ছয়টার দিকে। এবং পৌনে আটটার দিকে শিলার অ্যাপার্টমেন্টের সামনেই কারা যেন খুব মারধর করে সেই সাংবাদিককে। বেধড়ক পিটিয়ে অজ্ঞান করে ফেলে রেখে যায় তাকে। স্টেট হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে সে এখন।'

আপনি কি হেরাল্ডের জিম ফ্রিম্যানের কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ। টানা নয়দিন অজ্ঞান থাকার পর আজই সকালে জ্ঞান ফিরেছে ওর।'

'আমি পড়েছিলাম ঘটনাটা,' অন্যমনস্কের মত বলল আলতাফ। 'তার মানে এ দুটোর সঙ্গে প্রফেসরের অপহরণের যোগসূত্র আছে ভাবছেন আপনি?'

'হ্যাঁ, ভাবছি। যোগসূত্র না থেকেই পারে না।'

'অর্থাৎ চুরির দায়ে শিলা ব্রাউনকে ফাঁসানো হয়েছিল?'

'যে জিনিসগুলো চুরি করেছে বলে শিলাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে, তার সবগুলো সস্তা, ইমিটেশনের আংটি-চেইন ইত্যাদি। মেয়েটি এসব চুরি করেছে বিশ্বাস করতাম আমি, যদি না সে প্রফেসর মারগুব হোসেনের এক্স ল্যাব অ্যাসিসটেন্ট হত। তারপর জিমের ব্যাপারটা ভাবো। ওকে কারা পেটাল, কেন?

উত্তর হচ্ছে, শিলার প্রেমিক সে, তাই। তায় এখানকার নামকরা সাংবাদিক। সেলফ স্টোরে গিয়ে যাতে আসল তথ্য বের করতে না পারে, শিলার অন্তর্ধান নিয়ে বাতাসে যাতে সন্দেহ ছড়াতে না পারে, সে জন্যে ওকে মারধর করা জরুরী হয়ে পড়েছিল। একই কারণে স্টোর ডিটেকটিভকেও মরতে হলো। যারা রয়েছে এসবের পিছনে, তারা ভালই জানে আজ না হয় কাল লোকটা মুখ খুলবেই। সে চাপে পড়ে হোক, বা পয়সার লোভেই হোক। কাজেই ওর মুখ চিরতরে বন্ধ করে দিয়ে নিরাপদ হওয়ার ব্যবস্থা করেছে তারা।'

কিন্তু ঠিক তখনই কেন ঘটল খুনের ঘটনাটা? ভাবতে লাগল মাসুদ রানা, যে মুহূর্তে ও গিয়ে হাজির হলো দোকানে? ব্যাপারটা অস্বাভাবিক না? এর আগে-পরে কেন ঘটল না! নাকি মাসুদ রানা তার সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছে জেনেই...তা কি করে হবে? আলতাফ আর ও ছাড়া কেউ জানত না তা। খবরটা ওকে টেলিফোনে জানিয়েছিল রানা। টেলিফোন! ওদের টেলিফোন ট্যাপ্ করা হচ্ছে না তো?

হলে কি ভাবে? সেটের সঙ্গে কোন ডিভাইস ফিট করা হয়েছে? আলতাফের সেটে? নাকি রানার হোটেলের সেটে? না সরাসরি লাইন ইন্টারসেপ্ট করা হচ্ছে মাঝপথে?

'তোমার টেলিফোন সেটটা,' বলল রানা, 'নিয়মিত চেক করা হয়, আলতাফ?'

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল মির্জা। প্রশ্নটা কেন করা হলো ভাবছে। 'হ্যাঁ, মাসুদ ভাই। আমি নিজ হাতে চেক করি রেগুলার। অবশ্য আজ...ঝামেলার কারণে...।'

'অল রাইট।' দুটো সেট এখানে, দুটোই কাছে টেনে নিল মাসুদ রানা। নীরবে ওর কাজ দেখছে আলতাফ। পনেরো মিনিট পর নিশ্চিত হলো রানা। 'ঠিক আছে। ক্লীন।'

'হঠাৎ টেলিফোন নিয়ে সন্দেহ জাগল কেন আপনার, মাসুদ ভাই?' কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না ও।

'তেমন কোন কারণ নেই। এমনিই দেখলাম।' হোটেলে ফিরেই নিজেরটা চেক করে দেখবে, ভাবল মাসুদ রানা। একটা হত্যাকাণ্ড আর দুটো অপহরণের সঙ্গে একটু আগে আরও একটা খুন যোগ হয়েছে। আরও দু-চারটে অকাল মৃত্যু ঘটে যাওয়াও অস্বাভাবিক নয়। বুঝতে পারছে রানা, এখানেই শেষ নয় এর। সামনে আরও আছে। কিন্তু বুঝেও কিছু করতে পারছে না ও। পারবেও না, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তত ভুয়া দুই পুলিসের খোঁজ পাওয়া সম্ভব না হচ্ছে। অথবা মারফি ম্যাডেলিনের সন্ধান।

'এই যাহ্!' সবিস্ময়ে বলে উঠল আলতাফ মির্জা।

ফাইল থেকে মুখ তুলল মাসুদ রানা। 'কি হলো?'

ওকে ফাইল পড়ায় ব্যস্ত দেখে খবরের কাগজগুলো তুলে নিয়েছিল সে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে তার একটার ওপর। মুখটা ঘন ঘন ডানে-বাঁয়ে করছে,

আর কোন দিকে খেয়াল নেই। রোজি শেরম্যানের মৃত্যু সংবাদ পড়ছে। পড়া শেষ হতে মুখ তুলল আলতাফ। হতভম্বের মত রানার দিকে তাকাল।

'কি ব্যাপার?' ভুরু নাচাল মাসুদ রানা।

'এই...এই মেয়েটাকে আমি চিনি, মাসুদ ভাই!' চড়া গলায় বলল সে।

'চেনো?' টেবিলে দুই কনুই রেখে ঝুঁকে বসল ও 'কে মেয়েটি?'

'ফিল সিমন্সের গার্ল ফ্রেণ্ড! রোজি, রোজমেরি শেরম্যান! কাজ করে ওয়াটার ফ্রন্টের এক নাইট ক্লাবে।'

'কি বললে!' শিরদাঁড়া টান টান হয়ে গেছে রানার। 'নিহত মেল নার্সের গার্ল ফ্রেণ্ড?'

'জ্বি। বছরখানেক আগে পরিচয় হয় ওদের, সেই থেকে প্রেম।'

'তারপর? তুমি জানো কি ভাবে?'

'আমাদের করিমের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক ছিল সিমন্সের। ওকে সব জানিয়েছিল সে। বলেছিল, ভাল একটা কাজ জুটিয়ে নিতে পারলেই অ্যাসাইলামের চাকরি ছেড়ে দেবে সে, বিয়ে করবে রোজিকে। তার হয়ে করিম আমাকে অনুরোধ করে, আপনি এলে বলে কয়ে আমাদের এজেন্সিতে সিমন্সকে একটা চলনসই বেতনের চাকরি দেয়া যায় কিনা চেষ্টা করে দেখতে।'

আলতাফের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল রানা। তারপর খবরটা ভাল করে পড়ল আবার। তর্জনী বাঁকা করে ঠক্ ঠক্ টোকা দিতে লাগল টেবিলে।

'ব্যাপারটা শোনার পর সিমন্সের ফাইলে মেয়েটার নাম, কোথায় কাজ করে এইসব টুকে রেখেছি আমি। একদিন নিজে গিয়ে চেক করে এসেছি সব।'

উঠে দাঁড়াল রানা। 'চলো। ঘুরে আসা যাক প্যারাডাইস ইন থেকে। মালিক কে ওটার?'

'লোকটা আইরিশ, নাম গিবসন। ডেভিড গিবসন।'

দশ মিনিট পর ওয়াটারফ্রন্টে পৌঁছল ওরা। হাত তুলে রানাকে বড় একটা লাল-নীল নিওন সাইন দেখাল আলতাফ। 'ওই যে ক্লাবটা।'

এখনও পুরোপুরি জমেনি রাতের আসর, তবু বেশ ভিড়। খদ্দেরদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করছে মেয়েরা। তবে ভাল করে লক্ষ করলে যে কেউ বুঝবে, প্রাণ নেই তাদের সে হাসিতে। না হাসলে চলে না, তাই হাসছে। আর সব; গ্লাসে গ্লাস ঠোকাঠুকির টুং টাং, ছুরি-কাঁটা চামচের আওয়াজ, গতানুগতিক। সিগারেটের ধোঁয়ায় ভেতরটা ঝাপসা। বারের দিকে পা বাড়াল মাসুদ রানা ও আলতাফ।

বার কাউন্টারের পিছনে দু'জনকে দেখা গেল। একজন সাদা চামড়ার, অন্যজন কালো। দু'জনেই বেশ গম্ভীর। অন্যমনস্ক। কাজ করে চলেছে নীরবে। সাদা চামড়াটিকে ইঙ্গিতে দেখাল মির্জা। 'মালিক।'

কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। 'ডেভিড!' মৃদু গলায় ডাকল রানা।

মুখ তুলল আইরিশ। অপরিচিত, নিষ্ঠুর চেহারার লোকটিকে দেখে কুঁচকে উঠল চোখ। আলতাফকেও এক নজর দেখল সে। ডান হাতটা কাউন্টারের তলায় সেঁধিয়ে গেছে লোকটার, না দেখার ভান করল রানা। 'বলুন?'

'আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে।'

'কিসের ব্যাপারে বলুন তো?'

কাউন্টারের ওপর কয়েকটা ছায়ার আবছা নড়াচড়া দেখে ঘুরে তাকাল ওরা। চার বডি বিল্ডার ঘিরে ফেলেছে ওদের। বাউন্সার।

'মারামারি করতে আসিনি আমরা,' বলল মাসুদ রানা। 'রোজির ব্যাপারে কিছু জানতে এসেছি।'

'রোজি!'

'রোজমেরি শেরম্যান।'

পরিষ্কার বোঝা গেল ঘাবড়ে গেছে আইরিশ। ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে চেহারা। 'পুলিস!' ফিসফিস করে বলল গিবসন।

'ডিটেকটিভ।'

এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল আইরিশ। 'আমি কিছু জানি না ওর ব্যাপারে।'

'আজ ভোরে হ্যারিসন অ্যাসাইলামে যে লোকটি খুন হয়েছে, সে রোজির প্রেমিক ছিল,' যেন কথার কথা, এমন ভাবে বলল রানা।

আরও সাদা হয়ে গেল গিবসনের চেহারা। চোরা চোখে বারবার এদিক ওদিক তাকাতে লাগল সে। নজরটা তার বিশেষ করে ক্লাবের প্রবেশপথ আর কাস্টমারদের ওপর নেচে বেড়াচ্ছে। কারণটা বুঝল রানা। 'এখানে কথা বলতে যদি অসুবিধে আছে মনে করেন, বাইরে চলুন। জেটিতে বসে কথা বলা যাবে। অন্ধকার আছে ওখানে।'

'কিন্তু...'

'ইচ্ছে করলে এদেরকেও সঙ্গে নিয়ে আসতে পারেন। তবে দেরি করবেন না দয়া করে। তাতে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।'

পনেরো মিনিট পর দু'জন বাউন্সারসহ ক্লাবের পিছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল গিবসন। সন্ত্রস্ত চোখে চার দিক দেখতে দেখতে দ্রুত ছোট জেটিটার দিকে চলল। ওখানে রানা ও আলতাফের ছায়া দেখা যাচ্ছে আকাশের পটে। পাটাতনে ক্যাঁচ-কোঁচ আওয়াজ উঠল ভারী তিনটে দেহের চাপে।

'কি জানতে চান তাড়াতাড়ি বলুন,' ভয়তাড়িত ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল ডেভিড। দুই বাউন্সারের একজন জেটিতে ওঠার মুখে দাঁড়িয়েছে, আরেকজন মালিকের গা ঘেঁষে।

'পত্রিকায় যা লিখেছে, জেটি থেকে পড়ে মৃত্যু হয়েছে রোজমেরির, মাতাল ছিল সে, আপনি বিশ্বাস করেন তা?'

একটু ইতস্তত করল গিবসন। 'আপনার পরিচয় জানা হয়নি।'

'ইনি মাসুদ রানা,' বলল আলতাফ। 'আমি আলতাফ মির্জা। আমরা অ্যাসাইলামের সিকিউরিটির চার্জে আছি। পত্রিকায় আজ রানা এজেন্সির নাম দেখেছেন হয়তো।'

'আই সী।' ঠোঁট মুড়ে কিছু একটা চিন্তা করল সে। 'না, আমি তা মনে করি না। আমার বারম্যানের কাছে শুনেছি, আজ ভোরে মদ একটু বেশিই পান করেছে

রোজি, কথা বলেছে বেশি বেশি, কিন্তু পুরোপুরি মাতাল সে ছিল না। চার বছর আমার ক্লাবে কাজ করেছে মেয়েটি, কখনও ওকে মাতাল হতে দেখেনি কেউ।'

'এর অর্থ দাঁড়ায় রোজিকে হত্যা করা হয়েছে, তাই না?'

চুপ করে থাকল ডেভিড গিবসন।

'বেশি বেশি কথা বলেছে মেয়েটি বললেন, কি ধরনের কথা ছিল সেসব? প্রলাপ জাতীয় অসংলগ্ন কথা?'

'না।' হাত তুলে ফ্রন্টের পশ্চিম দিক দেখাল লোকটা। 'ওদিকে একটা রেস্টুরেন্ট আছে, সী গাল। বলছিল, ওটা নাকি আজই কিনতে যাচ্ছে সে আর তার বয় ফ্রেণ্ড। বারো হাজার ডলারে। আচ্ছা, পত্রিকায় যে লিখেছে ছেলেটাকে প্রফেসর খুন করেছেন, ব্যাপারটা তাহলে সত্যি নয়?'

'আমরা তাই মনে করি।'

'ওহ্, গড! দু'জনকেই ওরা···।' বিড়বিড় করে বলল আইরিশ।

'কিছু বললেন?'

বাঁ হাত উল্টে চোখের সামনে এনে আনমনে গাঁট চুলকাতে লাগল সে ডান মধ্যমা দিয়ে। 'তাহলে আমি বোধহয় জানি কারা খুন করেছে ওদের।'

আর কোন প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকল মাসুদ রানা। মুখ যখন খুলেছে, বাকিটুকুও বলবে আইরিশ। নীরব থেকে তাকে বক্তব্য গুছিয়ে নেয়ার সুযোগ দিল ও।

'তিনদিন আগে রোজির খোঁজে এক লোক আসে আমার ক্লাবে। তার নাম জ্যাক ডজ। প্রফেশনাল কিলার। আমি প্রথমে মেয়েটিকে দেখা করতে দিতে রাজি হইনি তার সঙ্গে। ফলে আমাকে হুমকি দেয় লোকটা, বলে, সঙ্গী নিয়ে আমাকে শায়েস্তা করতে আবার আসবে সে। ওর সঙ্গী আরেক কিলার। এক চোখ নেই। কাঁচের নকল চোখ···'

ঢিলেঢালা ভাবটা পলকে দূর হয়ে গেল রানার। 'কাঁচের চোখ?'

'হ্যাঁ।'

'বাঁ গালে লম্বা কাটা দাগ···?'

'হ্যাঁ, সে-ই!' বিস্ময় ফুটল আইরিশের চেহারায়। 'আলেক্স ক্যাগার নাম। ওকে চেনেন আপনি?'

'বোধহয় চিনি,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা। 'বলে যান, প্লীজ।' পাশ থেকে অবাক চোখে ওকে দেখতে লাগল আলতাফ মির্জা। ভেবে পাচ্ছে না লোকটাকে কি করে চেনে মাসুদ ভাই।

'ডেকে দিলাম রোজিকে। জ্যাক ডজ ওকে কাপড় পরে বাইরে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে বলল, কি নাকি ব্যবসায়িক প্রস্তাব নিয়ে এসেছে সে রোজির জন্যে। প্রথমে যেতে চায়নি রোজি···।'

চুপ করে থাকল রানা। ভাবছে। 'তারপর আর এসেছিল ডজ বা ক্যাগার?'

'না, আর আসেনি।'

'আর কিছু?'

'এতক্ষণ ভেবেছি মৃত্যু দুটো কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তা নয়,' সাগরের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কের মত বলল ডেভিড।

'পুলিসকে জানাননি কিছু জ্যাক ডজ বা আলেক্স ক্যাগারের ব্যাপারে?'

'আমি কিছু বলিনি। তবে সকালে রোজির লাশ উদ্ধার করার পর এক ডিক এসেছিল। আমার ক্লাবের বারম্যানের জবানবন্দী নিয়ে গেছে সে। লোকটা অবশ্য ওই দুই বদমাশের ব্যাপারে কিছুই জানত না। রোজির ব্যাপারে ডিকের এটা-ওটা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে কেবল। ভাবছি, এবার আমারও পুলিসকে এসব জানানো উচিত। গোপন রাখা ঠিক হবে না। রোজি-সিমন্স দুজনেই অভাবী অথচ ভালমানুষ ছিল। ওদের টাকার লোভে জড়িয়ে অকালে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছে হারামীর বাচ্চারা, জেনে বুঝে চুপ করে থাকা যায় না। বিশেষ করে মেয়েটা...রোজমেরি, খুবই ভাল মেয়ে ছিল।'

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল ডেভিড গিবসন। 'চারটা বছর একসঙ্গে কাজ করেছি আমরা। আশ্চর্য! কাল রাতেও ছিল মেয়েটা, আজ নেই। ভাবতেও যেন কেমন লাগে।'

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, ডেভিড। তথ্যগুলো আমাদের অনেক সাহায্যে আসবে। ফিরে গিয়ে যদি আপনার বারম্যানকে মিনিট দশেকের জন্যে পাঠিয়ে দেন, খুশি হব।'

'নিশ্চয়ই।'

মিনিট পাঁচেক চাহামের সঙ্গে কথা হলো মাসুদ রানার। তারপর সী গালে গিয়ে বদ্ধ পার্কের মুখে তার ও রোজমেরির মৌখিক চুক্তির কথা বিস্তারিত শুনল ওরা। ফেরার পথে কোন কথা হলো না ওদের মধ্যে। রানা গম্ভীর, চিন্তিত। এক মনে ড্রাইভ করছে। আলতাফকে তার ডেরায় পৌঁছে দিয়ে সোজা হোটেলে ফিরে এল ও।

প্রথমেই টেলিফোন সেটটা চেক করে নিশ্চিত হয়ে নিল রানা। না, কোন ডিভাইস প্ল্যান্ট করা নেই। তারপর পুরো বিষয়টা নিয়ে ভাবতে বসল আরেকবার। তথ্য আট, তিন দিন আগে, পেশাদার খুনী জ্যাক ডজ প্যারাডাইস ইনে গিয়েছিল রোজিকে কোন এক লোভনীয় ব্যবসায়িক প্রস্তাব দিতে। মেয়েটি ছিল ফিল সিমন্সের প্রেমিকা। হঠাৎ করেই মেয়েটি বেশ বড় অঙ্কের টাকা হাতে পায়, বা পাবে বলে আশ্বাস পায়। এবং সেই টাকায় সে সী গাল রেস্টুরেন্ট কিনবে বলে মৌখিকভাবে পাকা কথা দিয়ে ফেলে ওটার মালিক পার্ককে। কত টাকার অফার দেয়া হয়েছিল রোজিকে? পনেরো, বিশ, নাকি পঁচিশ হাজার ডলারের? সে যাই হোক, ওটা বড় কথা নয়।

তথ্য নয়, আজই সী গালের মালিককে বারো হাজার ডলার দেয়ার কথা ছিল রোজির, রেস্টুরেন্টের মূল্য বাবদ। তার মানে কি এই যে আজই সে টাকাটা হাতে পাবে, এমন নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছিল রোজিকে? জ্যাক ডজ বা তার পরিচালকের কাজটা ফিল সিমন্স করে দিলেই? কি কাজ? কেবল কফিতে ঘুমের ওষুধ মেশানো? না, আরও কিছু ছিল? প্রফেসরকে ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো?

ছিল হয়তো। তবে সেটা এখন আর কোন বড় ব্যাপার নয়। ছবিটা এখন অনেক পরিষ্কার। প্রায় পুরোটাই দেখতে পাচ্ছে মাসুদ রানা। নাটকের কতজন পাত্র-পাত্রী, কার কি চরিত্র, সব দেখতে পাচ্ছে ও। দেখা যাচ্ছে না শুধু নাট্যকারের অবয়বটা।

# দুই

রাত সাড়ে বারোটায় বাসায় ফেরার সময় হলো পুলিস চীফ, ফ্রেড উইলিয়ামসনের। সারাদিন কেটেছে প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে। সামান্য জিরিয়ে নেয়ার সময়ও হয়নি। ওয়াশিংটনের সঙ্গে যোগাযোগ করে অ্যাসাইলামের ঘটনা রিপোর্ট করার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় লাফ-ঝাঁপ।

প্রফেসর মারগুব হোসেনের নাম জানতেন চীফ, তাঁর আবিষ্কার সম্পর্কেও কিছু কিছু ধারণা ছিল। কিন্তু তিনি যে কত গুরুত্বপূর্ণ মানুষ, ওয়াশিংটনকে তাঁর নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা জানানোর পর বুঝতে পেরেছেন তিনি। একেবারে হৈ-হৈ কাণ্ড বেধে গেছে ওদিকে। যে ভাবে হোক, উদ্ধার করতেই হবে প্রফেসরকে, সোজা কথা ওদের। এদিকে কাল সকালে ইউএস অর্ডন্যান্স রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রধান, ম্যাক্স অলব্রাইট আসছেন।

চিন্তায় চিন্তায় মাথা খারাপ হওয়ার দশা চীফের। পুলিস, ফেডারেল এজেন্ট, ট্রুপস্ সবাই হন্যে হয়ে খুঁজছে প্রফেসরকে। কিন্তু কোনদিক থেকেই কোন আশার আলো দেখা যাচ্ছে না। স্রেফ হাওয়া হয়ে গেছে মারগুব হোসেন। নেই হয়ে গেছে। কাজের কাজ যেটুকু হয়েছে, ডিটেকটিভ মরভিন করেছে তা। অ্যাসাইলামে নিহত মেল নার্সের সঙ্গে হারবার ফ্রন্টে নিহত মেয়েটির সম্পর্ক ছিল, ব্যাপারটা আবিষ্কার করেছে সে।

এ ব্যাপারে আর কি অগ্রগতি হয়েছে, আদৌ হয়েছে কি না জানার সুযোগ তাঁর হয়নি। এখন জানতেও চান না তিনি। এখন গোসল-খাওয়া সেরে সোজা বিছানায়। এক ঘুমে রাত কাবার করে সকালে আবার ভাবা যাবে এসব নিয়ে। বাড়ির গেটে গাড়ি রেখে গেট খোলার জন্যে নামলেন তিনি। দু'পা এগিয়েছেন গেটের দিকে, এই সময় পিছনে হর্ন শুনে ঘুরে তাকালেন।

তাঁর গেটের গজ দশেক দূরে আরেকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে। একটা কালো বুইক ওয়াইল্ডক্যাট। ভেতরে চালক ছাড়া আর কেউ নেই। লোকটার চেহারা চেনা যাচ্ছে না। উইলিয়ামসনের উদ্দেশে হাত নাড়ল লোকটা, কাছে ডাকছে তাঁকে। ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়ালেন চীফ। সঙ্গে কখনও অস্ত্র রাখেন না তিনি, আজও নেই। অথচ রাত-বিরেতে অজানা-অচেনা একজন হাত নাড়তেই পা বাড়িয়েছেন, বিপদ হতে পারে সে পরোয়া নেই। ফ্রেড উইলিয়ামসন প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী মানুষ। নিজের অথরিটির ওপর পরিপূর্ণ আস্থা আছে তাঁর।

লোকটাকে চিনলেন চীফ। ইস্টওয়াইড ওয়াটারফ্রন্টের প্যারাডাইস ইনের মালিক লোকটা, ডেভিড গিবসন। আইরিশ।

'ইভনিং, চীফ।'

'ইভনিং। কিছু বলবেন?'

'হ্যাঁ, কিন্তু এখানে বসে নয়,' এদিক ওদিক তাকাল ডেভিড। 'গাড়িতে উঠুন, চীফ। একটু ঘুরে আসি। চলতে চলতে কথা হবে।'

'বেশ।' ডেভিডের পাশে উঠে বসলেন বিস্মিত উইলিয়ামসন। বুঝতে পেরেছেন, লোকটা নিশ্চয়ই কোন গোপন তথ্য জানাতে এসেছে। তাতে অবশ্য বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। অনেকেই এটা-ওটা তথ্য দিয়ে পুলিসকে সাহায্য করে থাকে। কিন্তু এই মানুষটি অন্য ধরনের। পুলিস থেকে সব সময় সহস্র হাত দূরে থাকে ডেভিড গিবসন। তার এভাবে দেখা করতে আসা...কি এমন তথ্য জানাতে এল সে তাঁকে রাতের আঁধারে?

গাড়ি ছাড়ল গিবসন। 'রোজি শেরম্যানের ব্যাপারে আপনাকে কিছু জানাব বলে এসেছি আমি, চীফ।'

'রোজি শেরম্যান?' ভুরু কুঁচকে পাশে তাকালেন ফ্রেড। নামটা সম্প্রতি কোথাও তিনি শুনেছেন। তবে কোথায়, মনে করতে পারলেন না।

'যে মেয়েটিকে ওয়াটারফ্রন্ট থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আজ ভোরে। জেটি থেকে পড়ে...'

'ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ। মনে পড়েছে। আপনার ক্লাবেই তো কাজ করত মেয়েটা!'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে, বলুন।'

'পত্রিকায় লিখেছে, জেটি থেকে পড়ে গিয়ে মারা গেছে রোজি, আসলে তা সত্যি নয়।'

'সত্যি নয়?'

'না,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল আইরিশ।

'তাহলে কোনটা সত্যি?'

'হত্যা করা হয়েছে মেয়েটিকে।'

'হতে পারে। এমন তো রোজই কত ঘটছে।'

'ঘটছে, চীফ। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এর ভেতরে অন্য কিছু, মানে, গভীর কোন ষড়যন্ত্র রয়েছে। এটা কোন সাধারণ বিষয় নয়।'

সময় নিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন চীফ। 'বলে যান।'

গলা কেশে পরিষ্কার করে নিল গিবসন। স্টিয়ারিং বাঁয়ে ঘুরিয়ে জর্জ ওয়াশিংটন অ্যাভিনিউতে এসে পড়ল। 'আমার কেবলই মনে হচ্ছে রোজিকে কে হত্যা করেছে, আমি জানি। কিন্তু প্রমাণ করতে পারব না, করতে চাইও না। বউ-বাচ্চা নিয়ে সংসার করতে হয় আমাকে। নিজের প্রাণ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, সব যাবে, যদি ওরা ঘুণাক্ষরেও টের পায় আপনাকে এসব আমি জানিয়েছি।'

'ওরা?'

'তিন দিন আগে, রাত সাড়ে বারোটা-একটার দিকে জ্যাক ডজ নামে এক লোক আসে আমার ক্লাবে। লোকটাকে আমি চিনি, সাংঘাতিক বিপজ্জনক মানুষ। পেশাদার খুনী। কেন এসেছে সে, জানতে চাইলাম। বলল, রোজি শেরম্যানের সঙ্গে দেখা করতে চায়। ওর সঙ্গে তার ব্যবসা সংক্রান্ত আলোচনা আছে।

'ইচ্ছে ছিল না রোজিকে তার সামনে আনার। কিন্তু হুমকি দিল জ্যাক ডজ, যদি মেয়েটিকে তার সঙ্গে দেখা করতে দেয়া না হয়, পরে তার বন্ধুকে নিয়ে আবার আসবে সে, বারোটা বাজাবে আমার ব্যবসার। বাধ্য হলাম ওদের কথা শুনতে। গোপনে অবশ্য রোজিকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম লোকটার ব্যাপারে। আলোচনা করার জন্যে রোজিকে ক্লাবের বাইরে নিয়ে যায় সে। কাজটা কি জানি না, তবে করে দিলে রোজিকে পাঁচ অঙ্কের লাভ দেবে বলে প্রস্তাব দিয়েছিল জ্যাক ডজ। অবাক ব্যাপার, কাজ ফেলে বাইরে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে যে সময় নষ্ট হবে রোজির, তার দাম হিসেবে নগদ পাঁচশো ডলার দেয় সে। টাকাটা আমাকে দেখিয়েছে রোজি।'

সামনে লাল সঙ্কেত দেখে ওয়াইল্ডক্যাট দাঁড় করাল ডেভিড গিবসন। সামনের ভিউ মিরর দিয়ে পিছনের গাড়িগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। তেমন সন্দেহজনক কাউকে চোখে না পড়ায় আশ্বস্ত হলো।

'তারপর?'

'কথাবার্তা বলে ফিরে আসার পর কেমন অন্যরকম লাগছিল মেয়েটিকে আমার। কথা বলছে বেশি, হাসছে অকারণে, এইসব। জিজ্ঞেস করলাম কি আলাপ হলো। দেখলাম এড়িয়ে যেতে চাইছে রোজি। বলতে চাইছে না। ওকে সাবধান করার অনেক চেষ্টা করেছি আমি। কিন্তু শুনল না রোজি। অভাবী মেয়ে, বিরাট অঙ্কের টাকার লোভে পড়ে...আজ ভোরে, মারা যাওয়ার মাত্র কিছুক্ষণ আগে আমার বারম্যানকে রোজি নাকি বলেছে, আজই একটা রেস্টুরেন্ট কিনতে যাচ্ছে ও।'

'আই সী!'

'হ্যারিসন অ্যাসাইলামের যে মেল নার্সকে আজ ভোরে হত্যা করা হয়েছে, ফিল সিমন্স, রোজির বয়-ফ্রেণ্ড ছিল সে।'

সোজা হয়ে গেছেন পুলিস চীফ। হাতের সিগারেট পুড়ছে, খেয়াল নেই। নরম বিছানা, বিশ্রাম-ঘুম, ভুলে গেছেন সব। ঝড়ের গতিতে চিন্তা চলছে মাথায়। ডিটেকটিভ মরভিনকে পাঠানো হয়েছিল রোজির ব্যাপারটা তদন্ত করতে। কতদূর জানতে পেরেছে সে, জানেন না চীফ। সময় হয়নি তার রিপোর্ট দেখার। সকালে অফিসে গিয়েই...'কি নাম বললেন লোকটার, জ্যাক ডজ?'

'হ্যাঁ। আরেক সঙ্গী আছে তার, আলেক্স ক্যাগার। দুটোই এক। সমান বিষধর। পকেটে সবসময় কড়কড়ে নোটের তাড়া থাকে এদের। দামী দামী পোশাক পরে। এরা সাধারণ গুণ্ডা-পাণ্ডা নয়, চীফ। খুব সম্ভব এদের পিছনে পয়সাওয়ালা কেউ আছে।' সামান্য বিরতি। 'রোজি মেয়েটাকে ভাল লাগত আমার। খারাপ মেয়ে, জানি, কিন্তু ওর মনটা ছিল সাদা।'

'অল রাইট, ডেভিড। আর কিছু?'
'একটু আগে রানা এজেন্সির চীফ আমার ক্লাবে এসেছিল।'
'মাসুদ রানা?'
'হ্যাঁ। সঙ্গে ছিল এজেন্সির লোকাল চীফ। এসেছিল রোজির ব্যাপারে জানতে।'
তার মানে তিনি যা সন্দেহ করেছেন, ভাবলেন ফ্রেড, তা সত্য নয়! মাসুদ রানার হঠাৎ আসা এবং প্রফেসরের নিখোঁজ হওয়ার ভেতরে কোন সংশ্রব নেই? ব্যাপারটা সম্পূর্ণ কাকতালীয়? তাই হবে। নইলে কেন লোকটা পুলিসি তদন্তে নামবে? ভেতরে ভেতরে রানার ওপর রেগে উঠলেন চীফ। কিন্তু কেন তা জানেন না।
গাড়ি ঘোরাল গিবসন। 'চলুন, বাসায় পৌঁছে দি' আপনাকে।'
বাসায় ঢুকেই পুলিস স্টেশনে ফোন করলেন উইলিয়ামসন। 'সার্জেন্ট! মরভিনকে দাও।'
কয়েক সেকেণ্ড পর সাড়া দিল ডিটেকটিভ। 'চীফ?'
'হারবারফ্রন্টে নিহত রোজি মেয়েটির সঙ্গে অ্যাসাইলামের মেল নার্সের সম্পর্ক ছিল, বলেছিলে না সকালে?'
'হ্যাঁ। ছেলেটা ওর বয়-ফ্রেণ্ড ছিল। আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছি, যার সবগুলোর সঙ্গেই প্রফেসর মারগুব হোসেনের অন্তর্ধানের যোগসূত্র আছে। রিপোর্ট লিখে আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি আমি।' বেশ-খুশি খুশি মনে হলো তাকে।
'সরি। ইউএস অর্ডন্যান্স রিসার্চ ইনস্টিটিউটের চীফ আসছেন কাল। ওঁর দেয়া কিছু কাজ নিয়ে বাইরে ছিলাম আমি। যা হোক, সংক্ষেপে বলো কি কি জানতে পেরেছ।'
'যে সাংবাদিককে ক'দিন আগে মারধর করা হয়, জিম ফ্রিম্যান, ওর বান্ধবীর নাম শিলা ব্রাউন। এক সময় প্রফেসর মারগুব হোসেনের ল্যাব অ্যাসিসটেন্ট ছিল শিলা।'
'সো?'
'তিনদিন থেকে মেয়েটি নিখোঁজ। ওর অ্যাপার্টমেন্টে...'
'আচ্ছা, রাখো,' বললেন চীফ। ভাবলেন এরপর হয়তো আরও আছে। শোনার পর মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে শুরু করবে চিন্তাগুলো। বিশ্রাম, ঘুম সব মাথায় উঠবে। তারচেয়ে বরং সকালে লিখিত রিপোর্ট পড়েই জানা যাবে। 'সকালে এসে দেখব ওসব। এখন আরেকটা কাজ করো। জ্যাক ডজ আর আলেক্স ক্যাগার, এই দু'জনের ব্যাপারে তথ্য চাই আমি। যেখান থেকে যেভাবে পারো জোগাড় করো।'
নাম দুটো মনে মনে কয়েকবার উচ্চারণ করল ক্রিস্টেনসেন। 'নাম ছাড়া আর কিছু...চীফ?'
'না। নাম দুটোই জানতে পেরেছি। রিপোর্টগুলো তৈরি করে বাসায় গিয়ে ঘুম দাও। সকাল আটটায় ওগুলো আমার ডেস্কে চাই আমি। সাথে তোমাকেও।'

'রাইট, চীফ।'

ফোন রেখে অন্দরমহলের দিকে পা বাড়ালেন ফ্রেড উইলিয়ামসন। ওদিকে ভাবতে বসেছে মরভিন ক্রিস্টেনসেন। এরা দুটো নিশ্চয়ই আণ্ডারওয়ার্ল্ডের বুকে হাঁটা কঠিন পদার্থ হবে। এদের খোঁজ জানাবার মত কয়েকটি সোর্স আছে তার। টাউনসেণ্ড ওর মধ্যে সেরা। তাকেই ধরা যাক। ওই জগতের সবজান্তা টাউনসেণ্ড। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল মরভিন। পনেরো মিনিট পর তার দরজায় নক করল সে।

তিনবার নক করার পর ভেতরে পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। খুলে গেল দরজা। টাউনসেণ্ড ছোটখাটো। তাগড়া শরীর। ধূর্ত চাউনি। পরনে বটল গ্রীন পায়জামা, উলের রোল নেক গেঞ্জি। চুল এলোমেলো। বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছে। লোকটাকে ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল ডিটেকটিভ। ছোট দুই রূমের একটা অ্যাপার্টমেন্ট। বেডরূমের দরজা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। নীল আলো জ্বলছে ভেতরে। নাকে সেন্টের সুবাস পেল মরভিন।

'তুমি একা?'

'না, আমি আর আমার বেড়াল আছি। তা কি মনে করে?' হাই তুলল টাউনসেণ্ড।

'চারপেয়ে বেড়াল, না দু'পেয়ে?'

হেসে ফেলল ইনফর্মার। 'অল রাইট, দু'পেয়ে। এবার তাড়াতাড়ি বলে ফেল কি চাই। ওটাকে গরম করতে প্রচুর সময় লেগেছে। দেরি হলে ঠাণ্ডা মেরে যাবে আবার।'

'চারপেয়ে হলে অসুবিধে ছিল না,' বলল ক্রিস্টেনসেন। 'কিন্তু দু'পেয়ে যখন, এখানে বসে কথা বলা যাবে না। ব্যাপার গুরুতর। চলো, নিচে যাই। গাড়িতে বসে কথা হবে।'

'কিন্তু...।' ইতস্তত ভঙ্গিতে বেডরূমের দিকে তাকাল টাউনসেণ্ড।

শুনল না মরভিন। ততক্ষণে বেরিয়ে পড়েছে সে। 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে নিচে আসছ তুমি।'

তিন মিনিট পর গাড়িতে পাশাপাশি বসল ওরা দু'জন। গাড়ি ছাড়ল ডিটেকটিভ। সিকি মাইলখানেক নীরবে ড্রাইভ করল সে। তারপর মুখ খুলল।

'ব্ল্যাক মামবা,' নাম দুটো শুনেই মন্তব্য করল টাউনসেণ্ড। 'দুটোই। কিন্তু তথ্যের বিনিময়ে কত পাচ্ছি আমি?'

'বিশ ডলার।'

দরজার হাতল ধরল টাউনসেণ্ড। 'গাড়ি থামাও। হেঁটেই ফিরতে পারব আমি। ব্যায়াম হবে খানিকটা।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। তিরিশ। আর নেই আমার কাছে।'

'নাহ্! দিলে মেজাজটা খারাপ করে। ওদিকেও লস্, এদিকেও লস্।'

পাত্তা দিল না মরভিন। টাকাটা গুঁজে দিল টাউনসেণ্ডের হাতে। নোটগুলো ভাল করে দেখে নিয়ে পায়জামার পকেটে পুরল সে। 'সাক্ষাৎ শয়তানের চ্যালা

ওরা। প্রফেশনাল কিলার। জ্যাক ডজ একসময় বেশ্যার দালাল ছিল। তবে ওদের মধ্যে আলেক্স ক্যাগার বেশি বিপজ্জনক। বেলভিউ অ্যাভিনিউর এক অ্যাপার্টমেন্টে থাকে ক্যাগার, ওয়ান নাইন সিক্স, টপ্ ফ্লোর। ডজ থাকে থ্রী টু ম্যাকক্লিফ রোড। সেভেনথ্ ফ্লোর।'

'এবং?'

'শুনি খুব পয়সাওয়ালা একজনের হয়ে কাজ করছে ওরা এ মুহূর্তে। সত্যি কি না জানি না। তবে তথ্যটা সঠিক অ্যাঙ্গেল থেকেই এসেছে।'

'সে কে?'

'জেরি লাটিমার।'

'জেরি লাটিমার? এর ব্যাপারে কিছু?'

মাথা দোলাল টাউনসেণ্ড। 'না। নামটাই কেবল শুনেছি।'

'আর কিছুই না?' সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল ক্রিস্টেনসেন।

'না। নট আ থিং।'

মুখ বাঁকাল সে। 'পয়সা উশুল হলো না।'

'বরং উল্টো। আমি যা দিলাম, তার দাম পেলাম না। অপেক্ষা করো, লেগে থাকো ওদের পিছনে। ফল ফলবে। নাও, এবার গাড়ি ঘোরাও দয়া করে। ওদিকে সব ফ্রিজ হয়ে গেল বোধহয়।'

ব্রেক কষল ক্রিস্টেনসেন। গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরতি পথ ধরল। 'জেরি লোকটা কোথায় থাকে তাও জানো না?'

'হ্যাঁ, তা জানি। হোটেল বেলিভেডারে থাকে।'

'বেলিভেডার?'

'হ্যাঁ।'

টাউনসেণ্ডের অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের সামনে গাড়ি থামাল ডিটেকটিভ। চিন্তিত। নামতে নামতে বলল লোকটা, 'এক কাজ করো। হোটেল ডিকের সঙ্গে কথা বলো গিয়ে। সে নিশ্চই জেরি সম্পর্কে জানাতে পারবে।'

'আমিও তাই ভাবছি। ধন্যবাদ,' হাসল মরভিন। 'জলদি যাও। বেশি রাগালে খামচি খেতে হবে বেড়ালের।'

'খামচি খেতে ভালবাসি আমি,' হাসল টাউনসেণ্ডও।

# তিন

রাত এগারোটা। শহর ছাড়িয়ে উপ-শহরে এসে পড়ল জেরি লাটিমারের ক্যাডিলাক ফ্লিটউড। মন মেজাজ খুব খারাপ তার। সন্ধের দিকে যে অপ্রত্যাশিত ঝামেলা দেখা দিয়েছিল, নিতান্তই ভাগ্যবলে তা সামাল দেয়া গেছে। সময়মত যদি স্যুইটে না থাকত সে, কি যে হত। যদিও এখনও ভেবে পাচ্ছে না জেরি,

মাসুদ রানা কি করে সেলফ স্টোরের ঘটনাটা জানতে পেরেছে।

দেখা যাচ্ছে, পুরো ব্যাপারটা একটু একটু করে ভাগ্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। কিন্তু কতবার ভাগ্যের সহযোগিতা পাবে সে? তাছাড়া ভাগ্যই যদি সবকিছুর নিয়ন্তা হয়ে বসে, তাহলে এত পরিকল্পনা, এত প্রস্তুতি নিয়ে মাঠে নেমে লাভ কি হলো? কাজে নামার আগে প্রচুর হত্যাকাণ্ড ঘটাতে হয়েছে জেরিকে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কারণে। এখন আবার মাসুদ রানার অগ্রগতি ঠেকাতে গিয়ে নামতে হয়েছে সেই একই কাজে।

পুরো সেট্-আপটা যে এমন ভজকট হয়ে যাবে, আগে কল্পনাও করেনি জেরি লাটিমার। করলে আরও আটঘাট বেঁধেই নামত। এখন সে পথও নেই। সিদ্ধান্ত নিল সে, কাল-পরশুর মধ্যে বর্তমান ঘাঁটি ছেড়ে সরে পড়বে প্রফেসরকে নিয়ে। এখানে তাকে রেখে মোটেই স্বস্তি পাচ্ছে না। গুরুতর বিপদ ঘটে যেতে পারে যে-কোন মুহূর্তে। আম-ছালা সব যাবে তাহলে।

দুর্ভাবনার অন্ত নেই জেরি লাটিমারের। কার্ল হফারের নির্দেশ ছিল প্রয়োজন দেখা দিলে তার প্ল্যানিঙের সঙ্গে নিজের আইডিয়া যোগ করে কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে জেরিকে। কিন্তু মাথায় কোন আইডিয়াই আসছে না। বুদ্ধিশুদ্ধি যেটুকুও বা ছিল, মাসুদ রানার সন্ধেবেলার তৎপরতা দেখে লোপ পেয়েছে তা। যে কারণে কার্ল হফারকে এখানকার সব ঘটনা জানাতে বাধ্য হয়েছে সে কোডেড টেলিগ্রামের মাধ্যমে। দেখা যাক, কি জবাব আসে।

নিজের বুদ্ধি খাটাবার ঝুঁকি নিতে মন সায় দেয়নি জেরির। ওসব করতে গিয়ে যদি আরও বড় ঝামেলা বেধে যায়, যদি ব্যর্থ হয় অপারেশন, তাহলে হফার··· পরিণতি কল্পনা করে শিউরে উঠল জেরি। সে ক্ষেত্রে কি হবে, ভাবতে পর্যন্ত রাজি নয় সে। তার চেয়ে আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখবে। যদি দেখে বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে গেছে মাসুদ রানার অগ্রগতি, তাহলে ওকেই দেবে শেষ করে। তাতে নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হবে না কার্ল হফার, বরং পুরানো শত্রু নিকেশ হওয়ায় খুশিই হবে।

এ মুহূর্তে রানা কি করছে, অনুমান করার চেষ্টা করল জেরি। ঘুমিয়ে পড়েছে হয়তো। নাকি নতুন কোন সূত্র পেয়ে যাচাই করতে বেরিয়েছে? লোকটা যদি হোটেলে থাকে, তাহলে চিন্তা নেই। নিজের খুব বিশ্বস্ত একজনকে স্যুইটে রেখে এসেছে সে। হেডফোন পরে বসে আছে লোকটা। তেমন কিছু যদি ঘটে, সময়মত খবর পাবে জেরি। আর যদি বাইরে থেকে থাকে মাসুদ রানা·· হঠাৎ করে নিজেকে খুব ক্লান্ত মনে হলো জেরির। এ নিয়ে আর ভাবতে মন চাইছে না। গত ক'দিন ঠিকমত ঘুম হচ্ছে না। একটু যদি নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারত সে।

এর মধ্যেও হাসি পেল তার। ঘুম! প্রফেসরকে আসল জায়গায় নিয়ে তুলতে পারলে তবেই ঘুমের সুযোগ হবে। তার আগে নয়। মরুভূমিতে এসে পড়ল ক্যাডিলাক। হেডলাইট নিভিয়ে পার্কিং লাইটের আলোয় চলতে লাগল জেরি লাটিমার। এত রাতে মরুভূমিতে তার বিচরণ কেউ টের পাক, চায় না সে।

ঠিক বারোটায় যথাস্থানে পৌঁছল জেরি। জায়গাটা পাহাড় ঘেরা। আপাতত

কয়েক দিনের জন্য এখানকার এক পাহাড়ের গুহায় এনে রাখা হয়েছে প্রফেসর মারগুব হোসেনকে। গুহাটা ইংরেজি 'এল'-এর মত। বড় বড় কয়েকটা চেম্বার আছে তার মধ্যে—গুহার ভেতর গুহা। গত সপ্তাখানেক ধরে জায়গাটা গুছিয়েছে জেরি। শক্তিশালী জেনারেটরের সাহায্যে আলো জ্বালার ব্যবস্থা করা হয়েছে ভেতরে। আলো যাতে বাইরে না যায়, সে জন্যে মূল গুহামুখে পুরু কম্বলের পর্দা ঝোলানো হয়েছে।

বড় এক ক্যালোর গ্যাসের চুলোয় রান্নাবান্নার আয়োজন করা হয়েছে। চেয়ার-টেবিল, ক্যাম্প খাট সবই আছে। গুহা এবং তার অধিবাসীদের পাহারায় আছে ক্যাগারের ভাড়া করা জনা দশেক সশস্ত্র গার্ড। সব ক'টা দাগী। আগেও এদের দিয়ে অনেক কাজ করিয়েছে জেরি। যে কোন কাজ দিয়ে নির্ভর করা যায় এদের ওপর।

গাড়ির শব্দে ক্যাগার এবং গার্ডদের নেতা জেমস ওয়েন বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। মানুষটা এত বিশাল আর কুৎসিত দেখতে যে জেরি পর্যন্ত একা থাকলে অস্বস্তি বোধ করে তার সামনে। ডান হাতে খেলনার মত একটা মেশিন পিস্তল ধরে আছে জেমস ওয়েন। মুখে বিনয়ের হাসি।

'খবর কি?' ক্যাগারের উদ্দেশে মাথা নাচাল জেরি লাটিমার।

'ভাল।'

'প্রফেসর, মেয়েটা, দু'জনেই সুস্থ তো?'

'একদম সুস্থ।'

'গুড।' পাশাপাশি ভেতর-গুহার দিকে এগোল ওরা। 'ডাক্তার কোথায়?'

'আসুন আমার সঙ্গে।'

পর পর তিনটে চেম্বার পেরিয়ে এল ওরা। মাটিতে বসে তাস খেলছে চার গার্ড। মুখ তুলে ওদের দেখল লোকগুলো, তারপর আবার মন দিল হাতের কাজে। চতুর্থ গুহায় পাওয়া গেল পল ম্যাথিয়াসকে। চেহারায় পরিষ্কার অসন্তোষ।

'পত্রিকায় ক্লিনিক বন্ধ রাখার বিজ্ঞপ্তি ছাপাবার কি দরকার পড়েছিল, ডক্টর?' প্রশ্ন করল জেরি।

একটু ভাবল লোকটা। 'বলা নেই কওয়া তিন সপ্তার জন্যে বন্ধ রাখতে হবে, জনগণকে তা জানাব না? তাদের সুবিধা-অসুবিধা দেখতে হবে না?'

'ওহো, তাই তো!' হাসল জেরি। 'আপনি যে আবার মানবদরদী, মনে ছিল না।'

ভেতরে ভেতরে রেগে উঠল ম্যাথিয়াস লোকটার গা জ্বালানো হাসি দেখে। 'কাজের প্রস্তাব দেয়ার সময় এমন কথা তো বলেননি যে বনমানুষের মত পাহাড়ের গুহায় থাকতে হবে আমাকে!'

'শান্ত হোন।' জেরির চোখ ইশারায় বেরিয়ে গেল ক্যাগার। 'বসুন বসুন!' চারদিক দেখে নিয়ে বলল, 'এত খারাপের কি দেখলেন এখানে যে নিজেকে বনমানুষ ভাবতে শুরু করেছেন আপনি, ডক্টর? অন্তত জার্মান জেলের থেকে নিশ্চই অনেক ভাল এ জায়গা, নাকি? সে যাক, এবার বলুন রুগীকে কেমন মনে হলো

আপনার।'

বসল পল ম্যাথিয়াস ওরফে জুরগেন গুন্থার। রাগ সামলাতে কষ্ট হচ্ছে। কিছুক্ষণ গুম মেরে বসে থাকল লোকটা। তারপর চোখ তুলেই জেরিকে গম্ভীর মুখে চেয়ে থাকতে দেখে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করল তাড়াতাড়ি।

'সাক্ষাৎ হয়েছে রুগীর সঙ্গে?' জানতে চাইল জেরি।

'হয়েছে।'

'কেমন দেখলেন?'

'ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। এখানে আসার আগে প্রফেসরের মেডিকেল হিস্ট্রি পড়েছি আমি। ডক্টর অ্যাডাম হিল এ দেশের সেরা মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞদের একজন। তাঁর মতে...'

'আমি অ্যাডাম হিলের মতামত শুনতে চাইনি, ডক্টর। আপনার মতামত জানতে চেয়েছি। অ্যাডাম হিল কি বলেছেন আমি জানি। আমি পড়েছি সেটা।'

অস্বস্তির সঙ্গে নড়েচড়ে বসল ডাক্তার। 'এর ব্যাপারটা একটা কঠিন ধাঁধার মত। এতদিন চিকিৎসা হলো হ্যারিসন অ্যাসাইলামে, অথচ কোন ফল হলো না। খুবই চিন্তার বিষয়। কি যে মন্তব্য করব, আমি নিজেই বুঝতে পারছি না।'

'আপনার সেই স্পেশাল ব্রেন অপারেশন এর ওপর চালালে কেমন হয়?'

'পাগল নাকি! যদি সফল না হয় অপারেশন? যদি আরও বড় কোন ক্ষতি হয়ে যায় লোকটার ব্রেনের?'

মৃদু হাসিটা গায়েব হয়ে গেল জেরি লাটিমারের। এই উত্তর সে আশা করেনি ডাক্তারের মুখ থেকে। কাজটা সম্পন্ন না হওয়া মানে তার ব্যর্থ হওয়া। অথচ ব্যর্থ হওয়া চলবে না লাটিমারের। ব্যর্থতার কোন ক্ষমা নেই কার্ল হফারের কাছে। মস্কোর ত্রিশ মিলিয়ন ডলার যদি সে না পায়, সর্বনাশ ঘটে যাবে জেরির। কি ঘটবে তার ভাগ্যে, অনুমান করা কঠিন কিছু নয়।

ও নিজে যেমন ফোন তুলে ক্যাগার বা ডজকে নির্দেশ দিয়ে থাকে একে তাকে হত্যা করার, হফারও তাই করবে। ওদেরই কাউকে পাঠাবে তাকে হত্যা করতে। চিন্তাটা অসুস্থ করে তুলল জেরিকে, কপালে চিকন ঘাম দেখা দিল তার। 'কেন, সফল হবে না কেন অপারেশন?'

'কারণ আমার সন্দেহ, প্রফেসরের কোনরকম ম্যানিক ডিপ্রেশন নেই। বেশ কয়েক ধরনের টেস্ট করে দেখেছি আমি। সব নেগেটিভ। পজিটিভ রেজাল্ট পাইনি একবারও। কোন টেস্টেই না।'

'লোকটা কি তাহলে অভিনয় করছে? সত্যি সত্যি মানসিক রুগী নয়?'

'না, অভিনয় করছে না।'

'তাহলে?'

'ব্যাপারটাকে একটা ঘড়ির সঙ্গে তুলনা করা চলে। মনে করুন প্রফেসরের মাথাটা একটা ঘড়ি। হেয়ারস্প্রিঙ আর ব্যালান্স, এই দুটো ঠিকমত কাজ করলে তবেই ঘড়ি সঠিক সময় দেয়। কোন কোন মানুষের ব্রেন ঘড়ি সামান্য এদিক ওদিক থাকে। কারও জন্মগতভাবে, কারও বা অন্য কোনভাবে ঘটে যায়

ব্যাপারটা। ব্যালান্স আর হেয়ারস্প্রিঙের কাজ অসমন্বিত হয়ে পড়ে। এমনিতে টের পাওয়া মুশকিল, তবে কাউকে যখন কোন বিষয়ে ত্বরিত সিদ্ধান্ত নিতে হয় বা নিতে বলা হয়, তখনই বোঝা যায় কেমন কাজ করছে তার ব্রেন ঘড়ি।

'কেউ হয়তো ব্যাপারটা বুঝে ফেলে ঝটপট, সেই মত সিদ্ধান্ত নেয়। আবার কেউ হয়তো সামান্য হলেও দেরিতে বোঝে। সিদ্ধান্ত নিতে তার দেরি হয়ে যায়। এই রকম। প্রফেসরের ঘড়িই কেবল ম্যালঅ্যাডজাস্টেড নয়, প্রেমিকা প্রত্যাখ্যান করার পর তাঁর হেয়ারস্প্রিঙও ঢিলে হয়ে গেছে। অনেক সময় ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেলে আমরা ঝাঁকি মারি, টোকা দিই। প্রায় সময়ই কাজ দেয় এগুলো, চলতে আরম্ভ করে ঘড়ি। এঁরও তাই প্রয়োজন। তবে ওই টোকা বা ঝাঁকি নয়, ওটা হতে হবে মেন্টাল ট্যাপ। কোন ডাক্তারের সাধ্য নয় একাজ করার। এবং এ ক্ষেত্রে অমুক দিনের মধ্যে কাজ হবে, এমন কোন গ্যারান্টি দেয়ারও প্রশ্নই আসে না।

'দেখা গেল বছরের পর বছর কেটে যাচ্ছে, অথচ কাজ হয় না। আবার হয়তো এক দিন, এক সপ্তাহ, কি এক মাসের মধ্যেই হয়ে গেল কাজ। তবে খেয়াল রাখতে হবে, মানুষের ব্রেন খুবই সেনসিটিভ, ডেলিকেট। ট্যাপ ঠিকমত না হলে মারাত্মক ফল ফলতে পারে। সে ক্ষেত্রে সারাজীবনেও আর ভাল হবে না রোগী।'

লম্বা করে দম টানল জেরি। 'বছরের পর বছরও লেগে যেতে পারে?'

'হ্যাঁ। আবার এই মুহূর্তেও ঘটে যেতে পারে ব্যাপারটা। ইট ডিপেণ্ডস্।'

'প্রফেসরের এরকম ঘটার কারণ কি বলে মনে করেন আপনি?'

'অনেক কিছুই হতে পারে। অতি খাটুনি, প্রেমিকার প্রত্যাখ্যান বা তাঁকে সঙ্গীহীন করে রাখা, এর যে কোন একটা বা তিনটেই হয়তো দায়ী এর জন্যে। নিজের পরিচিত জগৎ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল তাঁকে। পরিচিত লোকজনের ছায়া পর্যন্ত দেখতে দেয়া হয়নি। এসবও হতে পারে। মোটকথা মেডিকেল সায়েন্স এক্ষেত্রে অসহায়। পুরোপুরি। প্রফেসরের ঘনিষ্ঠদের কাউকে যদি পাওয়া যেত, তাহলে হয়তো একটা চেষ্টা করে দেখতাম।'

কার্ল হফার কত চতুর মানুষ, হঠাৎ করেই তা উপলব্ধি করতে পারল জেরি। চকিতে বুঝে ফেলল, কেন শিলা ব্রাউনকে ধরে আনার নির্দেশ দিয়েছিল সে। কেন বলেছিল, এই অপারেশনে শিলা ব্রাউন ভাইটালি ইম্পর্ট্যান্ট, কি কাজে লাগবে সে। ডাক্তার এইমাত্র যা বলল, তার সেই চাহিদা পূরণের জন্যেই মজুদ রাখা হয়েছে শিলাকে। অথচ জেরি এতদিন হাজার ভেবেও বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা। আশ্চর্য!

'প্রফেসরের এক সময়কার ল্যাব অ্যাসিসটেন্ট, একটি মেয়ে আছে আমাদের এখানে। ওর সঙ্গে খুব বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল প্রফেসরের। ওকে দিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে দেখা সম্ভব?'

চোখ ছোট ছোট হয়ে এল গুন্থারের। 'কোথায় আছে! এখানে?'

'হ্যাঁ।'

'নিশ্চিত বলতে পারি না। তবে সম্ভব। কাজ হতেও পারে।'

জেরি লাটিমারের সন্দেহ হলো ডাক্তার বোধহয় বর্তমান পরিস্থিতি অনুধাবন

করতে পারছে না। অথবা পারার গরজ অনুভব করছে না। অতএব তার গরজ বাড়াবার সিদ্ধান্ত নিল সে। 'যদি এ কাজে আমি ব্যর্থ হই,' ঠাণ্ডা গলায় বলল জেরি। 'তাহলে আপনার নিরাপত্তার কোন গ্যারান্টি আমি দিতে পারব না, ব্যাপারটা আপনাকে খুব ভাল করে বুঝতে হবে আগে, ডক্টর। আসলে আপনার ব্যর্থ হওয়ার কোন উপায় নেই। যাক্‌গে, মেয়েটি আমাদের সঙ্গেই আছে। এখন, কি ভাবে তাকে কাজে লাগালে দ্রুত ফল পাওয়া যাবে তা আপনিই ঠিক করুন।'

মুখ শুকিয়ে গেল ডাক্তারের। 'বুঝলাম না।'

'দেখুন, এ নিয়ে আর কথা বাড়াতে চাই না আমি। সোজা কথা, লোকটাকে সুস্থ-স্বাভাবিক করে তুলতে হবে আপনাকে। নইলে বাঁচবেন না আপনি,' উঠে দাঁড়াল জেরি।

'আমি···আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব,' কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে ডাক্তারের চেহারা।

'তার চেয়েও বেশি করুন। আগে মেয়েটির সঙ্গে কথা বলুন। মনে হয় না ও অসহযোগিতা করবে।'

ভয়ে কুঁকড়ে আছে শিলা ব্রাউন।

দুপুরে সোনালী চুলের বাচ্চা-বাচ্চা চেহারার এক যুবক নিঃশব্দে ঢুকে পড়েছিল তার গুহায়। দেখামাত্রই তাকে চিনেছে শিলা। এই যুবকই ধাক্কা খাওয়ার ছলে তাকে ফাঁসিয়ে দিয়েছিল সেলফ সার্ভিস স্টোরে। ক্যাম্প খাটে চিত হয়ে শুয়ে ছিল শিলা। একেবারে ওর মাথার কাছে এসে দাঁড়ায় সে। শিলা আঁতকে উঠে বসতে এমন এক হাসি দিল লোকটা, কাঁপুনি উঠে গিয়েছিল তার সারা অঙ্গে। কি যেন একটা ছিল যুবকের হাসিতে। তাই দেখে হাত-পা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যাওয়ার জোগাড়।

এরপর তার পাশে বসেছে যুবক, ভাল মানুষের মত নরম গলায় অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথা বলেছে। মারফি ম্যাডেলিন যা আভাস দিয়ে গিয়েছিল; এদের সঙ্গে সহযোগিতা না করলে কি হবে, ঠিক সেই কথাগুলোই তাকে বুঝিয়েছে যুবক। তার কথা বলার ভঙ্গি যদি দূর থেকে কেউ লক্ষ করত, ভাবত বুঝি প্রেম নিবেদন করছে সে শিলাকে। সবশেষে আসল প্রসঙ্গে আসে যুবক।

শুনে চমকে উঠেছিল মারফি। কি করবে ভেবে না পেয়ে দু'হাতে নিজের কান চেপে ধরেছিল। শুনতে চায় না। ভুল হয়ে গেছে কাজটা। মুহূর্তে রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে যুবক। ঝট্‌কা মেরে মারফিকে বিছানায় চিত করে শুইয়ে ফেলে, তারপর তার ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করে ওর কানে কানে। যুবকের দেহের ভার, উত্তাপ আর তাকে উদ্দেশ করে বলা নোংরা অশ্লীল কথাবার্তা, সবকিছু মিলিয়ে আরেকটু হলে শিলাকেই উন্মাদ করে দিত।

যুবক বেরিয়ে যাওয়ার পরপরই এসেছিল সেই মেয়েটি, ওকে সান্ত্বনা দিতে। বার বার একই কথা বলছিল সে, 'ওদের কথায় রাজি হওয়া ছাড়া উপায় নেই তোমার। রাজি হয়ে যাও। তাতে তোমারই মঙ্গল।'

সেই থেকে ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে শিলা ব্রাউন। কখন না জানি আবার কে এসে হাজির হয়। নতুন মাত্রার মানসিক অত্যাচার আরম্ভ করে ওর ওপর। দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে সে। জিম ফ্রিম্যানের কথা ভেবে কাঁদছে। কোথায় আছে মানুষটা? সে কি জানে শিলা কতবড় বিপদে আছে?

'আমি জানি সময়টা আপনার ভাল কাটছে না, মিস ব্রাউন।'

কানের কাছে মার্জিত কণ্ঠের কথাগুলো শুনে চমকে উঠল শিলা। হাত নামিয়ে ঘুরে তাকাল। চেহারাও তেমনি মার্জিত লোকটির। সিনেমার নায়কের মত দেখতে। দীর্ঘদেহী, স্লিম। চোখে সমবেদনা নিয়ে ওকে দেখছে লোকটা। অবাক হয়ে চেয়ে থাকল শিলা। কে এই লোক?

একটা চেয়ার নিয়ে এসে ক্যাম্প খাটের দু'হাত দূরে বসল জেরি লাটিমার। 'যা ঘটে গেছে, সে জন্যে আমি আন্তরিক দুঃখিত, মিস ব্রাউন,' নরম কণ্ঠে বলল সে। 'তবে আপনাকে এই নিশ্চয়তা আমি দিতে পারি, আপনার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আপনি এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

লোকটার সংক্রামক হাসি আর ভদ্র ব্যবহার জাদুর মত কাজ করল। মুহূর্তে বিপদের কথা ভুলে গেল শিলা ব্রাউন। 'আপনি...আপনি কে?'

'আমাকে আপনি আপনার বন্ধু বলেই জানবেন,' পায়ের ওপর পা তুলে দিল জেরি। 'সে যাক, যা ঘটে গেছে, তার জন্যে আমি আবারও আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করছি। তবে আমি আশা করব, কেন আপনাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে সেটাও উপলব্ধি করার চেষ্টা আপনি করবেন। কারণটা আর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। আসলে সে জন্যে আমি আসিওনি। আমি এসেছি অন্য কিছু বলতে। আপনি বোধহয়, বোধহয় কেন, নিশ্চই জানেন প্রফেসর মারগুব হোসেন অদ্ভুত এক মানসিক রোগে ভুগছেন। তাঁকে সুস্থ করে তোলা খুবই প্রয়োজন।

'আপনি জানেন, কিছুদিন আগে প্রফেসর এক মেটাল আবিষ্কার করেন। কিন্তু ওটার ফর্মুলা,' থেমে মিষ্টি করে হাসল জেরি লাটিমার। 'এই দেখো, বলব না বলব না করেও সেই পুরানো কাহিনীই বলতে শুরু করেছি আমি। ডাক্তারের ধারণা, আপনি যদি একটু চেষ্টা করেন, প্রফেসর সুস্থ হয়ে উঠবেন। আমার বক্তব্য বুঝতে পেরেছেন আপনি, মিস ব্রাউন?'

মাথা দোলাল শিলা।

'গুড। আপনি অতীতে প্রফেসরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। অনেকদিন তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন। ডাক্তার বলেছেন, আপনাকে দেখলে, আপনার সঙ্গে কথা বললে প্রফেসরের সেরে ওঠার সম্ভাবনা আছে। কাজটা খুব কঠিন কিছু হবে বলে আমি মনে করি না। তবে প্রথমে আমাকে জানতে হবে, প্রফেসর সুস্থ হয়ে উঠুন আপনি তা চান কি না।'

মনের ভয় একটু একটু করে কেটে যাচ্ছে শিলা ব্রাউনের। এক-আধটু মাথাও ঘামাতে পারছে সে এখন। এই লোকের আসল উদ্দেশ্য কি? কে এই লোক? ওই ফর্মুলা ডিকোড করাতে চাইছে সে কার জন্যে!

'নিশ্চই চাই,' বলল শিলা।

'ভেরি গুড।'

'কিন্তু তার মানে এই নয় যে সুস্থ হয়ে উঠলেই প্রফেসর আপনাকে ডিকোড করে দেবেন তাঁর ফর্মুলা। আমি তা মনে করি না।'

'মাই ডিয়ার লেডি, আপনি কি মনে করেন না করেন তা আমি জানতে চাইনি। আমি জানতে চাই তাঁকে সুস্থ করে তোলার ব্যাপারে আপনি সাহায্য করতে রাজি আছেন কি না।'

'আছি। কিন্তু তাতে কাজ হবে কি না, সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার।'

'যেমন?'

'ওঁকে সুস্থ করে তুলতে পারব কি না জানি না।'

'আমার মনে হয় পারবেন। ডাক্তারও তাই বলেছেন। ভদ্রলোক যেমন-তেমন ডাক্তার নন। এদেশের সেরা ব্রেন স্পেশালিস্টদের একজন।'

'আমাকে কি করতে হবে তাহলে?'

'প্রফেসরের সঙ্গে দেখা করে কথাবার্তা বলতে হবে। আগে যেমন বলতেন, যেভাবে বলতেন, ঠিক সেভাবে। তবে একটা কথা, কোন চালাকি করার চেষ্টা করবেন না। প্রফেসরের রুমে মাইক্রোফোন প্ল্যান্ট করা আছে। আপনাদের কথাবার্তা সব শুনতে পাব আমি। এটা করা হয়েছে আপনাকে যা যা বলতে বলা হবে, সেসব ঠিক ঠিক বলেন কি না, শোনার জন্যে। ডাক্তার আপনার সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করবেন বিস্তারিত। একটা কথা মনে রাখবেন, এ কাজে ব্যর্থ হলে চলবে না আপনাকে। সফল হতেই হবে। নইলে,' কাঁধ ঝাঁকাল জেরি লাটিমার। তার চেহারা থেকে ভদ্রতার মুখোশ খসে পড়তে দেখল শিলা মুহূর্তের জন্যে। '...জ্যাক ডজের সঙ্গে সাক্ষাৎ তো হয়েইছে আপনার। ও কি জিনিস, নিশ্চয়ই অনুমান করতে পেরেছেন আপনি। ইন কেস যদি না পেরে থাকেন, তাহলে বলছি, শুনুন। দেখতে মানুষেব মত হলেও ওতে আর পশুতে কোন তফাৎ আছে বলে আমি মনে করি না। যদি সাহায্য না করেন আমাদের, তাহলে ওর হাতে আপনাকে তুলে দেয়া ছাড়া আমার কোন বিকল্প থাকবে না, মিস ব্রাউন। ভেবে দেখুন, কোনটা আপনি চান। এক ঘণ্টা সময় দেয়া হলো আপনাকে চিন্তা করার জন্যে।'

বেরিয়ে গেল জেরি গুহা ছেড়ে। সময় দিতে যাওয়াটা মারাত্মক একটা ভুল হলো তার। সাইকোলজিক্যাল। সে ভেবেছে, ডজের হাতে তুলে দেয়ার হুমকি দিয়ে শিলার মনোবল গুঁড়িয়ে দেবে। রাজি না হয়ে উপায় থাকবে না মেয়েটির। ভুলটা এখানেই হয়েছে তার। সময়টা শিলাকে চিন্তা করার সুযোগ করে দিয়েছে। পথ বের করে ফেলেছে কিভাবে ফাঁকি দেবে সে এদের।

তবে এ-ও ঠিক করেছে, যদি সত্যিই তার সাহায্যে প্রফেসরের সুস্থ হয়ে ওঠার কোন চান্স থেকে থাকে, তাহলে আগে তাই করবে শিলা। সে ক্ষেত্রে প্রফেসর নিজেই ঠিক করতে পারবেন, কি করবেন তিনি। ডিকোডেড ফর্মুলা

এদের দেবেন কি না। যদিও শিলা ভালই জানে, কোন দিন দেবেন না তিনি। প্রশ্নই আসে না। দেয়ার যদি ইচ্ছেই থাকত, তাহলে এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা না সয়ে আরও আগেই মার্কিন সরকারের হাতে তা তুলে দিতেন তিনি। তাহলে জীবনটা তাঁর আজ নিঃসন্দেহে অন্যরকম হত।

ঠিক এক ঘণ্টা পর ভেতরে ঢুকল মারফি। হাতে একটা সাদা ওভারল। 'হাই, হানি!'

'হাই!' হাসল শিলা।

তাজ্জব হয়ে তাকে দেখল কিছুক্ষণ মেয়েটা। তারপর হাসল। 'আমি ধরে নিতে পারি তুমি রাজি?'

'হ্যা, রাজি।'

'ওহ্, হানি! আ'য়্যাম সো গ্ল্যাড।' ওভারলটা এগিয়ে দিল মারফি। 'এটা পরে ফেলো তাহলে।'

পরল শিলা ব্রাউন। ঘুরে ঘুরে তাকে দেখল মারফি। 'তুমি কল্পনাও করতে পারবে না কি মিষ্টি তুমি দেখতে।'

'ধন্যবাদ।'

'ঠিক…ঠিক ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের মত লাগছে তোমাকে।'

এই সময় ভেতরে এসে ঢুকল জুরগেন গুন্থার। লোকটিকে দেখে হাসি থেমে গেল দু'জনেরই। 'আমি চললাম,' বলল মারফি। 'ঘাবড়িও না। ডাক্তার যা বলে, মেনে চললে কোন অসুবিধে হবে না তোমার, হানি।'

মেয়েটি চলে যেতে জেরির চেয়ারটায় বসল ডাক্তার। ইশারায় শিলাকেও বসতে বলল। 'খুব ডেলিকেট একটা এক্সপেরিমেন্টে এখন আপনাকে অংশ নিতে হবে, মিস। এ সময়ে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক থাকতে হবে আপনাকে। যদি ভাগ্য ভাল হয়, আপনাকে দেখামাত্র সুস্থ, স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারেন ভদ্রলোক। অ্যাসাইলাম বাসের কথা মনে না-ও থাকতে পারে তাঁর। হয়তো এ-ও হতে পারে, তিনি যে আদৌ মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছিলেন কোনদিন, তা-ও স্মরণ থাকবে না প্রফেসরের।'

মাথা দোলাল শিলা ব্রাউন।

'আপনি কি ভাবে পরিস্থিতি সামাল দেবেন, তার ওপর নির্ভর করছে এক্সপেরিমেন্টের সফলতা-ব্যর্থতা। দায়িত্বটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যে মুহূর্তে আপনি প্রফেসরের মুখোমুখি হবেন, সেই মুহূর্ত থেকে উপস্থিত বুদ্ধিবলে কাজ করতে হবে আপনাকে, প্রফেসরের রিঅ্যাকশন বুঝে উপযুক্ত আচরণ করতে হবে, সেইমত কথা বলতে হবে। ব্যাপারটা নিয়ে, মানে, কি ভাবে কি করবেন, আগে মনে মনে রিহার্সেল দিয়ে নিন। এক্সপেরিমেন্ট কি ভাবে হতে হবে, আমি কেবল পরামর্শ দেব তার। আপনাকে তা পরিচালনা করতে হবে। কাজেই দায়িত্বটা আপনারই বেশি। ভুল হলে চলবে না। আপনি কি বলছেন, না বলছেন আড়াল থেকে সব শুনতে পাব আমরা। কিন্তু কোন পরামর্শ দিতে পারব না। কারণ আমরা জানি না, অতীতে যখন প্রফেসরের সহকারী ছিলেন আপনি. তখন তাঁর সঙ্গে কেমন আচরণ

করতেন, কিভাবে কথা বলতেন।

'আপনি জানেন তা, অতএব ওটা আপনার ওপরই ছেড়ে দেয়া হলো। এবার শুনুন, প্রাথমিক কুশল জিজ্ঞাসাবাদের পর ঠিক কি বলতে হবে আপনাকে।'

বলতে আরম্ভ করল ডাক্তার। হাত নাচিয়ে, চোখমুখ ঘুরিয়ে অনর্গল বলে যাচ্ছে লোকটা। ধৈর্যের প্রতিমূর্তির মত বসে বসে শুনছে শিলা ব্রাউন। আর হাসছে মনে মনে।

## চার

দেয়াল ঘড়ির আটটার ঘণ্টা শেষ হয়নি তখনও, ঝড়ের বেগে অফিসে ঢুকলেন ফ্রেড উইলিয়ামসন। আঠারো ঘণ্টা হোক, বা ছত্রিশ, টানা কাজের পর ছয় ঘণ্টা ঘুমাতে পারলেই যথেষ্ট। আবার পূর্ণোদ্যমে চালু হয়ে যায় তাঁর দেহযন্ত্র। আজও তাই করেছেন চীফ।

বিছানায় পিঠ ছোঁয়ানোর পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুম, এবং এক ঘুমে সকাল। দুশ্চিন্তা বা স্বপ্ন তাঁর বেডরূমে প্রবেশের সুযোগ পায়নি। তারপর একাই চারজনের নাশতা সাবাড় করে অফিস। সকালে বাসায় কফি পান করেন না তিনি, সময় নষ্ট হয়, তাই অফিসে এসেই তাঁর প্রথম কাজ কফি খাওয়া। ধূমায়িত কফি রেখে গেল ডিউটি সার্জেন্ট। তার পরপরই ভেতরে ঢুকল ডিটেকটিভ ক্রিস্টেনসেন। হাতে ফাইল।

ইঙ্গিতে তাকে চেয়ার দেখালেন উইলিয়ামসন। 'বোসো। রাতটা খুব কঠিন গেছে মনে হয়?'

'তা বলতে পারেন, চীফ।' ফাইলটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিল সে।

'পরে দেখব ফাইল, আগে তোমার মুখ থেকে শুনি।'

জ্যাক ডজ ও আলেক্স ক্যাগার সম্পর্কে টাউনসেণ্ডের কাছে যা যা শুনেছে মরভিন, চীফকে জানাল সে। 'যথেষ্ট ইনফর্মেশন জোগাড় করতে পারিনি, জানি। কিন্তু এদের ব্যাপারে আর কিছু জানে না লোকটা। পরে জেরি লাটিমার সম্পর্কে খোঁজ-খবর করতে হোটেল বেলিভেডারে যাই। ওদের সবচে' দামী পেন্টহাউস স্যুইটে থাকে লোকটা। থাকে মানে, ছিল। কাল রাতে কোথায় যেন গেছে, ফিরে আসবে আবার যে-কোন সময়।

'মজার কথা, স্যুইট সে নিজে ভাড়া নেয়নি। ওটা তার বস্, কার্ল হফারের নামে আছে। তার নামে সারা বছরের জন্যে বাঁধা স্যুইটটা। তারা কেউ থাক, না থাক, স্যুইটের ভাড়া অগ্রিম পরিশোধ করে রাখে কার্ল হফার।'

'জার্মান?'

'হ্যাঁ। আমেরিকায় নেই এখন। সপ্তা দুয়েক আগে কোথায় যেন গেছে, বলতে পারে না ওরা। এরকমই করে লোকটা, হুট্ করে আসে, হুট করে চলে যায়।'

'খুব পয়সাওয়ালা নিশ্চই! লোকটা আসলে কে, করে কি?'

'একটা প্রশ্ন বটে, চীফ। হোটেল ডিককে জিজ্ঞেস করেছিলাম। লোকটা যেভাবে ওদের নাম উচ্চারণ করছিল, তাতে মনে হয়েছে, কার্ল হফার বুঝি ঈশ্বর। আর লাটিমার যীশু। প্রথমজনের ব্যাপারে খুব হুঁশিয়ার হয়ে পা ফেলার পরামর্শ দিয়েছে ও আমাকে। জেরি মানুষটা কেমন, জানতে চাইলাম। উল্টে ব্যাটা আমি বেশি মদ খেয়েছি কি না, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে কিনা, এই সব প্রশ্ন করতে শুরু করল।'

'তারপর?'

'জানতে চাইল কেন জেরি সম্পর্কে প্রশ্ন করছি। বললাম, একটা হিট অ্যাণ্ড রান অ্যাক্সিডেন্টের তদন্ত করছি আমি। জানতে পেরেছি জেরি লাটিমারের শেভি ঘটিয়েছে অ্যাক্সিডেন্টটা। সে বলল, জেরির গাড়ি ক্যাডিলাক, শেভ্রোলে নয়।'

'লোকটার চেহারার বর্ণনা?'

'পেয়েছি। ওতে আছে,' ফাইলটা দেখাল ক্রিস্টেনসেন।

'কার্ল হফারের ব্যাপারে কিছুই জানতে পারোনি?'

'নাহ্। তবে লোকাল সিআইএ এজেন্ট জ্যাক টার্নারকে জিজ্ঞেস করেছি লোকটার ব্যাপারে।'

ভারি সন্তুষ্ট হলেন পুলিস চীফ। সঠিক তথ্যের জন্যে কোথায় কোথায় যেতে হবে, খুব ভালই জানে মরভিন। 'কি জানা গেল?'

'ন'টার মধ্যে আসবে সে আপনার সঙ্গে দেখা করতে। নিজেই জানাবে বলেছে।'

'গুড।' ফাইল খুললেন ফ্রেড উইলিয়ামসন। দ্রুত পড়ে যেতে লাগলেন। মরভিনের মত একই অবস্থা হলো তাঁরও। রিপোর্ট পড়া যখন শেষ হলো, কপালে উঠে গেছে চোখ। 'এ দেখছি ক্লীন কিডন্যাপিং!'

'আসলেই তাই।'

চোখ বুজে চিন্তায় ডুবে গেলেন ফ্রেড উইলিয়ামসন। কারা করল কাজটা? রাশিয়া, নাকি চিন? আগে ততটা না জানলেও এখন তিনি জানেন প্রফেসরের মূল্য। সত্যি যদি ওরা…তবে এটা ঠিক, ফ্লোরিডা থেকে তাকে বের করে নিয়ে যেতে পারবে না ওরা। আনুষ্ঠানিক স্টেট অ্যালার্ম ঘোষণা করা না হলেও পুলিস, এফবিআই, সিআইএ সতর্ক রয়েছে। কিছুতেই বেরুতে পারবে না ওরা।

নয়টা দশে চীফের অফিসে ঢুকল জ্যাক টার্নার। মানুষটা ছোটখাটো। চেহারা দেখে বেশ ক্লান্ত মনে হচ্ছে।

'কোন খবর নেই এখনও?' প্রশ্ন করলেন ফ্রেড উইলিয়ামসন।

ঠোঁট উল্টে মাথা দোলাল টার্নার। 'নাহ্! আগে কফি খাওয়াও। বুক শুকিয়ে গেছে।'

কফি খেতে খেতে খানিক এটা-ওটা নিয়ে কথা হলো দু'জনে। তারপর আসল কথা পাড়ল লোকটা। 'কাল মরভিনের অনুরোধে ওয়াশিংটনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম কার্ল হফারের ব্যাপারে জানতে।'

'কি জানলে?'

'জানলাম আলেক্স ক্যাগার আর জ্যাক ডজ জেরি লাটিমারের সঙ্গে জড়িত। আর জেরি লাটিমার জড়িত কার্ল হফারের সঙ্গে।'

'তাই?'

'হ্যাঁ। তিল পরিমাণ সন্দেহ নেই।'

'আর কি জেনেছ, বলো।'

'তুমি সঠিক পথেই পা দিয়েছ, ফ্রেড,' মাথা দোলাল জ্যাক টার্নার। 'আমি বাজি ধরে বলতে পারি, কার্ল ব্যাটাই অপহরণ করিয়েছে প্রফেসর মারগুব হোসেনকে। আমেরিকায় অবশ্য নেই সে, শুনেছি প্রাগে রয়েছে। জেরি লাটিমার এবং ডজ-ক্যাগার জুটির সাহায্যে সে-ই ঘটিয়েছে কুকর্মটি।'

চোখ কুঁচকে জ্যাক টার্নারকে দেখছেন চীফ। কোন মন্তব্য করলেন না।

'কিছুদিন আগে অর্ডন্যান্স রিসার্চ ইনস্টিটিউটের চীফ অলব্রাইট প্যারিস গিয়েছিলেন এক সম্মেলনে যোগ দিতে। সঙ্গে ছিল তাঁর সহকারী, আলেক ওয়াটসন। ওঁদের সফরের শেষ পর্যায়ে জার্মানি থেকে প্যারিস গিয়ে হাজির হয় কার্ল হফার। জেরি লাটিমার আগে থেকেই ছিল ওখানে। সম্মেলন শেষে দেশে ফিরে আসার দু'দিন পর আত্মহত্যা করে আলেক ওয়াটসন।

'তার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে একটা সেক্স ফটো উদ্ধার করে পুলিস। গে ছিল আলেক ওয়াটসন। ছবিটা ছিল আরেক গে বয় মিশেলের সঙ্গে, নোংরা পোজের। মিশেল ছিল প্যারিসে।'

'ছিল?'

'হ্যাঁ। তাকেও প্যারিস পুলিস তার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে মৃত উদ্ধার করে। গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল মিশেলকে।'

'তারপর?'

'জানা গেল গে বয়টি ছিল কার্ল হফারের নিযুক্ত। আলেক ওয়াটসনের দুর্বলতা জানত হফার, নিজের প্রয়োজনে কষ্ট করে জেনে নিয়েছিল। প্যারিসবাসের মাঝামাঝি সময়ে তার সঙ্গে মিশেলকে কায়দা করে ভিড়িয়ে দেয় সে। এবং ওদের বিশেষ মুহূর্তের যুগল ছবি তুলে তাই দিয়ে ওয়টাসনকে ব্ল্যাকমেইল করে। অনুমান, ছবিগুলো ফিরিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে প্রফেসর মারগুব হোসেনের মেটাল ফর্মুলার একটা কপি তার কাছ থেকে আদায় করে নেয় হফার বা লাটিমার। তারপর হত্যা করা হয় তাকে।

'প্যারিস গেলে সবসময় জর্জ ভি হোটেলে থাকে হফার। ওদের কনশিয়ার্স আলেকের ছবি সনাক্ত করেছে, দেশে ফেরার ক'দিন আগে লোকটা নাকি ওখানে গিয়েছিল জেরির সঙ্গে দেখা করতে। ঘটনাগুলো এক করো, হিসেব মিলে যাবে। যদিও এগুলো নিরেট প্রমাণ নয়। তবে সত্যি, কোন সন্দেহ নেই। শতকরা একশো দশ ভাগ সত্যি। কাল মরভিনের মুখে আর যে সব কাহিনী শুনেছি ওগুলোও সব এক করো, প্রফেসরের নিরুদ্দেশ হওয়ার পিছনে কে আছে, পানির মত পরিষ্কার হয়ে যাবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, কার্ল হফার খুব গভীর পানির মাছ।

খুবই গভীর পানির। এইসব তথ্য পুঁজি করে লোকটাকে ঘাঁটাতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তবে ইচ্ছে করলে ক্যাগার আর ডজকে তুলে আনতে পারো। আচ্ছাসে ডোজ দিয়ে কথা আদায় করার চেষ্টা করে দেখতে পারো। ওরা চুনোপুঁটি। ধরা পড়লে কেউ একটা আঙুল তুলবে না।'

চুপ করে থাকলেন পুলিস চীফ। ভাবছেন।

'কি চিন্তা করছ?'

'ধরার আগে ওদের মতিগতি আরেকটু বুঝে নিতে চাই। ভাবছি ওদের ওপর নজর রেখে দেখা যাক দুই-একদিন।'

'তা করতে পারো। তবে এ মুহূর্তে শহরে নেই ওরা। খোঁজ নিয়েছি আমি। কাল রাতে কোথায় যেন গেছে ওরা দুটো। জেরি লাটিমারও নেই।'

'আই সী!' কি যেন ভাবতে লাগলেন চীফ আনমনে। কপাল কুঁচকে আছে।

প্রফেসর মারগুব হোসেনের গুহামুখে ইতস্তত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে শিলা ব্রাউন। পর্দা দিয়ে ভেতরটা আড়াল করা। প্রফেসর কি করছেন বোঝার উপায় নেই। বাইরে ভীষণ দর্শন দুই গার্ড তাঁর পাহারায় রয়েছে। শিলার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে জেরি এবং গুন্থার।

'যান, মিস শিলা,' চাপা গলায় বলল জেরি। 'ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমরা থাকছি এখানে। যা যা বলতে বলা হয়েছে, তার বাইরে একটা কথাও বলবেন না যেন। আপনি কি বলছেন সব শুনতে পাব আমরা, মনে রাখবেন।'

তবু দ্বিধা যায় না মেয়েটির। একবার গুন্থার, আরেকবার জেরির দিকে তাকাচ্ছে। গুন্থারের বড়সড় মুখে অভয়ের হাসি ফুটল। বাঁ হাত শিলার পিঠে রেখে আস্তে করে তাকে সামনে ঠেলে দিল লোকটা। 'যান।'

ঢুকে পড়ল শিলা। চেম্বারের আকার দেখে অবাক হলো ও। বিশাল। এবড়োখেবড়ো ছাতটা যেন আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। উঁচু নিচু পাথুরে মেঝে কেটে যথাসম্ভব সমতল করা হয়েছে। চার চারটে জোরাল বালব্ জ্বলছে ভেতরে, তারপরও আলো অপর্যাপ্ত। সামনে তাকাল শিলা ব্রাউন। গুহার শেষ মাথায় একটা খাট দেখা যাচ্ছে। পাশে একটা টেবিল, চারটে পিঠ-উঁচু চেয়ার এবং একটা লাউঞ্জিং চেয়ার। শেষেরটায় বসে আছেন প্রফেসর। আবছা আলোয় চেহারা দেখা যায় না।

পায়ে পায়ে সেদিকে এগোল শিলা ব্রাউন। ভয় লাগছে। ও জানে, জানে মানে, শুনেছে, প্রফেসরের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। মানসিক রোগে ভুগছেন। জেরি বলেছে, আজ ভোরে অ্যাসাইলামের এক নার্সকে নাকি খুন করেছেন তিনি। শিলা যে প্রফেসরকে চিনত, এ লোক তিনি নন। এ অন্য মানুষ। ভয়ঙ্কর এক ম্যানিয়াক! ডক্টর ম্যাথিয়াস তাঁর বর্তমান অবস্থা জানিয়েছে ওকে। হঠাৎ করে বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারেন প্রফেসর। ওখানেই ভয়। শিলা যত এগোচ্ছে, গুহামুখে ঝোলানো বালব্‌টার কারণে ততই লম্বা হচ্ছে ওর ছায়া। আগে আগে চলেছে ছায়াটা।

ওকে দেখে ধীরে ধীরে সোজা হলো লাউঞ্জিং চেয়ারে বসা কাঠামোটা। দাঁড়িয়ে পড়ল শিলা ব্রাউন। সতর্ক চোখে দেখছে প্রফেসরকে। চোখ সয়ে গেছে আলোয়। এখানটায় পর্যাপ্ত আলো রয়েছে। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ও। প্রফেসরের মুখটা শুকনো শুকনো লাগছে। হাঁটুর ওপর দু'হাত রেখে বসে আছেন তিনি। এমনভাবে তাকিয়ে আছেন শিলার দিকে, মনে হলো যেন চেহারাটা স্মরণ করার চেষ্টা করছেন।

দু'হাত হাঁটুর ওপর রেখে সামনে ঝুঁকে বসলেন মারগুব হোসেন। অনেক বদলে গেছেন মানুষটা, ভাবল শিলা। আগের সেই স্বাস্থ্য, চেহারা কোনটাই নেই। অনেক পাতলা হয়ে গেছে চুল। চোখ গর্তে বসা। প্রফেসরকে শেষ কবে যেন দেখেছে ও? কয় মাস আগে? তাঁর দশ ফুটের মধ্যে পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়ল শিলা। আর এগোনো ঠিক হবে কি না ভাবছে।

দু'বছর, মনে পড়েছে ওর, দু'বছর পর আবার প্রফেসরের মুখোমুখি হয়েছে সে। এরমধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে মানুষটির, বদলায়নি কেবল চোখ দুটো। সম্মোহনী শক্তি আছে ও চোখে। আগের মতই বুদ্ধিদীপ্ত। কিন্তু কেমন যেন মিইয়ে আছে এ মুহূর্তে।

ঢিব্ ঢিব্ করছে বুকের মধ্যে। ঢোঁক গিলল শিলা। 'ডক্-ডক্টর হোসেন...আমি শিলা ব্রাউন।'

'কে?' গুহার মধ্যে গমগম করে উঠল প্রফেসরের ভরাট কণ্ঠ। আরও সামনে ঝুঁকে বসলেন তিনি।

'আমি শিলা।'

'শিলা! তুমি...তুমি এখানে...সত্যি?'

'হ্যাঁ, ডক্টর।'

হাসি ফুটল বিজ্ঞানীর মুখে। 'তুমি এখানে কি করছ?'

'আপনার সাথে সাথেই আছি আমি অনেকদিন থেকে।' ভেতরে ভেতরে খুব অবাক হয়েছে মেয়েটি। মানুষটির ব্যাপারে এতদিন সে যা শুনে আসছে, ডাক্তার গুন্থার যা বললেন, কই! মনে হয় না তো! কথা শুনে তো একদম স্বাভাবিক মনে হচ্ছে প্রফেসরকে!

'যাক্, অনেকদিন পর পরিচিত একটা মুখ দেখলাম,' এমনভাবে বললেন তিনি, মনে হলো শিলার কথাটা শোনেননি। 'খুশি হলাম খুব। একা থাকতে আর ভাল লাগছিল না।' নিজের চারদিকে নজর বোলালেন বৈজ্ঞানিক। 'এটা পাহাড়ের গুহা, তাই না?'

'হ্যাঁ, ডক্টর।'

'গেটে দু'জন গার্ড দেখলাম যেন তখন?'

'হ্যাঁ। ওরা আপনার সিকিউরিটি গার্ড।'

'রিয়েলি? কিন্তু জায়গাটা কোথায়? এখানে কিভাবে এলাম আমি?'

গুন্থার বলেছে, ওকে দেখলেই প্রফেসরের সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে। সত্যিই কি তাই ঘটেছে? সুস্থ হয়ে গেছেন তিনি? নাকি...'আপনি হঠাৎ করে খুব

অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন…'

'আরে!' উঠে দাঁড়ালেন মারগুব হোসেন। 'এতক্ষণ তোমাকে বসতেই বলিনি? ছিঃ ছিঃ, বোসো! হ্যাভ আ সীট, শিলা!' একটা চেয়ারে বসল ও। প্রফেসরও বসলেন। 'হ্যাঁ, কি যেন বলছিলে?'

'আপনি হঠাৎ করে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, স্যার। তাই মিস্টার অলব্রাইট নিরিবিলিতে চিকিৎসার জন্যে এই সুন্দর গুহায় নিয়ে এসেছেন আপনাকে। অনেক বড় একজন চিকিৎসক সব সময় আপনার দেখাশুনা করছেন। বাইরে গার্ডও রয়েছে।'

চোখ কুঁচকে কি যেন ভাবলেন বিজ্ঞানী। 'এসব আয়োজন ম্যাক্স অলব্রাইটের?'

'হ্যাঁ, স্যার। কেন, আপনার মনে পড়ে না সে সব?'

কপাল চুলকাতে লাগলেন মারগুব হোসেন। 'কই? কি জানি, মনে পড়ছে না তো!'

'ফর্মুলা এমসিজেড নিয়ে কাজ করছিলেন আপনি, হঠাৎ মেমোরি ব্ল্যাকআউট…'

'ফর্মুলা! কিসের ফর্মুলা বলো তো?'

'এমসিজেড, স্যার,' তীক্ষ্ণ চোখে তাঁকে দেখছে মেয়েটি। 'সেই যে এক মেটাল নিয়ে গবেষণা করছিলেন আপনি!'

ঠোঁট উল্টে মেঝের দিকে চেয়ে থাকলেন বিজ্ঞানী। চিন্তিত। 'কি জানি! আমার তো কিছুই মনে…ও হ্যাঁ! মনে পড়েছে মনে পড়েছে! তা…এখন কি অবস্থায় আছে সে সব? জানো কিছু তুমি?'

'জানি, স্যার। তেমনিই পড়ে আছে মিস্টার অলব্রাইটের কাছে।'

'তাহলে তো ভালই।'

'না, স্যার। অনেকেই চেষ্টা করেছে, কিন্তু ওটার কোড ব্রেক করতে পারেনি কেউ।'

হাসলেন বিজ্ঞানী। 'পারবেও না। আমিও ভুলে গেছি ওসব, বুঝলে?'

জুতোর ডগা দিয়ে আনমনে মেঝে ঘষতে লাগল শিলা ব্রাউন। 'আপনি যদি, স্যার, কষ্ট করে ফর্মুলাটা ডিকোড করে দেন, খুব উপকার হয়।' এই কথাগুলো কেউ শিখিয়ে দেয়নি তাকে। নিজের ইচ্ছেয় বলেছে সে। কারণ ডাক্তার ও জেরি পরিস্থিতি বুঝে কথা বলার স্বাধীনতা দিয়েছে তাকে।

'না, শিলা। সম্ভব নয়। তাছাড়া ওসব আর একদম ভাল লাগে না আমার। ফর্মুলা, আইডিয়া, কোড, এসবের নামও আর শুনতে ইচ্ছে করে না। কাজ জীবনে কম করিনি। আর ভাল লাগে না।'

ওদিকে, ওদের কথাবার্তা শুনে রেগে উঠল জেরি লাটিমার। চোখ গরম করে গুন্থারের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল দ্রুত, অর্থাৎ কি হচ্ছে এসব?

'চিন্তা নেই,' বলল গুন্থার। 'অপেক্ষা করুন, মনে হচ্ছে কাজ হবে। এত তাড়াতাড়ি লোকটা স্বাভাবিক মানুষের মত কথা বলবে ভাবতেই পারিনি আমি।

আপনি থাকুন, আমি যাচ্ছি ভেতরে।'

খানিক ইতস্তত করে মাথা ঝাঁকাল জেরি, 'যান।'

পর্দা সরিয়ে চেম্বারে ঢুকল জুরগেন গুস্থার। শিলার ওপর নিবদ্ধ প্রফেসরের দৃষ্টি ঘুরে গেল সেদিকে। 'আপনি কে?'

জোর করে হাসি ফোটাল ডাক্তার। 'আপনি আমাকে চেনেন, প্রফেসর। আমি পল ম্যাথিয়াস।'

'পল ম্যাথিয়াস...কে?'

'ডাক্তার। ডাক্তার পল ম্যাথিয়াস। আমিই এতদিন দেখাশুনা করছি আপনাকে।' প্রফেসরকে আড়াল করে ইঙ্গিতে শিলাকে বেরিয়ে যেতে বলল সে।

উঠে দাঁড়াল শিলা। বিজ্ঞানীর দিকে তাকাল এক পলক, তারপর বেরিয়ে গেল। চেয়ে চেয়ে দেখলেন মারগুব হোসেন, বললেন না কিছু। হঠাৎ করে ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেছেন। ব্যাপার বুঝতে সময় লাগল গুন্থারের। প্রফেসরের চাউনি আগের মত ভাবলেশহীন হয়ে গেছে। মনে হলো পর্দার নিচে একটা ঝাঁপ ছিল, আচমকা নেমে গেছে সেটা, দৃষ্টিপথ আগলে রেখেছে তাঁর।

বাইরে, শিলা বেরিয়ে আসতে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাল জেরি লাটিমার। 'দারুণ দেখিয়েছেন আপনি, মিস ব্রাউন। চমৎকার! চলুন, আপনাকে রূমে পৌঁছে দিয়ে আসি। আরও কিছু আলাপ আছে আপনার সঙ্গে।'

স্বল্প আলোকিত করিডর ধরে শিলার চেম্বারে এসে ঢুকল ওরা। একটা চেয়ার ক্যাম্পখাটের কাছে এনে বসল জেরি। ইঙ্গিতে শিলাকেও বসতে বলল। পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা পত্রিকা বের করে মেলল সে। মেয়েটির দৃষ্টি আকর্ষণ করল প্রথম পাতায় বড় করে ছাপা একটা সংবাদের ওপর।

'দেখেছেন খবরটা?' শান্ত কণ্ঠে বলল জেরি। 'এক মেল নার্সকে হত্যা করে অ্যাসাইলাম থেকে পালিয়ে এসেছে মানুষটা আজ ভোরে। কাল সকালে এটা নিয়ে আবার প্রফেসরের সাথে দেখা করবেন আপনি। তাঁকে বোঝাতে হবে এখন আর পিছু হটার উপায় নেই তাঁর। হয় আমাদেরকে সাহায্য করতে হবে তাঁকে, আমাদের কথামত চলতে হবে, নয়তো ফিরে যেতে হবে অ্যাসাইলামে। আমাদের কথামত চললে তাঁকে আমরা আমেরিকার বাইরে নিয়ে যাব। এ দেশে প্রফেসরের থেকে লাভ নেই। তাঁর উপযুক্ত জায়গা হচ্ছে মস্কো। ওখানে প্রফেসরের সুচিকিৎসা হবে, আকাশছোঁয়া সম্মান পাবেন তিনি ওদের কাছে।'

লোকটার সব কথা কানে যায়নি শিলার। পত্রিকার দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছে সে। অ্যাসাইলামের ঘটনা কিছুটা শুনেছে সে মারফির মুখে, কিন্তু বিশ্বাস করেনি পুরোপুরি। সেই খবরটাই পত্রিকায় ছাপা দেখে দ্বিধায় পড়ে গেছে। 'সত্যিই প্রফেসর খুন করেছেন?'

'কেন, বিশ্বাস হয় না আপনার?' পাল্টা প্রশ্ন করল লাটিমার।

আমতা আমতা করতে লাগল শিলা। 'ভদ্রলোক এমন কাজ করতে পারেন, মনে হয় না আমার।'

'আপনার মনে হওয়া না হওয়ায় কিছু এসে যায় না, মিস। পুলিস যা বলে.

সেটাই সত্যি।'

ও'ডোনিল একজন চিত্রতারকা। অন্তত নিজের সম্পর্কে সেরকমই ধারণা তার। এক সময় শহরের আণ্ডারওয়ার্ল্ডের নামকরা পাণ্ডা ছিল। একদিন প্রতিপক্ষের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে ডান পা-টা জন্মের মত খোঁড়া হয়ে যায় তার। এক পায়ে আর যা-ই হোক, পাণ্ডাগিরি চলে না, তাই হাসপাতাল থেকে মুক্তি পেয়ে কি করবে ভাবছিল ও'ডোনিল।

একজন খবর দিল, তার এক বন্ধু হলিউডের চিত্র পরিচালক। ওর মত এক খোঁড়া চরিত্র খুঁজছে সে তার আগামী ছবির জন্যে। অনেকেরই ইন্টারভিউ নিয়েছে সে, কিন্তু পছন্দ হয়নি কাউকে। নিল যদি দেখা করতে চায়, ওর হয়ে সুপারিশ করবে সে। হলে ক্ষতি কি, ভেবে রাজি হয়ে গেল নিল। এ জগতের ভবিষ্যৎ তো অন্ধকার, দেখা যাক ওখানে গিয়ে নতুন আলোর সন্ধান পাওয়া যায় কি না।

ভাগ্যই বলতে হবে, কাজটা জুটে গেল নিলের। রোল ছিল ছোট, দু'ঘণ্টার ছবিতে পর্দায় তার উপস্থিতি ছিল সব মিলিয়ে এগারো মিনিটের মত। পয়সা যা পেল, একেবারে খারাপ বলা যাবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফ্লপ্ করল ছবিটা। ফ্লপ্ করল ও'ডোনিলের আশা-ভরসাও। বছরখানেক হলিউডের স্টুডিও পাড়ায় খুব ঘুরল সে, কাজ হলো না। কেউ নিল না তাকে। একেবারে যে খালি হাতে ফিরিয়ে দিল তাও বলা যাবে না। অনেকেই আশ্বাস দিল, পরে প্রয়োজন হলে ডাকা হবে তাকে।

কিন্তু সে ডাক যে কোনদিনই আর আসবে না, বুঝতে আরও ছয় মাস লেগে গেল নিলের। তার অবস্থা তখন সঙ্গীন। হাতে পয়সা কড়ি একেবারেই নেই। ভবিতব্যকে কষে ঝাড় পেটা করল সে। তারপর একদিন অনেক রাতে, ওয়ার্নার ব্রাদার্সের লেডি'জ ল্যাভেটরিতে এক অভিনেত্রীকে একা পেয়ে ক্রাচ্ দিয়ে পিটিয়ে অজ্ঞান করে ফেলল নিল। মেয়েটি সেদিনই একটা ছবিতে অভিনয় করার চুক্তিপত্রে সই করে কিছু টাকা পেয়েছিল। তার ব্যাগ হাতড়ে টাকাগুলো নিয়ে পালিয়ে প্যারাডাইস সিটিতে ফিরে এল সে।

পরে জেনেছে, অজ্ঞান নয়, মেয়েটিকে মেরেই ফেলেছিল সে। বর্তমান ও ভবিষ্যতের চিন্তায় এতই উদ্বিগ্ন ছিল নিল যে মারের ওজন ঠিক ছিল না। অবশ্য একদিক থেকে ভালই হয়েছে। বেঁচে থাকলে পুলিসকে নিলের বর্ণনা জানিয়ে দিত মেয়েটি, বিপদ হত ওর। সেদিক থেকে বাঁচা গেছে, কাজেই মেয়েটির মৃত্যু বিন্দুমাত্র রেখাপাত করেনি ওর মনে। আর ওইটুকু আঘাতেই যে মরে যায়, তার মরে যাওয়াই ভাল। সারভাইভাল অভ দ্য ফিটেস্ট হচ্ছে এ-দুনিয়ার নিয়ম। পৃথিবী হচ্ছে ফিটেস্টদের জন্যে। ওদের মত মেয়ে-পুরুষের জন্যে নয়।

'যা হোক, ছিনতাইয়ের টাকায় কিছুদিন চলল ও'ডোনিলের। তারপর আবার যে-কে সেই। উপায়ান্তর না দেখে মেয়ের দালালীতে নামতে বাধ্য হলো নিল। তাদের রোজগার থেকে কিছু কমিশন পায়, ওই দিয়েই দিন চলে কোনমতে। হলিউড থেকে ফেরার পর পুরানো জগতের সঙ্গেও যোগাযোগ রেখেছিল সে।

আসা-যাওয়া করত নিয়মিত। এই সময় একদিন হঠাৎ করেই বুদ্ধিটা এল মাথায়।

ওখানকার কয়েকজনকে চেনে নিল, যাদের আসল পেশা তথ্য বিক্রি করা। কাজটায় ঝুঁকি আছে, অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে করতে হয়। একটু এদিক ওদিক হলেই জান খতম হয়ে যায় এ লাইনে। তবু নেমে পড়ল ও'ডোনিল। ভয় কি? সতর্ক থাকবে সে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। জীবনের পয়লা তথ্য বেচতে গিয়েই ধরা খেয়ে গেল নিল।

তথ্যগুলো যার সম্পর্কে, স্বয়ং সে-ই ধরে বসল তাকে এক নাইট ক্লাবে। ভয়ঙ্কর এক গুণ্ডা ছিল লোকটা। মারতে মারতে প্রায় মেরেই ফেলছিল ওকে, এই সময় ওকে রক্ষা করতে এগিয়ে এল অজ্ঞাত এক লোক। তার পাল্টা মার খেয়ে পালিয়ে গেল গুণ্ডা। অজ্ঞান ও'ডোনিলকে হাসপাতালে নেয়া ইত্যাদি সেই মানুষটিই করেছিল। যদিও তাকে চেনে না নিল। নামও জানে না। তবে দেখলে চেনে। ওই ঘটনার পর থেকে অনেক অনেক হুঁশিয়ার হয়ে গেছে সে। তথ্য বেচে ঠিকই, তবে আর যাতে অমন বিপদ না ঘটে, সে ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকে। সঙ্গে নারীর দালালীও করে নিল। কিন্তু তারপরও নিজেকে একজন চিত্রতারকা ভাবতেই ভালবাসে সে।

রাত দুটোয় নিজের লেনক্স অ্যাভিনিউর অ্যাপার্টমেন্টে ফিরল ও'ডোনিল। এটাই তার ঘরে ফেরার সময়। সারা শহর যখন নেতিয়ে পড়ে, তখন। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল সে। ডোর প্যানেলে ফিট্ করা সুইচের দিকে হাত বাড়াতে গেল, কিন্তু জায়গামত পৌঁছার আগে আপনাআপনিই থেমে গেল হাত। নাকে মিষ্টি একটা সুবাস পেয়েছে ও'ডোনিল। গন্ধটা চমৎকার, কিন্তু অপরিচিত। সতর্ক হয়ে উঠল সে। কেন যেন মনে হলো সে একা নয়, ঘরে আরও কেউ আছে। বুক কেঁপে উঠল নিলের, কে!

তীব্র আতঙ্কে চোখমুখ বিকৃত হয়ে উঠল তার। এই বুঝি কলজেয় বিঁধে গেল তীক্ষ্ণ ধার ছুরি, বা নিঃশব্দ বুলেট···। লাফিয়ে সরে আসবে, সে ক্ষমতাও লোপ পেয়েছে নিলের। অসাড় হয়ে গেছে দেহ। একচুল নড়াচড়া করার শক্তি নেই। এই সময় অন্ধকার ঘরে ভরাট, কর্তৃত্বপূর্ণ একটা কণ্ঠ কথা বলে উঠল।

'ভয় নেই, নিল, আমি তোমার বন্ধু। দরজা বন্ধ করে আলো জ্বালো।'

যন্ত্রচালিতের মত দরজা বন্ধ করল নিল। পর মুহূর্তে আলোয় হেসে উঠল ঘর। সামনে তাকিয়ে সশব্দে আঁতকে উঠল নিল। হাঁ আর বন্ধ হয় না। সেদিনের সেই মানুষটি বসে আছে ওর সামনে। যে সেবার বাঁচিয়েছিল তাকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে। আধমরা নিলকে পৌঁছে দিয়েছিল হাসপাতালে।

দীর্ঘদেহী। চেহারা নায়কের মত। চুল ব্যাকব্রাশ করা। একভাবে নিলকে দেখছে লোকটা। চেহারা দেখে মনে হয় নিষ্ঠুর, কিন্তু চোখ দুটো বলছে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। কিন্তু মানুষটা ঘরে ঢুকল কি ভাবে, ভেবে পেল না নিল।

'চিনতে পেরেছ?' জিজ্ঞেস করল মাসুদ রানা।

দম দেয়া পুতুলের মত মাথা দোলাল নিল। 'হ্যাঁ! হ্যাঁ, স্যার! কিন্তু আ···আ···!'

'বোসো। জরুরী কিছু কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

ধীর পায়ে এগোল নিল। বিস্ময় বাঁধ মানছে না। সেই সময় দু'তিনদিন দেখেছে সে মানুষটিকে, দু'বছর আগে। হাসপাতালে আসত ওর খোঁজ-খবর নিতে। তারপর আজ আবার সাক্ষাৎ। হাজারো প্রশ্ন মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে ও'ডোনিলের। কিন্তু মুখে আসছে না একটাও। কোনটা রেখে কোনটা জিজ্ঞেস করবে? তার মুখোমুখি বসল সে শক্ত হয়ে। অপলক চোখে দেখছে আগন্তুককে।

'তোমার ব্যবসা কেমন চলছে, নিল?'

'ভাল। কো-কোনটা, স্যার?'

'দ্বিতীয়টা। ইনফর্মেশন।'

মুখ নামিয়ে নিল লোকটা। 'চলছে, স্যার। মোটামুটি।'

'গুড!'

'স্যার, আপনি কি...?'

'ঠিক ধরেছ। কিছু তথ্য চাই আমার। বিনিময়ে উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাবে।'

জিভ আধহাত বেরিয়ে পড়ল নিলের। 'ছিঃ ছিঃ, স্যার! কাজ করে পয়সা নেব আপনার কাছ থেকে? আপনি আমার জীবন...'

হাত তুলে বাধা দিল রানা। 'ওসব থাক। কয়েকজনের ব্যাপারে জানতে আগ্রহী আমি।'

'নামগুলো কেবল উচ্চারণ করুন, স্যার।'

'আলেক্স ক্যাগার এবং জ্যাক ডজ।'

থতমত খাওয়া চেহারা হলো ও'ডোনিলের। মুখের রক্ত সরে গেছে। 'ও দুটো...ওরা মানুষ নয়, স্যার।'

'হোক যা খুশি। কার হয়ে ওরা কাজ করে এবং ওদের ঠিকানা, দুটোই জানতে চাই আমি।'

কিছুক্ষণ চুপ মেরে বসে থাকল নিল। 'যদি কিছু মনে না করেন, স্যার, একটা প্রশ্ন করি?'

'করো।'

'আপনি কি পুলিসের, মানে...।'

'হ্যাঁ। পুলিসের মতই কিছু একটা।'

মিনিট দশেক নিলের সঙ্গে কথা বলল মাসুদ রানা। আসার সময় জোর জবরদস্তি করে পাঁচশো ডলার ধরিয়ে দিয়ে এল ও লোকটার হাতে। 'কাল রাতের মধ্যে সব তথ্য চাই আমার।'

'নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, স্যার।'

# পাঁচ

প্রফেসরের সঙ্গে দেখা করে কি কি বলতে হবে, সে ব্যাপারে শিলাকে ফাইন্যাল ব্রিফ করছে জেরি লাটিমার। রাতটা বিছানায় ছটফট করে কেটেছে শিলার। সব মিলিয়ে এক ঘণ্টাও ঘুমাতে পারেনি সে, এপাশ-ওপাশ করাই সার হয়েছে কেবল।

সুযোগটা পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছে শিলা। মনে মনে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, এদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে না সে কিছুতেই। এরা ভাল নয়, বুঝতে পেরেছে শিলা। বদ লোক। এদের উদ্দেশ্য খারাপ। প্রফেসরকে দেশের বাইরে নিয়ে যেতে চায় এরা। কিন্তু ও তা হতে দিতে পারে না। শিলার ক্ষমতা সীমিত, তারওপর নিজেও সে শত্রু পরিবেষ্টিত। কাজেই এর মধ্যে থেকে ওর পক্ষে যেটুকু সম্ভব, সেটুকু সে করবে। করতেই হবে।

যদিও জেরি থেকে থেকে মনে করিয়ে দিচ্ছে প্রফেসরের চেম্বারে মাইক্রোফোন আছে, ওরা কি আলাপ করে সব কানে আসে তার। হুমকিটা বারবার দিয়ে মারাত্মক ভুল করেছে লোকটা। কারণ কথা বলার অন্য উপায় ঠিক করে ফেলেছে ও। মুখ ছাড়াও অন্যভাবে কথা বলতে পারে শিলা। এ বিদ্যে প্রফেসর মারগুব হোসেনেরই কাছে শিখেছিল সে। মূক-বধিরদের আঙুল ইশারার ভাষা। ভদ্রলোক ওই ভাষার একজন এক্সপার্ট।

আগে যখন তাঁর সহকারী ছিল শিলা, ল্যাবরেটরিতে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ফ্রিকশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শব্দ রেকর্ড করার সময় নিঃশব্দে কাজ সারার জন্যে ওর সঙ্গে আঙুল ইশারায় কথা বলতেন প্রফেসর। দেখতে দেখতে এক সময় শিলাও শিখে ফেলে ভাষাটা। ঠিক করেছে, আড়ালে সেই ভাষায় আজ বেশিরভাগ কথা বলবে সে তাঁর সঙ্গে। সতর্ক করে দেয়ার চেষ্টা করবে প্রফেসরকে। তাতে আরেকটা পরীক্ষাও হবে। বিজ্ঞানী সত্যিই মানসিক রোগী কিনা, তা অন্তত বোঝা যাবে। মনে মনে হাসল শিলা।

জেরি তখন বলছে, 'রাতে ভালই ঘুম হয়েছে প্রফেসরের। যাতে হয়, সে জন্যে ঘুমের ওষুধ পুশ করা হয়েছিল। কাজেই, মাথা ফ্রেশ আছে এখন লোকটার। ভেতরে গিয়ে পত্রিকাটা দেখাবেন তাকে। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে রাজি করাবেন। বুঝতে পেরেছেন?'

মাথা দোলাল মেয়েটি।

'গুড গার্ল। যান তাহলে। আমি শুনব আপনাদের সব কথা,' সুন্দর করে হাসল জেরি লাটিমার। 'হাতে নষ্ট করার মত সময় নেই একেবারেই, বুঝতেই পারছেন। যত তাড়াতাড়ি কাজ হবে, তত তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবেন আপনি। ভুলে যাবেন না, এ কাজে আপনাকে ব্যর্থ হলে চলবে না। সফল হতেই হবে।'

পত্রিকাটা নিল শিলা ব্রাউন। জেরির ইঙ্গিতে তার পাশাপাশি হাঁটতে লাগল

প্রফেসরের চেম্বারের দিকে। ভেতরে ঢোকার আগে হাত ধরে থামাল তাকে জেরি।

'একটা কথা, মিস শিলা। আমার জন্যে যতটা নয়, তারচে' বেশি নিজের ভালর জন্যেই সফল হতে হবে আপনাকে। যদি ব্যর্থ হন, তার পরিণাম যে কি হবে আমি নিজেও জানি না।' হুমকির সঙ্গে মিষ্টি একটুকরো হাসিও উপহার দিল লোকটা।

ঢুকে পড়ল শিলা। লাউঞ্জিং চেয়ারটায় পায়ের ওপর পা তুলে বসে আছেন মারগুব হোসেন। আঙুলের ফাঁকে আঙুল গলিয়ে দু'হাত জুড়ে থুতনি রেখেছেন তার ওপর। চোখ বোজা। ওপরের পা-টা দুলছে অল্প অল্প। শিলা কাছে গিয়ে দাঁড়াতে চোখ খুললেন প্রফেসর। 'শিলা এসেছ? কাল হঠাৎ কোথায় চলে গিয়েছিলে?'

'এটা পড়ুন, স্যার,' পত্রিকাটা এগিয়ে দিল সে।

'কি এটা? পত্রিকা দেখছি!'

'হ্যাঁ, স্যার। লীড নিউজটা দেখুন দয়া করে।'

'দেখছি। তুমি বোসো।'

আজকের প্যারাডাইস হেরাল্ড ওটা। ওপরে ডানদিকে বড় করে প্রফেসর মারগুব হোসেনের ছবি, পাশে মৃত মেল নার্সের ছোট একটা ছবি। ওপরে ব্যানার হেডিং :

**মেল নার্সকে হত্যা করে প্রফেসর মারগুব হোসেনের পলায়নঃ**
**অনুসন্ধান অব্যাহতঃ হতভাগ্য ফিল সিমন্স সমাহিত**

ভাবলেশহীন মুখে পুরো সংবাদটা পড়ে গেলেন তিনি। শেষে বন্ধনীর ভেতর 'আরও ছবি শেষের পাতায়' দেখে পত্রিকা ওল্টালেন। তিন চারটে উড়ন্ত হেলিকপ্টার চষে ফিরছে ফ্লোরিডা উপকূল, বাড়ি বাড়ি ঢুকে তাঁকে খুঁজছে ট্রুপস ইত্যাদি অনেকগুলো ছবি ছাপা হয়েছে। আবার প্রথম পাতায় ফিরে গেলেন প্রফেসর। মূল খবরের মাঝখানে বক্সের ভেতর জনগণের জন্যে বিশেষ সতর্কবাণী ছাপা হয়েছে। ওতে আছেঃ প্রফেসর মারগুব হোসেন এক ভয়ঙ্কর খুনী। তার খোঁজ পেলে তৎক্ষণাৎ প্যারাডাইস সিটি পুলিস হেডকোয়ার্টার্সে ফোন করার জন্যে জনসাধারণের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে। ফোন নম্বর ৭৭৭৭।

পত্রিকা ভাঁজ করে কোলের ওপর রাখলেন তিনি। 'তুমি পড়েছ খবরটা?'

'হ্যাঁ।'

'বিশ্বাস করেছ?'

'না করে উপায় কি, স্যার? সবাই কি মিথ্যে বলছে?' বলল শিলা। পরমুহূর্তে হাঁটুর ওপর রাখা ডান হাতের আঙুলগুলো জীবন্ত হয়ে উঠল তার। ওগুলো বলছেঃ 'না, বিশ্বাস করিনি। বেফাঁস কথা বলবেন না, ভেতরে মাইক্রোফোন আছে।'

অবাক চোখে শিলাকে দেখতে লাগলেন প্রফেসর। ছেলেমানুষী হাসিতে ভরে উঠেছে মুখটা। 'তাই?' মুখে বললেন তিনি।

'হ্যাঁ, প্রফেসর। ওরা হয়তো সত্যি কথাই বলছে।'

'আচ্ছা, আমাকে একটু ভাবতে দাও, প্লীজ। কথা বোলো না।'

পরমুহূর্তে দু'জনের মধ্যে সাঙ্কেতিক আলাপ শুরু হয়ে গেল। আনন্দে বুক ভরে উঠল শিলার। বুঝল প্রফেসর আসলে সম্পূর্ণ সুস্থ। কিছুই হয়নি তাঁর। ফর্মুলা ডিকোড করে দেয়ার চাপাচাপি এড়াবার উদ্দেশ্যেই এতদিন মেন্টাল ব্ল্যাক আউটের অভিনয় করে এসেছেন তিনি।

'আমার প্রশ্নের উত্তর দাও,' বলল প্রফেসরের আঙুল। 'এসবের কারণ কি, ফর্মুলা?'

'আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। আপনি এতদিন অভিনয় করছিলেন?'

আবার হাসলেন প্রফেসর। 'হ্যাঁ।'

'আপনার প্রশ্নের উত্তরও হ্যাঁ।'

'কিন্তু সবাই তো জানে আমি পাগল। তারপরও কেন টানাটানি?'

'ওরা হয়তো তা বিশ্বাস করে না। হয়তো করে, যে কারণে একজন ব্রেন স্পেশালিস্টকে ধরে এনেছে।'

'তুমি এর মধ্যে জড়ালে কি করে?'

'আমাকেও এরা ধরে এনেছে।'

'কেন?'

'মনে হয়, আমার ওপর অত্যাচারের ভয় দেখিয়ে ফর্মুলা ডিকোড করে দিতে বাধ্য করবে ওরা আপনাকে।'

গম্ভীর হয়ে গেলেন প্রফেসর। 'এরা কারা?'

'আমেরিকান। তবে রুশদের পক্ষে।'

'কি করে বুঝলে?'

'এদের যে নেতা, সে বলে আপনাকে মস্কোয় নিয়ে চিকিৎসা করা হবে। ওদেশে গেলে মাথায় করে রাখবে ওরা আপনাকে।'

'ওরা ফর্মুলা বাগাতে পেরেছে মনে হয়?'

'মনে হয়।'

নীরবতা। 'অ্যাসাইলামের মেল নার্সকে আমি খুন করিনি।'

'আমি কখনও কল্পনাও করিনি আপনি করেছেন।'

এইবার কথা বলে উঠলেন বিজ্ঞানী। 'কই! কিছুই তো মনে করতে পারছি না! মনে পড়ে, কাল তুমি বলেছ, আমাকে চিকিৎসার জন্যে 'খানে পাঠিয়েছে ম্যাক্স। অথচ আজ পত্রিকায় দেখছি কোন এক অ্যাসাইলাম থেকে নাকি আমি পালিয়ে এসেছি। একজনকে খুনও নাকি করেছি ওখানে। কি আশ্চর্য! কিছুই তো মনে করতে পারছি না আমি।' আঙুল বলল, 'এদের দলনেতার সঙ্গে কথা বলতে চাই। ভেবো না। আমি সামাল দিতে পারব।'

শিলা মুখে বলল, 'এখানে এক ভদ্রলোক আছেন, যিনি ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারবেন আপনাকে। কথা বলবেন তাঁর সঙ্গে, স্যার?'

'হ্যাঁ, বলব। কিন্তু তুমি চলে যেয়ো না। তুমিও থেকো সে সময়।'

'ঠিক আছে, থাকব।'

'যাও, প্লীজ। ডেকে নিয়ে এসো তাকে।'

উঠে দাঁড়াল শিলা ব্রাউন। ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল গুহা থেকে। গুহামুখের বাঁকের ওপাশে দাঁড়িয়ে ছিল জেরি লাটিমার, ওকে দেখে এগিয়ে এল হাসিমুখে।

'প্রফেসর কথা বলতে চান আপনার সঙ্গে,' বলল ও।

'হ্যাঁ, আমি শুনেছি, মিস্ ব্রাউন,' খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল লাটিমারের। 'দারুণ কাজ দেখিয়েছেন আপনি।' পরক্ষণেই চাউনি কেমন যেন হয়ে উঠল তার। হফারের সতর্কবাণী মনে পড়ে গেছে– কোন লুজ এণ্ড রাখা চলবে না। অতএব, কাজ শেষ হয়ে গেলে একেও মরতে হবে অন্যদের মত। তুলে দিতে হবে ক্যাগারের হাতে। 'চলুন। প্রফেসর তো, শুনলাম, কথা বলার সময় আপনাকেও উপস্থিত থাকতে বললেন। আসুন।'

ভেতরে ভেতরে সতর্ক হয়ে উঠল শিলা। জেরির চাউনিটা পছন্দ হয়নি। কি যেন ছিল লোকটার দৃষ্টিতে। আগেই অনুমান করেছে সে, চেহারা যত মার্জিত, আচরণ যত অমায়িক হোক না কেন, ভেতরে ভেতরে মানুষটা ঠিক উল্টো। শিরদাঁড়া বেয়ে অজানা এক শিহরণ বয়ে গেল শিলার। তার পিছন পিছন চলল ও দ্রুত পায়ে। ভয় পেয়ে গেছে। হঠাৎ করে সেই যুবকের ওপর চোখ পড়েছে তার।

ওপাশের এক চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসেছে সে– জ্যাক ডজ। সঙ্গে নকল কাঁচের চোখওয়ালা আরেক লোক। শিলাকে দেখতে পেয়ে হেসে উঠল জ্যাক ডজ, সঙ্গীকে বলল কি যেন। প্রফেসরের চেম্বারে ফিরতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল মেয়েটি। বিজ্ঞানীর মুখোমুখি বসল জেরি। ও বসল একটু তফাতে।

'আমার নাম জেরি ল্যাটিমার,' শুরু করল লোকটা। 'রুশ সরকারের প্রতিনিধি আমি।'

'আমাকে রাশিয়ার কি প্রয়োজন?'

'আপনার এমসিজেড ফর্মুলার ব্যাপারে ওরা খুব আগ্রহী।'

'বুঝেছি। বলে যান।'

'কাজের প্রচণ্ড চাপে বেশ কয়েক মাসের জন্যে মেন্টাল ব্ল্যাক আউট ঘটেছিল আপনার। মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। সুস্থ করে তোলার জন্যে এক স্যানাটোরিয়ামে ভর্তি করা হয় আপনাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত,' কাঁধ শ্রাগ করল জেরি, 'ওদের এক মেল নার্সকে হত্যা করে বসেন আপনি। তারপর পালিয়ে আসেন ওখান থেকে। মিস ব্রাউন পত্রিকায় ছাপা হওয়া হত্যা সম্পর্কিত সংবাদটা দেখিয়েছেন আপনাকে।'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলালেন বিজ্ঞানী। 'দেখিয়েছে।'

'চেয়ারের পায়া দিয়ে মাথায় আঘাত করে নার্সটিকে হত্যা করেছেন আপনি। সে যাই হোক, সৌভাগ্যই বলতে হবে, স্যানাটোরিয়াম থেকে পালিয়ে এসে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছিলেন আপনি। সে সময় আমারই এক লোক দেখে ফেলে আপনাকে। সে-ই এখানে নিয়ে এসেছে আপনাকে।'

'রাশিয়ান সরকারের কথা কি যেন বলছিলেন?'

'ওরা আপনাকে সব ধরনের প্রোটেকশন দিতে আগ্রহী। ওদেশে সু-চিকিৎসা করা হবে আপনার। বিনিময়ে এমসিজেড ফর্মুলা ডিকোড করে দিতে হবে আপনাকে।'

'আই সী!' যেন ভাবনায় পড়ে গেছেন, এমন মুখভঙ্গী করলেন বিজ্ঞানী।

ভয় ধরিয়ে দেয়ার এটাই উপযুক্ত সময়, ভাবল জেরি। 'যদি আপনি সহযোগিতা করতে রাজি না হন, তাহলে আপনাকে স্যানাটোরিয়াম কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না আমার। আর, আবার যদি ওর ভেতরে ঢোকানো হয় আপনাকে, বুঝতেই পারেন,' আবার শ্রাগ করল জেরি, 'জীবনে কোনদিনও আর বেরুতে পারবেন না। কোনটা চান তাড়াতাড়ি ঠিক করুন। সিদ্ধান্ত নিতে প্রয়োজন হলে সময় নিন। চিন্তা করুন। ফর্মুলার কপি আছে আমার কাছে,' কোটের ভেতর পকেট থেকে একটা সুদৃশ্য খাম বের করল সে। বিজ্ঞানীর হাতে তুলে দিল ওটা।

ভেতর থেকে কাগজগুলো বের করে দেখতে লাগলেন তিনি। 'কোথায় পেয়েছেন আপনি এটা?'

'তা আপনার না জানলেও চলবে, ডক্টর।'

বিরক্ত হয়ে মুখ তুললেন প্রফেসর। চোখ কুঁচকে তাকালেন লোকটার দিকে। 'ঠিক আছে, রেখে যান ফর্মুলা। ভেবে দেখি কি করব।'

'তবে আমাদের হাতে নষ্ট করার মত সময় নেই মোটেই। কাজটা তাড়াতাড়ি করা দরকার।' মনে মনে পুলকিত জেরি। এত জলদি সুস্থ হয়ে উঠবে লোকটা, এত দ্রুত কাজের কথা শুরু করা সম্ভব হবে কল্পনাই করেনি সে। একটু ভয়, একটু চাপ দিয়ে লোকটাকে দিয়ে কাজটা যদি আজকের মধ্যেই করিয়ে নেয়া যায়, অনেক ঝুট ঝামেলার হাত থেকে বেঁচে যাবে লাটিমার।

'চাপাচাপি করে কোন ফায়দা হবে না, মিস্টার,' কড়া গলায় বললেন তিনি। 'এসব জটিল কাজ। সময় প্রয়োজন। তাছাড়া, এ কবেকার কথা, ডিকোড করতে পারব কি না, সেটাও আরেক চিন্তার কথা।'

সিধে হয়ে গেল জেরি লাটিমার। 'কেন! পারবেন না কেন?'

'পারব না এমন কিছু বলেছি নাকি আমি?'

'না, তা নয়। মানে…।'

'বলেছি সময় লাগবে।'

'কতক্ষণ?'

'একদিনেও হয়ে যেতে পারে, আবার সাতদিনও লাগতে পারে। এমনও হতে পারে কোনদিনই হবে না।'

হোটেল বেলিভেডার। সকাল সাতটা। পাশের পত্রিকার স্তূপের ওপর হাতেরটা নামিয়ে রাখল মাসুদ রানা। চোখ বুজে ভাবতে বসল। প্রশাসন ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ ভিন্নখাতে চালানোর চেষ্টা করছে। বোঝাতে চাইছে নার্স সিমন্সকে হত্যা করে পালিয়ে গেছেন প্রফেসর। তাঁকে অপহরণ করা হয়ে থাকতে পারে, কোন

পত্রিকায় তার আভাস পর্যন্ত নেই। কেন?

নাকি পুলিস এতই নাদান যে ভেতরের ব্যাপার কিছুই আঁচ করতে পারেনি? কিছুই টের পায়নি! অসম্ভব! এ হতেই পারে না অন্তত চেয়ারের পায়া দিয়ে যে হত্যা করা হয়নি নার্সটিকে, কফিতে যে ঘুমের ওষুধ মেশানো ছিল, এটুকু তো জানে! তাছাড়া রোজমেরি শেরম্যান যে ফিল সিমন্সের গার্ল-ফ্রেণ্ড, হঠাৎ করে মেয়েটি প্রচুর টাকার বিনিময়ে একটা রেস্টুরেন্ট কিনতে যাচ্ছিল, সে-সবও তো অজানা নয় ওদের। তাহলে?

প্যারাডাইস ইনের মালিকের গতরাতে পুলিস চীফের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল, যায়নি নাকি লোকটা? কোন কারণে মত পাল্টেছে শেষ পর্যন্ত? আরেকটা লক্ষ করার মত ব্যাপার আছে, সবগুলো পত্রিকায় অ্যাসাইলাম ঘটনা সম্পর্কে হুবহু একই খবর ছাপা হয়েছে। ফুল স্টপ, কমাসহ অবিকল এক বক্তব্য। সরকারী প্রেসনোট। সেন্সরড্ নিউজ। মিথ্যে খবর ছেপে কি লাভ হবে বলে আশা করছে ওরা?

ঘরের এ মাথা ওমাথা পায়চারি করতে লাগল মাসুদ রানা। প্রতীক্ষা করতে কখনই ওর ভাল লাগে না। অথচ এ মুহূর্তে ওটা ছাড়া আর কোন কাজও নেই। অথৈ পাথারে পড়েছে রানা। তীরে পৌঁছুতে হলে কেবল সাঁতার জানা থাকলেই চলবে না, খড়কুটো যা-ই হোক, একটা কিছু অবলম্বনও চাই। ও' ডোনিল সেই অবলম্বন। দেখা যাক, তীরের নির্দেশ দিতে পারে কি না লোকটা। ওর ভরসা আছে লোকটার ওপর।

ওদিকে সোহেল এসে বসে আছে। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের বদৌলতে সেটা জানতে পেরেছে ও। কাল দু'বার কথা হয়েছে ওদের টেলিফোনে। মাসুদ রানার মত সোহেল আহমেদও আহাম্মক হয়ে গেছে এমন অভাবনীয় ঘটনায়। হাত গুটিয়ে বসে আছে রানার অগ্রগতির আশায়। পরিস্থিতির কারণে নিজেকে গোপন রাখতে হচ্ছে তাকে। কেন, না একই সঙ্গে বিসিআই-এর দুই রথির আমেরিকা উপস্থিতি জানাজানি হয়ে গেলে জটিলতা বাড়বে।

রাহাত খান ঢাকায় বসে আঙুল কামড়াচ্ছেন বোধহয়। সব যদি ঠিকঠাক থাকত, প্রফেসর মারগুব হোসেনকে নিয়ে এতক্ষণে ঢাকার পথে থাকত সোহেল কিন্তু হলো না সব ভজকট হয়ে গেল। সময়ের ব্যাপারটা চিন্তা করলে কেমন যেন লাগে। এমন এক সময় অপহরণ করা হলো প্রফেসরকে, সন্দেহ জাগে ব্যাপারটা আদৌ কোন দৈব-সংযোগ কি না। যদিও এ ছাড়া আর কিছু হতে পারে বলে ও মনে করে না। তবু মনের খুঁতখুঁতে ভাব যায় না।

দাঁতে দাঁত চাপল মাসুদ রানা জেসি কুপারের দেয়া বর্ণনা অনুযায়ী চেষ্টা চালালে সেই দুই পুলিসের পরিচয় হয়তো খুঁজে বের করতে পারত ও। কিন্তু অনেক চিন্তা-ভাবনা করে আপাতত তা স্থগিত রেখেছে। রানা নিশ্চিত, চুনোপুঁটি। ধরতে পারলেও তেমন লাভ হবে না। হয়তো অর্থের বিনিময়ে শিলা ব্রাউনকে জেলগেট থেকে ধরে এনেছে তারা, তুলে দিয়েছে…কার হাতে?

ক্যাগার-ডজের পরিচালকের নামটা জানা গেলেই বোঝা যাবে। ওদের ধরলে

শেষ পর্যন্ত হয়তো জানা যাবে টেলিফোনে অজ্ঞাত কারও নির্দেশে কাজটা করেছে তারা। নিয়োগকর্তাকে চেনে না। বা হয়তো ওই দুই খুনীর কথামতই মেয়েটিকে অপহরণ করা হয়েছে। লোক দুটো যে ভুয়া পুলিস, সে ব্যাপারে বিকেলেই নিশ্চিত হয়েছে রানা। সব জায়গার মত এখানকার পুলিস বিভাগেও ওর ইনফর্মার আছে, তার কাছ থেকে নিশ্চিত হয়েছে ও। তবে ক্যাগার বা ডজ সম্পর্কে কিছু জানাতে পারেনি লোকটা। যে কারণে…।

টেলিফোনের শব্দে সচকিত হলো মাসুদ রানা। থাবা চালাল রিসিভার লক্ষ্য করে। 'ইয়েস!'

'রানা?' সোহেলের কণ্ঠ।

'হ্যাঁ, বল্।'

'তোর বোঁচকার কোন খবর হলো?'

মুচকে হাসল রানা। 'না, দোস্ত। হয়নি এখনও। তবে আজ রাতের মধ্যে কিছু অগ্রগতি হবে আশা করছি।'

'কী মুশকিলে পড়লাম, বল্ দেখি! এতদূর ছুটে এসে এখন বসে বসে আড্ডা দিচ্ছি। শালার কপাল আর কাকে বলে!'

'কাজ কাজ-ই,' গম্ভীর গলায় উপদেশ দিল মাসুদ রানা। 'বড়-ছোট কোনটাই অবহেলার নয়। পাড়তে থাক। দেশে একটা ডিমের দাম তিন টাকা, জানিস তো?'

'সব কিছুতে শালার ঠাট্টা!' রাগে গা জ্বলে গেল সোহেলের। 'আমি এদিকে একে নিয়ে আছি বিপদে! আর তুই…'

'তোর বোঁচকার কথা বলছিস? তবিয়ত কেমন ভদ্রলোকের, বহাল তো?'

'বহাল মানে? জ্বালিয়ে খাচ্ছে ব্যাটা। তিনজনের খাবার একাই খায় প্রত্যেকবেলা। আর পড়ে পড়ে ঘুমায়।'

'তুইও ঘুমিয়ে থাক নিশ্চিন্ত মনে। সময় হলে ডেকে তুলব আমি।'

'বোঁচকা বদলের কোন উপায় পেয়েছিস? মানে, যদি সুযোগ হয় আর কি!'

'পাইনি এখনও। আমার বোঁচকার সন্ধান আগে পেয়েনি, তারপর ভাবব। ফোনের কাছে থাকিস। দেখি রাতে কোন সুখবর দিতে পারি কি না।'

'আচ্ছা।'

ছক একটা তৈরিই ছিল, ওটাকে আরেকটু এদিক-ওদিক করতে হবে, ভাবল মাসুদ রানা। সাজাতে হবে অপ্রত্যাশিত ঘটনাটার সঙ্গে মিল রেখে।

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল জেরি লাটিমার। বিকৃত হয়ে উঠেছে চেহারা। 'ইয়ার্কি করছেন?' প্রায় ভেঙচে উঠল সে প্রফেসরকে লক্ষ করে। 'কোনদিন হবে না মানে?'

অবাক হয়ে কিছুক্ষণ লোকটাকে দেখলেন বিজ্ঞানী। 'আপনি কচিখোকা নন। যা বললাম, তার অর্থ আপনি বোঝেননি, আমার তা মনে হয় না।'

দ্বিধায় পড়ে গেল জেরি। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়ায় লজ্জাও পেয়েছে খানিকটা। 'ঠিক বুঝলাম না, প্রফেসর। সোজাসুজি বলুন, ফর্মুলাটা ডিকোড করা

সম্ভব?'

মাথা দোলালেন বিজ্ঞানী। 'খুব সম্ভব।'

'তাহলে কোনদিন না হওয়ার কথা আসছে কেন?'

'আমি ডিকোড করব না, তাই আসছে।'

'ও, তাই বলুন!' এমন এক ভাব করল সে, যেন ভারমুক্ত হয়েছে এইমাত্র। 'কিন্তু না করে আপনার কোন উপায়ও নেই, ডক্টর।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল জেরি।

'কেন উপায় নেই, কারণটা শোনা যাক।'

'যদি ওটা ডিকোড করে না দেন আপনি,' বসল আবার সে আয়েশ করে। 'আপনাকে তুলে দেয়া হবে স্যানাটোরিয়াম কর্তৃপক্ষের হাতে...বা অ্যাসাইলাম, যাই বলেন। কিন্তু আমার ধারণা আপনি তা চান না, প্রফেসর। নাকি চান?'

'না চাইবার তো কোন কারণ দেখি না আমি। অনেক দিন থেকেছি ওখানে। ওরা আমার ভাল-মন্দ, আরাম-আয়েশের দিকে সব সময় খেয়াল রাখত।' জেরির বিস্মিত মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলেন মারগুব হোসেন। তারপর শুরু করলেন আবার। 'আপনার ভুলটা কোথায় হচ্ছে, আমি বলছি। আপনি ধরে নিয়েছেন আমি মুক্তি চাই, তাই না? ধারণাটা মারাত্মক ভুল। আমি মুক্তি চাই না। স্বাধীনতা চাই না। এই ফর্মুলা আবিষ্কার করার পর আমার ওপর দিয়ে যা বয়ে গেছে, তাতে আমি সম্পূর্ণ ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে গেছি।'

ফর্মুলার ফটোকপি দিয়ে বাতাসে বাড়ি মারলেন তিনি। 'মন উঠে গেছে আমার এর ওপর থেকে। এর এক কানাকড়িও দাম নেই আমার কাছে। এ পর্যন্ত অনেক হুমকির মোকাবেলা করেছি আমি, পরোয়া করিনি। কেউ টলাতে পারেনি আমাকে। এখন এমন হয়েছে, আমি বাঁচলাম কি মরলাম, তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। জীবন আমার কাছে মূল্যহীন। ব্যাপারটা আপনাকে আগে বুঝতে হবে। আমার পছন্দের প্রশ্ন যদি আসে, আমি বরং মৃত্যুকেই বেছে নেব।'

বিস্ফারিত চোখে বিজ্ঞানীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে জেরি। অজান্তেই মুখ হাঁ হয়ে গেছে। আতঙ্কের চিকন ঘাম দেখা দিয়েছে কপালে। প্রফেসরের শান্ত, স্থির চাউনি আরও ঘাবড়ে তুলেছে তাকে। বলে কি লোকটা! প্রাণের মায়া নেই? এ কোন কথা হলো? আরও একটা ব্যাপারে চিন্তিত ও। কখনও অসংলগ্ন কথা বলছে মানুষটা, কখনও বলছে একদম সুস্থ-স্বাভাবিকের মত। মেন্টাল স্টেটের অস্থিতিশীলতার জন্যে ঘটছে ব্যাপারটা, না আর কোন কারণে?

'আমি আপনার মত পাল্টাবার ব্যবস্থা করতে পারি।'

'আচ্ছা! কিভাবে, শুনি?'

দ্বিধায় পড়ে গেল জেরি। ভাবল, এ নিয়ে কথা বলে দেখবে কি না গুন্থারের সঙ্গে। পরে ঠিক করল দরকার নেই। আমিই পারব সামাল দিতে। 'দু'জন সাহায্যকারী আছে আমার,' বলল সে। 'ওদের পুরোপুরি মানুষ বলা যাবে না। কারণ মানুষের মধ্যে কিছুটা হলেও দয়ামায়া থাকে, ওদের তা নেই। ওদের দিয়ে

ফর্মুলা ডিকোড করতে বাধ্য করব আমি আপনাকে।' থেমে প্রফেসরের প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করল জেরি। 'মানবদেহের প্রতিরোধ ক্ষমতার একটা সীমা আছে। চাপের মুখে আগে হোক পরে হোক, ওটা ভেঙে পড়তে বাধ্য। ওরা আপনাকে মত পাল্টাতে বাধ্য করবে, যদি আপনি সহযোগিতা করতে রাজি না হন। কিন্তু আমার মতে সে ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না আপনার। উচিতও হবে না। আপনি মানী-জ্ঞানী মানুষ। কেন অহেতুক…'

'কেউ ভাঙতে পারবে না আমাকে,' কঠিন গলায় থামিয়ে দিলেন তাকে বিজ্ঞানী। 'কোন হুমকিতে কাজ হয়নি, হবেও না।'

'আপনাকে প্রথমেই ধরার কথা ভাবছি না আমি, প্রফেসর। প্রথমে ধরা হবে মিস শিলাকে। কিন্তু আমার মনে হয়, অন্তত মানবিক কারণে হলেও আপনি তা চাইবেন না। যদি চান…লোকটির সঙ্গে এরমধ্যে সাক্ষাৎ হয়েছে মিস শিলার। লোকটা যাকে বলে, কি বলব! ও আসলে মানুষ নয়, জানোয়ার।'

চেয়ারের সঙ্গে মিশে গিয়ে নেই হয়ে যেতে চাইল শিলা ব্রাউন। আতঙ্কে কাঁপুনি উঠে গেছে সারা দেহে। ওর দিকে তাকালেন প্রফেসর। মুখে অভয়ের হাসি। ঘাড় ঘুরিয়ে জেরির মুখোমুখি হলেন।

'আমি চাইলে মিথ্যে কথা বলতে পারতাম, বলতে পারতাম, ওটার কোড ব্রেক করার কোড মনে নেই আমার, ভুলে গেছি কিন্তু আমি তা বলিনি। চাইলে বিশ মিনিটের মধ্যে এই ফর্মুলা ডিকোড করতে পারি, কিন্তু সেরকম ইচ্ছে নেই আমার। কেন নেই, বলছি। দয়া করে মন দিয়ে শুনুন।'

# ছয়

ইউএস অর্ডন্যান্স রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রধান ম্যাক্স অলব্রাইট ছয় ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা বিশালদেহী মানুষ। ঘন লালচে লোমে ঢাকা দেহ। কালো চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। বেলিভেডারের আরেক পেন্টহাউস স্যুইটে উঠেছেন তিনি। এবং হোটেলে পৌঁছার বিশ মিনিটের মধ্যে লেগে গেছেন কাজে।

সিটিংরুমে বৈঠকে বসেছেন ভদ্রলোক। পুলিস চীফ ফ্রেড উইলিয়ামসনের প্রস্তুত চোদ্দ পাতার রিপোর্টটা পড়ছেন। তাঁর সামনে বসা পুলিস চীফ, জ্যাক টার্নার এবং স্থানীয় এফবিআই প্রধান মাইকেল কলিন্স। ওদিকে অলব্রাইটের পিছনে চেয়ারে বসেছেন তাঁর একান্ত সচিব। রিপোর্টটা ছেড়ে ছেড়ে দ্রুত পড়ে গেলেন অলব্রাইট। এরপর টার্নার এবং কলিন্সও চোখ বোলাল ওটায়।

'ওয়েল, জেন্টলমেন,' বললেন তিনি। 'ক্যাপ্টেন উইলিয়ামসনের রিপোর্টে পরিষ্কার বোঝা যায় প্রফেসর মারগুব পালায়নি। তাকে অপহরণ করা হয়েছে। নাকি আপনাদের কোন দ্বিমত আছে?'

মাথা দোলাল সিআইএ, এফবিআই। দ্বিমত নেই।

'হয় তাকে সত্যিই অপহরণ করা হয়েছে, নয়ত বলা যায় না, কার্ল হফারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সে স্বেচ্ছায় চলে গিয়েও থাকতে পারে। কিন্তু কেউ যাতে তা বুঝতে না পারে, সে জন্যে খুব যত্ন করে অন্যভাবে সাজানো হয়েছে সেট্-আপটা,' আর কাউকে নয়, মনে হলো যেন নিজেকে শোনানোর জন্যেই মন্তব্যটা করলেন ওআরআই প্রধান। 'কিন্তু দুর্ভাগ্য যে শেষ পর্যন্ত গোমর ফাঁক হয়ে গেছে, নিজেকে গোপন রাখতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে হফার। চ্যালা-চামুণ্ডাদের ভুলের জন্যে ফাঁস হয়ে গেছে ওর জারিজুরি। আমি বলছি না যে ঠিক তাই ঘটেছে। এটা একটা সম্ভাবনা আসলে, বিবেচনার দাবি রাখে।'

'কিন্তু হফারের মত একজনের সাহায্য কেন চাইতে যাবেন প্রফেসর? বা তার সাহায্যের প্রস্তাবে কেন রাজি হবেন তিনি?' প্রশ্ন করল বিস্মিত জ্যাক টার্নার।

উত্তর দেয়ার আগে একটু ভাবলেন ম্যাক্স অলব্রাইট। 'টু টেল ইউ ফ্র্যাঙ্কলি, জেন্টলমেন, গত দুই বছর মারগুবের ওপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে, যে ভাবে ওর ওপর মানসিক নির্যাতন চালিয়েছি আমরা, তাতে ওর পক্ষে এ কাজ একেবারে অসম্ভব বলে উড়িয়েও দেয়া যায় না। আমি অন্তত উড়িয়ে দেব না। আফটার অল মানুষ তো! তারও তো সহ্যের একটা সীমা আছে। এই নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করতে বহুবার নিষেধ করেছি আমি ওয়াশিংটনকে, শোনেনি ওরা। দিনে দিনে বিষিয়ে তুলেছে তার অন্তর। এই পরিস্থিতিতে সে যদি বাইরের কারও সাহায্য চায়, বা কেউ যদি তাকে মুক্তির প্রস্তাব দেয়, তা গ্রহণ করা তার পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়।'

'কিন্তু মানুষটা মানসিক রোগী। কিসে ভাল, কিসে মন্দ, কি করে বুঝবে সে?' প্রশ্ন করল মাইকেল কলিন্স।

'আমি ডাক্তার নই। তবে এটা বুঝি, মেন্টাল ব্রেক ডাউনের অনেকগুলো স্তর আছে। অগভীর, গভীর। আমার ধারণা মারগুবের রোগটা খুব বেশি গভীর ছিল না। নিজের খারাপ-ভাল বোঝে না এতটা পাগল সে ছিল বলে আমি মনে করি না। হয়তো আমাদের ওপর জেদ করে এ কাজ করেছে মারগুব, যুক্তরাষ্ট্রকে একটা শিক্ষা দেয়ার জন্যে। যদি ওকে ঠেকানো সম্ভব না হয়, কোনদিন হয়তো শুনতে হবে রাশিয়া বা চিনের হাতে পড়েছে মারগুব। বিনে পয়সায় ফর্মুলা এমসিজেড ডিকোড করে তুলে দিয়েছে সে ওদের হাতে।'

'গড!' অস্ফুটে বলল জ্যাক টার্নার। 'এই সম্ভাবনার কথা একবারও মাথায় আসেনি!'

'সে যা-ই হোক। কি হয়েছে কি হয়নি, তা নিয়ে চিন্তা করে নষ্ট করার মত সময় বা সুযোগ কোনটাই এ মুহূর্তে আমাদের নেই। এখন আমাদের সবার আগে দেশের স্বার্থের কথা ভাবতে হবে। জান প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করতে হবে যাতে মারগুবকে কেউ বের করে নিয়ে যেতে না পারে দেশ থেকে। মহাসর্বনাশ হয়ে যাবে তাহলে।' থেমে ঘড়ি দেখলেন অলব্রাইট। পুলিস চীফের দিকে তাকালেন। 'জোনসেন্টের সাথে আলাপটা সেরে নিই আগে। উনি এসেছেন তো?'

'হ্যাঁ, স্যার। লাউঞ্জে অপেক্ষায় আছেন।'

বসের নির্দেশে বেরিয়ে গেলেন একান্ত সচিব। মিনিট পাঁচেক পর অ্যাসাইলামের মালিক এমিলি জোনসেন্টকে নিয়ে ফিরলেন। দুশ্চিন্তায় চেহারা আরও শুকিয়ে গেছে ভদ্রলোকের। মুখের ভাব দেখে মনে হলো নিজেকে তিনি অপরাধী বলে ভাবছেন। 'আসুন, ডক্টর,' আহ্বান জানালেন ম্যাক্স অলব্রাইট। উঠে দাঁড়িয়ে হাত মেলালেন। 'বসুন, প্লীজ!'

'থ্যাঙ্ক ইউ।' বেশ জড়সড় হয়ে বসলেন তিনি।

'আপনাকে ডেকেছি প্রফেসর মারগুব হোসেনের ইদানীংকার আচার আচরণে তেমন কোন পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল কি না জানতে।'

'না, কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি। বরাবরকার মত ছিলেন তিনি, চুপচাপ। একা থাকতে পছন্দ করতেন, কারও সঙ্গে মিশতেন না। কথা প্রায় বলতেনই না। একান্ত প্রয়োজন হলে 'হ্যাঁ না' দিয়ে কাজ সারতেন। ভদ্রলোককে দেখে মনে হত সার্বক্ষণিক শোকে ডুবে আছেন। অথচ যতবারই আমি তাঁর মেন্টাল ডিপ্রেশন চেক করতে গিয়েছি, ততবারই অবাক হতে হয়েছে আমাকে।'

'কেন?'

'কারণ তাঁর মেন্টাল ডিপ্রেশন আছে, এমন কোন প্রমাণ একবারও পাইনি আমি।'

একটু ভাবলেন ওআরআই প্রধান। 'ব্যাপারটা কি মীন করে, যদি একটু বুঝিয়ে বলেন দয়া করে।'

'মানসিক ভারসাম্য ভদ্রলোক হারিয়েছিলেন ঠিকই, তবে ব্যাপারটা তেমন মারাত্মক কিছু ছিল না। তা-ও, অল্প দিনেই কেটে যেত যদি তাঁর সঙ্গে অতীতে রূঢ় আচরণ করা না হত। প্রথমদিকের ভারসাম্যহীনতা সম্ভবত আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছিল তাঁর। শিওর নই আমি, সম্ভবত। আমি নিজে অনেকবার, অনেকভাবে চেষ্টা করেছি ওঁর ডিপ্রেশনের প্রকৃতি জানতে। কিন্তু ডিপ্রেশনের কোন লক্ষণই পাইনি।'

'এর অর্থ কি এই দাঁড়াচ্ছে যে ক্রমে সেরে উঠছিল লোকটা?'

'হ্যাঁ। মেন্টাল শকটা কেটে যাচ্ছিল তাঁর একটু একটু করে।'

টার্নার ও কলিন্স মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। ওআরআই প্রধানের সঙ্গে ডাক্তারের ধারণা মিলে গেছে অনেকটাই। গম্ভীর হয়ে গেছেন অলব্রাইট। অন্যমনস্কের মত নিজের ডান হাতের লোমশ পিঠ পরীক্ষা করছেন। 'অল রাইট, ডক্টর। আপনাকে আর আটকে রাখব না। সময় দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ।'

উঠে দাঁড়ালেন জোনসেন্ট। 'আমি খুব দুঃখিত। যা ঘটে গেল…'

'দুঃখিত হওয়ার কোন কারণ নেই আপনার, ডক্টর,' নরম গলায় বললেন অলব্রাইট। 'এতে আপনার কোন হাত ছিল না আমরা জানি।'

জোনসেন্ট বেরিয়ে গেলেন ধীর পায়ে। যতক্ষণ দেখা যায়, দেখলেন তাঁকে অলব্রাইট। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন। 'প্রফেসর স্বেচ্ছায় কারও সাহায্য নিয়ে পালিয়ে গেছে, কি হফার তাকে অপহরণ করেছে, আমরা জানতে

চাই না। আমরা ধরে নেব তাকে অপহরণই করা হয়েছে। ধরে নেব, কিন্তু বুঝতে দেব না তা কাউকে। ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রেসকে যা বলা হয়েছে, তার কোন পরিবর্তন হবে না। এতে যে সুবিধাটা আমাদের হবে, মারগুবের সাহায্যকারী বা অপহরণকারী যা-ই বলি, ধরে নেবে ভেতরের ব্যাপার আমরা বুঝতে পারিনি। ফলে তার অসতর্ক হয়ে ওঠার চান্স আছে। পাওয়া গেলে চান্সটা আমরা গ্রহণ করব অবশ্যই।'

'যখন আমাকে মাসের পর মাস বন্দী জীবন কাটাতে বাধ্য করা হয়, তখন বিষয়টা নিয়ে আরও গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পাই আমি। আপনার মত মানুষের পক্ষে অনুমান করাও হয়তো সম্ভব নয় যে নতুন কিছু আবিষ্কার করা কতবড় এক চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে আমার মত লোকের জন্যে। যে কাজে বিবেকের সাড়া পাই না, সে কাজ জীবনে কোনদিন করিনি আমি।

'সে যাই হোক, যখনই বুঝলাম আমার নতুন আবিষ্কার পৃথিবীর কেবল উপকারেই আসবে না, বরং প্রচুর ক্ষতিও করবে, তখনই বিবেকের বাধা পাই আমি। সমস্যার ভারে কুঁজো, বুড়ো পৃথিবীর ঘাড়ে নতুন আরেক সমস্যা চাপাতে মন সায় দিল না আমার,' চেয়ারে হেলান দিলেন প্রফেসর মারগুব হোসেন। 'আমি ভালই জানি আমার আবিষ্কারের মূল্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার। কিন্তু টাকা কোন দিনই বড় ছিল না আমার কাছে, আজও নেই। যখন আমি এমসিজেড ফর্মুলা আবিষ্কার করি, তখন রাশিয়া-চিন অবিশ্বাস্য অঙ্কের টাকা অফার করেছিল। আমি নিজের বিবেক বিক্রি করতে রাজি হইনি। এরপর ওরা হুমকি দেয় আমাকে, এখন যেমন আপনি দিচ্ছেন। আমি পরোয়া করিনি। এখনও করি না। যেদিন আমি বুঝব সময় হয়েছে, পৃথিবী আমার আবিষ্কারের ফল ভোগ করার উপযুক্ত হয়েছে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিকভাবে, সেদিন ডিকোড করব আমি ওই ফর্মুলা। তার আগে নয়। এবং অর্থের লোভে কারও কাছে বিক্রিও করব না, সবাইকে দেব আমি ওটা বিনে পয়সায়। যাতে ওই জিনিস দিয়ে কারও ওপর কেউ কোন হুমকি সৃষ্টি করতে না পারে। একের ভয়ে অন্যকে কুঁকড়ে থাকতে না হয়।'

বুক ভরে বাতাস টানল জেরি লাটিমার। তেতো হয়ে গেছে মনটা। 'আমি দুঃখিত, প্রফেসর। কবে আপনার সেই সময় আসবে, তা আপনিই ভাল জানেন। কিন্তু আমি ততদিন অপেক্ষা করতে রাজি নই। হয় আপনি স্বেচ্ছায় ওটা ডিকোড করে দেবেন, নয়ত আমি অন্য ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হব। আপনার এককালের সহকারী মিস্ শিলার ওপর দিয়ে যাবে প্রথম চোটটা। বুঝতেই পারছেন, খুব একটা প্রীতিকর হবে না সেটা।'

'সে তো আগেই শুনেছি,' শিলার চোখে চোখ রেখে অভয়ের হাসি হাসলেন বিজ্ঞানী। 'কিন্তু আমি জানি, আপনার ঘটে যদি সামান্যতম বুদ্ধিও থেকে থাকে, আপনি তেমন কাজ করবেন না।'

'কেন?' অনেকটা চ্যালেঞ্জের সুর ফুটল জেরির কণ্ঠে। 'কেন করব না?'

'করবেন না মানে করতে পারবেন না।'

'কেন পারব না তাই তো জানতে চাইছি।'
'আপনার কথায় বোঝা গেল মস্কোর কাছে আমার মূল্য অনেক, ঠিক?'
মন্ত্রমুগ্ধের মত মাথা দোলাল সে। 'হ্যাঁ!'
'মিলিয়ন মিলিয়ন?'
'মনে করুন তাই। কিন্তু তাতে কি?'
'কত, দশ-পনেরো-বিশ, নাকি পঁচিশ মিলিয়ন?'
'ধরে নিন একটা।'
'বেশ, নিলাম। কিন্তু সেটা তো জীবিত প্রফেসর মারগুব হোসেনের মূল্য, তাই না? মৃত মারগুব হোসেনের নয় নিশ্চই?'
কপাল কুঁচকে উঠল জেরির। 'তার মানে?'
মৃদু হাসি ফুটল বিজ্ঞানীর মুখে। 'মানে এই, যখন আমেরিকা এবং রাশিয়া-চিন আমাকে হুমকি-ধামকি দিতে শুরু করে, তখনই আমি সতর্কতা গ্রহণ করি।' হাঁ করে মুখের ভেতরটা দেখালেন তিনি, তর্জনী দিয়ে বাঁ মাড়ির একটা দাঁত স্পর্শ করলেন। 'এটা নকল দাঁত। এর ভেতরে আছে পটাশিয়াম সায়ানায়িড। জিনিসটা কি জানেন আপনি?'
বিস্ফারিত হয়ে গেল লোকটার দু'চোখ।
'শিলাকে কেউ যদি স্পর্শও করে, দাঁতটায় কামড় দেব আমি। ফল কি হবে, অনুমান করতে পারেন? মুহূর্তে মৃত্যু হবে আমার। যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ আছে, ততক্ষণ আমার মূল্য আছে। প্রাণহীন এ দেহের মূল্য নেই এক কানাকড়িও, তাই না?'
'সায়ানায়িড!' চোখ কপালে উঠে গেছে জেরি লাটিমারের।
'হ্যাঁ, সায়ানায়িড। আমি জানি আপনি বুদ্ধিমান, অত বড় ঝুঁকি আপনি নেবেন না। তাতে যদি উল্টোসিধা কিছু ঘটে যায়, আপনারই বিপদ হবে। আগেই বলেছি, আমি বাঁচলাম কি মরলাম তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই আমার। কাজেই এখন দেখা যাচ্ছে বিপদে আসলে আমি পড়িনি, পড়েছেন আপনি। যদি ঘাঁটানোর চেষ্টা করেন, এক মুহূর্তও দ্বিধা করব না আমি নকল দাঁতে কামড় বসাতে।'
অনেকক্ষণ পর ভাষা খুঁজে পেল জেরি। ক্ষ্যাপাটে দৃষ্টিতে বিজ্ঞানীর দিকে তাকিয়ে থাকল। 'আমি বিশ্বাস করি না!'
'কোনটা বলুন তো?'
'নকল দাঁত…সায়ানায়িড। আমি বিশ্বাস করি না!
'সে আপনার খুশি। সত্যি-মিথ্যে প্রমাণ করার কোন গরজ নেই আমার। শিলাকে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি আমি গুহা ছেড়ে। কেউ যদি বাধা দেয়ার চেষ্টা করে, তার প্রতিফলের জন্যে আপনাকেই দায়ী হতে হবে।'
সিধে হয়ে গেল জেরি। 'শুনুন, প্রফেসর…' থেমে গেল সে তাঁকে উঠে দাঁড়াতে দেখে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডেকে উঠল, 'আলেক্স!'
চেম্বারে ঢোকার মুখে আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল ক্যাগার, ডাকটা কানে আসতে বেরিয়ে এল খোলা জায়গায়। এক টানে মাউজারটা বের করে আনল হোলস্টার

থেকে। কৌতুকপূর্ণ চোখে তাকে দেখলেন বিজ্ঞানী। 'এই চিজের ভয় দেখিয়ে আমাকে আপনি থামাতে পারবেন না, মিস্টার!'

'আপনার চাইতেও অনেক কঠিন সমস্যা এই চিজ দিয়ে সামাল দিয়েছি আমি, ডক্টর। আপনি কোথাও যাচ্ছেন না, আমার কাজটা না হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকছেন, পরিষ্কার? আমি শক্তি প্রয়োগ করতে চাই না। সায়ানায়িডের ব্লাফ দিয়ে সুবিধে করতে পারবেন না আপনি। আমি...'

'ব্লাফ নয়, যা সত্যি তাই বলছি আমি। আগেই বলেছি আমার ওপর হুমকির মাত্রা ক্রমেই বাড়ছে দেখে সতর্কতা অবলম্বন করতে বাধ্য হই আমি। বুঝতে পারি এই আবিষ্কারের জন্যে ভবিষ্যতে আমাকে অপহরণ করা হতে পারে, ফর্মুলা ডিকোড করে দেয়ার জন্যে আমার ওপর অত্যাচার হতে পারে, যে কারণে ওটা করা ছাড়া বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকার আর কোন উপায় আমার ছিল না। শেষ পর্যন্ত আমার সেই আশঙ্কাই সত্য হয়েছে। অপহরণ করা হয়েছে আমাকে, চাপের মুখে নতি স্বীকার করাতে না পারলে নির্যাতন চালানোর জন্যে তৈরি হয়েই আছেন দেখছি আপনারা। হয়তো শিলাকে রেপ করা হবে, একটা একটা করে আমার হাত পায়ের নখ উপড়ে ফেলা হবে। অথবা গরম লোহার ছ্যাঁকা দেয়া হবে আমার দেহে। কিন্তু কাজ হবে না। আজকের এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্যে বহু আগেই প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছি আমি। যদি বিশ্বাস না হয়, পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। আমি রেডি। তবে আপনি তা করবেন বলে আমি মনে করি না। মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার হারাবার ঝুঁকি আপনি নিতে পারবেন না। পারবেন?'

'আপনার চোখের সামনে মিস শিলাকে...'

'ততক্ষণ বেঁচে থাকতে রাজি নই আমি। আমার মত ওকেও যদি কেউ স্পর্শ করে সঙ্গে সঙ্গে নকল দাঁতে কামড় বসাব আমি। তারপর মৃত্যু মাত্র সেকেণ্ডের ব্যাপার। শিলার কি হলো না হলো, তা নিয়ে মৃত মারগুব হোসেনের কোন মাথা ব্যথা থাকবে না। শিলা! চলে এসো।'

এমন অপ্রত্যাশিতভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে ভাবেনি জেরি লাটিমার। তড়াক্ করে আসন ছাড়ল সে। 'পুলিসের হাতে ধরা পড়লে কি পরিণতি হবে আপনার, জানেন?'

'কি হবে? এতদিন যখন ওরা কিছু করতে পারেনি আমার, আজও পারবে না।'

'প্লীজ, ডক্টর! মাথা খাটিয়ে কাজ করুন। ডিকোড করে দিন ফর্মুলা, আপনাকে আজই মস্কো নিয়ে যাব আমি। ওখানে নতুন জীবন শুরু করতে পারবেন আপনি। আকাশছোঁয়া সম্মান, শ্রদ্ধা পাবেন আপনি ওদেশে।'

'ওসব প্রচুর পেয়েছি জীবনে,' আক্ষেপ ফুটল যেন প্রফেসরের কণ্ঠে। 'আর চাই না। শিলা!' দু'পা এগোলেন তিনি। ডান হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন মেয়েটির দিকে। 'এসো! চলে এসো!'

'এক পা এগিয়ে দেখুন,' শান্ত কণ্ঠে বলল আলেক্স ক্যাগার। 'মেয়েটা মরবে। স্রেফ এক পা।'

আগেই উঠে দাঁড়িয়েছে শিলা। কাঁপছে ক্যাগারের অগ্নিমূর্তি দেখে। মনে হচ্ছে হাঁটু ভেঙে পড়ে যাবে এখনই। মুখ ঘুরিয়ে জেরির দিকে তাকাল সে। রাগে টকটকে লাল হয়ে উঠেছে তার চেহারা। ঘামে চকচক করছে সারামুখ। স্থান বদল করল দৃষ্টি, প্রফেসরকে দেখল শিলা। শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন, হাসি হাসি চেহারা।

'আমরা যাচ্ছি,' বললেন তিনি। 'কণ্ঠ শুনে কি আত্মবিশ্বাসী বলে মনে হয় আপনার আমাকে? আমার" কিন্তু হয়।' কাছে গিয়ে মেয়েটির হাত ধরলেন প্রফেসর। 'এসো। ভয়ের কিছু নেই। আমার ওপর, তোমার ওপর অত্যাচার করতে পারে এরা, সে ক্ষমতা এদের আছে। চেহারা যতই মার্জিত হোক,' ইঙ্গিতে জেরিকে দেখালেন, 'মানুষটা যে ভেতরে ভেতরে নিষ্ঠুর কসাই, তা বেশ বুঝি আমি। কিন্তু ঘাবড়াই না। আমাকে বাধা দিতে গিয়ে···উফ্!' বলতে বলতে ক্যাগারকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন প্রফেসর। জেরির নিঃশব্দ ইঙ্গিতে পিস্তলের বাঁট ঘুরিয়ে তাঁর মাথায় মেরে বসল সে। লুটিয়ে পড়লেন প্রফেসর। জ্ঞান হারিয়েছেন।

'ডাক্তারকে ডাকো!' খেঁকিয়ে উঠল জেরি লাটিমার। রুমাল বের করে ডলে ডলে মুখের ঘাম মুছল। 'কোথায় আছে ব্যাটার নকল দাঁত খুঁজে বের করতে বলো। মেয়েটাকে পৌঁছে দাও ওর চেম্বারে।'

নকল দাঁত সত্যিই একটা পাওয়া গেল প্রফেসরের বাঁ দিকের নিচের মাড়িতে। রুমাল পেতে ডাক্তারের হাত থেকে ওটা নিল জেরি লাটিমার। উল্টেপাল্টে দেখে পকেটে রেখে দিল। ভাগ্যিস ঝোঁকের মুখে কথাটা ফাঁস করে দিয়েছিল বোকা প্রফেসর। নইলে সর্বনাশ হয়ে যেত। ওর দুশো ছ'খানা হাড় গুণে গুণে ভাঙত কার্ল হফার এই ব্যাটা কোন অঘটন ঘটিয়ে বসলে।

'এবার বলুন, টেলিফোনে মাসুদ রানা সম্পর্কে কি যেন বলছিলেন কাল?' পুলিস চীফের দিকে তাকালেন ম্যাক্স অলব্রাইট।

'এই লোকটার হঠাৎ এখানে আসা কেমন যেন সন্দেহজনক মনে হয় আমার।'

'কারণ?'

'যে রাতে প্যারাডাইস সিটিতে এল মাসুদ রানা, সে রাতেই প্রফেসর নিরুদ্দেশ হলেন। আমি ভাবছি এরমধ্যে কোন রহস্য আছে কি না।'

কপালে ভ্রূকুটি দেখা দিল ওআরআই প্রধানের 'সেদিনই এসেছে লোকটা, আপনি শিওর?'

'শিওর, স্যার। খোঁজ নিয়েছি আমি।'

'আচ্ছা!'

'মাসুদ রানা বাংলাদেশী, প্রফেসরও বাংলাদেশী। তার আসা আর প্রফেসরের নিরুদ্দেশ হওয়ার ভেতরে হয়তো কোন সংযোগ থাকতেও পারে।'

'যেমন?'

'হ্যারিসন অ্যাসাইলামের নিরাপত্তার দায়িত্ব রয়েছে রানা এজেন্সির ওপর।

পুরো বিষয়টা পূর্ব পরিকল্পিতও হতে পারে।'

অনেকক্ষণ নীরবে ভাবলেন অলব্রাইট। 'মাসুদ রানার অনেক নাম শুনেছি। লোকটা জানি খুব বিশ্বস্ত, দুর্ধর্ষ ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সে যে আসলে কি, জানি না। সবই শোনা। আপনি যা সন্দেহ করেছেন, তা হেসে উড়িয়ে দেয়ার নয়। থাকতে পারে কোন সংযোগ।'

অন্যমনস্কের মত ঘাড় চুলকাতে লাগলেন ফ্রেড উইলিয়ামসন। 'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, স্যার, এর ভেতরে কিছু রহস্য না থেকেই পারে না।'

'ভাল কথা, সন্দেহ যখন হয়েইছে, তখন তা ভঞ্জনের ব্যবস্থা করুন। আছে কোথায় এখন লোকটা?'

'শহরেই আছে, স্যার। উঠেছে এই হোটেলে।'

'গুড। ওর ওপর সার্বক্ষণিক নজর রাখার ব্যবস্থা করুন তাহলে। খোঁজ নিন কোথায় যায়, কি করে। সন্ধের ফ্লাইটে ওয়াশিংটন ফিরে যাচ্ছি আমি। এখানে আমার থাকার কোন প্রয়োজন নেই আর। রাতে প্রফেসরের ব্যাপারে প্রেসিডেন্টকে সরাসরি রিপোর্ট করতে হবে। তখন আপনার সন্দেহের বিষয়টা তাঁকে জানাব আমি। তো···হফার মারগুবকে দেশের বাইরে নিয়ে যেতে পারবে না, এ ব্যাপারে ওয়াশিংটনকে নিশ্চয়তা দেয়া যায়, কি বলেন?' প্রশ্নটা সিআইএ-র উদ্দেশে করলেন ওআরআই প্রধান।

'দেশ নয়,' দৃঢ় আস্থার সঙ্গে বলল লোকটা। 'ওরা তাকে ফ্লোরিডার বাইরে নিয়ে যেতেও সক্ষম হবে না, স্যার।'

'ওয়েল, জেন্টলমেন। উইশ ইউ বেস্ট অভ লাক।'

# সাত

হোটেল বেলিভেডার। সন্ধে গড়িয়ে গেছে অনেকক্ষণ। ও'ডোনিলের আশায় আছে মাসুদ রানা। আসার কথা তার। পায়চারি করতে করতে হঠাৎ করেই মনে জাগল আশঙ্কাটা। স্টোর ডিটেকটিভের মত জেসি কুপারকেও যে কোন মুহূর্তে হত্যা করতে পারে ওরা। সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেয়া যায় না একেবারে।

চট্ করে রিসিভার তুলল মাসুদ রানা। ফোন করল আলতাফকে। মেয়েটির বর্ণনা দিয়ে বলল, '···ঠিকানায় পাবে মেয়েটাকে। নাম জেসি কুপার, কলগার্ল। শিলা ব্রাউনকে যে দু'জন অপহরণ করেছিল জেলগেট থেকে, তাদের চেনে মেয়েটা। ভাবছি স্টোর ডিটেকটিভের মত একেও ওরা হত্যা করতে পারে। তুমি এক্ষুণি যাও, আলতাফ। নিয়ে এসো মেয়েটিকে।'

'জ্বি, ঠিক আছে।'

'দু'চার দিনের জন্যে কোন নিরাপদ স্থানে ওকে সরিয়ে রাখার ব্যবস্থা করো।'

'ঠিক আছে, মাসুদ ভাই। এখনই যাচ্ছি আমি।'

রিসিভার রেখে আবার হাঁটাহাঁটি শুরু করল মাসুদ রানা। ওদিকে ওর ফোনালাপ শুনে পাশের স্যুইটে ঘাম ছুটে গেল জেরি লাটিমারের বিশ্বস্ত অনুচর, ডেভিড গুডনাউর। এ কী আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল! সে তো এই নামের কোন মেয়ের কথা শোনেনি! যারা কাজটা করেছিল, তারাও তো কোন জেসি-ফেসির নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেনি। তাহলে এ ব্যাটা জানল কি করে খবরটা?

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ফোন তুলল ডেভিড, রিঙ করল ক্যাগারের নম্বরে। 'জেসি কুপার নামে এক কলগার্লকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে রাখার জন্যে লোক পাঠানো হয়েছে। প্রফেসরের অ্যাসিসটেন্টকে যে দু'জন তুলে এনেছে জেলগেট থেকে, মেয়েটি নাকি তাদের চেনে। তুমি কিছু জানো এ ব্যাপারে?'

বিস্ময় ফুটল ক্যাগারের কণ্ঠে। 'কই! নাহ্!'

'কিছু বলেনি মাইকেল বা উড?'

'না! কিচ্ছু বলেনি!'

'যাই হোক। এক্ষুণি বেরোও। মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থা করো মেয়েটির। এতক্ষণে হয়তো রওনা হয়ে গেছে লোক।'

'যাচ্ছি। ঠিকানা?'

মাসুদ রানার মুখে শোনা ঠিকানাটা বলল তাকে লোকটা। ওদিকে রিসিভার রেখে চিন্তিত মুখে সেটটার দিকে চেয়ে থাকল ক্যাগার কয়েক মুহূর্ত। তারপর ফোন তুলল। ডায়াল করল ওদের সাহায্যকারী প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সিটির মালিকের নম্বরে। 'মাইকেল আর উড কোথায়?'

'আছে, কেন?'

'এই মুহূর্তে ওদের মেক্সিকো পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করুন,' নির্দেশ দিল ক্যাগার।

'হঠাৎ? ঝামেলা হয়েছে কোন?'

'যা বলছি তাই করুন! প্রশ্ন করবেন না!' খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠল সে। 'এই মুহূর্তে ওদের স্টেটস্ ছাড়া করুন, নইলে বিপদ!'

'আচ্ছা আচ্ছা, আমি দেখছি। চিন্তার কোন কারণ নেই। কিন্তু…ওদের ভাড়ার ব্যাপারটা…?'

অসহ্য রাগে দাঁতে দাঁত চাপল ক্যাগার। কোনরকমে বলল, 'সকালে পাঠিয়ে দেব আমি।'

'আচ্ছা, ধন্যবাদ।'

জায়গামতই পাওয়া গেল জেসি কুপারকে। এটা একটা নাইট অ্যাণ্ড ডে বার। বয়স্ক এক খদ্দেরের সঙ্গে দর কষাকষিতে ব্যস্ত মেয়েটি। লোকটাকে বেশ দ্বিধাগ্রস্ত মনে হচ্ছে। মেয়েটির সঙ্গে যাবে কি যাবে না ভাবছে হয়তো।

আলতাফকে সরাসরি ওদের দিকে এগোতে দেখে জেসিও খানিকটা দ্বিধায় পড়ে গেল। ওর ওপর থেকে চোখ সরাচ্ছে না আগন্তুক। 'হাওয়ায় মিলিয়ে যাও, মিয়া সাহেব,' চাপা কণ্ঠে খদ্দেরটিকে বলল জেসি। 'মনে হয় পুলিস।'

পলকে দ্বিধা কেটে গেল লোকটির। প্রায় দৌড়ে পালাবার সময় একবারও ডানে-বাঁয়ে তাকাল না সে।

'বসতে পারি?' জেসির কাছে এসে মৃদু কণ্ঠে বলল মির্জা।

'কে নিষেধ করেছে?' ঠোঁট উল্টে পানীয়ের গ্লাসে মন দিল মেয়েটি।

বসল ও। 'আপনার সঙ্গে জরুরী কিছু কথা আছে।'

'তাড়াতাড়ি বলে কেটে পড়ুন। আপনাকে দেখে এরমধ্যে একজন খদ্দের ভেগেছে আমার।'

'শিলা ব্রাউনকে চেনেন আপনি, তাই না?'

'হ্যাঁ। চিনি।'

'তাকে যে দু'জন জেলগেট থেকে তুলে নিয়ে গেছে, তাদেরকেও চেনেন!'

'হ্যাঁ। খুব সম্ভব পুলিসের লোক ছিল ওরা।'

মাথা দোলাল আলতাফ মির্জা। 'না।'

'মানে?' মুখের সামনে গ্লাস ধরা হাত থেমে গেল জেসি কুপারের।

দুই মিনিট নিচু কণ্ঠে তার সঙ্গে কথা বলল আলতাফ। দেখতে দেখতে আতঙ্কে নীল হয়ে গেল মেয়েটি। চট করে নেমে পড়ল টুল থেকে। 'চলুন তাহলে। এখানে দেরি করাটা ঠিক হবে না আর।'

রাস্তার ওপাশে নিজের থাণ্ডারবার্ডে বসে ছিল ক্যাগার তৈরি হয়ে। আলতাফের সঙ্গে মেয়েটিকে বেরিয়ে আসতে দেখে মাউজার তুলে গুলি করল সে। নিখুঁত লক্ষ্য। মাঝকপাল ভেদ করে ভেতরে ঢুকে গেল হেভি ক্যালিবার বুলেট। প্রাণ হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল জেসি কুপার। কিছু করার ছিল না আলতাফ মির্জার। চোখের পলকে বিদ্যুৎবেগে হাওয়া হয়ে গেল থাণ্ডারবার্ড।

হোটেল বেলিভেডার। মুখোমুখি বসে আছে রানা ও আলতাফ মির্জা। 'কিছুই করতে পারলাম না, মাসুদ ভাই,' বলল মির্জা। 'এত দ্রুত সবকিছু ঘটে গেল যে···। খুনীকে দেখতেও পাইনি। রাস্তার ওপাশে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে ছিল লোকটা।'

অপলক চোখে যুবককে দেখছে মাসুদ রানা, কিন্তু মন ওর আর কোথাও। কী এক ভাবনায় ডুবে আছে। স্টোর ডিটেকটিভের বেলায়ও ঠিক একই ব্যাপার ঘটেছিল। ভাবছে রানা, কি ভাবে? কেমন করে আগেভাগে টের পেল শত্রু? টেলিফোন ট্যাপিং? নাকি···! 'আমার জন্যে স্যুইট বুক করেছিল কে, তুমি?'

'আমার সেক্রেটারি মেয়েটা,' বলল আলতাফ। 'আপনার ফোন পাওয়ার পর প্রফেসরের ইয়ের প্ল্যানিঙের কাজে ব্যস্ত ছিলাম আমি। ওকে বলেছিলাম বুকিং দিয়ে রাখতে। পরে এসে একবার ঘুরে যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু তা-ও সম্ভব হয়নি।'

সার্ভিসম্যান হকিনসের মন্তব্যটা মনে পড়ে গেল রানার। আরও খানিক মাথা ঘামাল। 'তুমি তাহলে আসোইনি?'

মনে হলো যেন লজ্জা পেয়েছে মির্জা। 'জ্বি না। মানে, সময়···'

'বোঝা গেল।'

'জ্বি?'

উঠে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল মাসুদ রানা। 'কাবাবে হাড়ি ঢুকে পড়েছে বোধহয়।'

আসন ছাড়ল আলতাফও। দু'চোখ ঈষৎ বিস্ফারিত। 'বুঝলাম না।'

'রাখো, বোঝাচ্ছি।' প্রায় দৌড়ে বেডরুমে চলে এল রানা। অনুসরণ করল ওকে আলতাফ। রানার আচরণ দেখে তাজ্জব হয়ে গেছে। এক মিনিট পুরো হওয়ার আগেই বেডসাইড টেবিলের পিছনের ডিভাইসটা আবিষ্কার করে ফেলল রানা। চোখ বড় করে জিনিসটার দিকে চেয়ে থাকল ও, যেন আগে কখনও দেখেনি এই মাল। দেখল আলতাফও। এবং চমকে উঠল ভূত দেখার মত।

'অ্যাঁ...?' শুরু করতে যাচ্ছিল সে, থেমে গেল রানার ইঙ্গিতে। নীরবে সিটিংরুমে ফিরে এল ওরা।

'বুঝলে কিছু?' প্রশ্ন করল মাসুদ রানা।

মাথা দোলাল আলতাফ। 'লিসনিং ডিভাইস!'

'এসো আমার সাথে।' হকিনসের সাথে কথা বলতে হবে।

স্যুইট থেকে বেরিয়ে সার্ভিস এলাকায় এল ওরা। খুঁজে বের করল হকিনস্‌কে। ওদের দেখে ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসল বিশালদেহী নিগ্রো। 'গুড ইভনিং, স্যার!'

'ইভনিং, হকিনস্। আমি চেক ইন করার আগে আমার স্যুইট আমার এক বন্ধু দেখেশুনে পছন্দ করে গেছেন বলেছিলে তুমি, তাই না?'

রানাকে চিন্তিত দেখে অন্য কিছু ভেবে বসল লোকটা। হাসি গায়েব হয়ে গেল মুখ থেকে। 'জ্বি, স্যার। কেন, স্যার? ওখানে কি কোন অসুবিধে হচ্ছে আপনার?'

'না না, কিচ্ছু অসুবিধে হচ্ছে না। জানতে এসেছি, আমার সেই বন্ধুটি কে। নাম জানো তার?'

'জানব না কেন! উনি তো আপনার পাশের স্যুইটেই থাকেন, স্যার!'

চোখাচোখি হলো রানা ও আলতাফের। 'তাই নাকি?' প্রশ্ন করল রানা। 'কি নাম তার বলো তো!'

'মিস্টার জেরি লাটিমার,' বলে এমন ভাবে ওর দিকে তাকাল হকিনস্, যেন এখনই রানার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে খুশিতে।

'জেরি লাটিমার!' ভেতরের বিস্ময় গোপন রেখে নামটা যেন স্মরণ করার চেষ্টা করছে, এমন ভাব করল ও।

'রাইট, স্যার। মিস্টার কার্ল হফারের স্যুইটে আছেন তিনি আপাতত। মানে, ছিলেন আর কি! গতকাল রাতে কোথায় যেন গেছেন, এখনও ফেরেননি।'

কার্ল হফার নামটা কানে যাওয়ামাত্র যেন বিছের কামড় খেয়েছে মাসুদ রানা, এমনভাবে আঁতকে উঠল ভেতরে ভেতরে। মুহূর্তে চিনে ফেলল নাট্যকারকে। কার্ল হফার! নামটা মনে মনে কয়েকবার উচ্চারণ করল ও। 'কার্ল হফার? ভদ্রলোক জার্মান, না?'

'ঠিক, স্যার। মিস্টার লাটিমার তাঁরও বন্ধু।'

'বুঝেছি।'

আরও মিনিট খানেক কথা বলল ও হকিনসের সঙ্গে। তারপর স্যুইটে ফিরে এল গম্ভীর মুখে। কয়েক বছর আগের কথা মনে পড়ল রানার। সিআইএ-র এক সিনিয়র এজেন্ট, ওয়েন প্যাকার একবার পক্ষ বদলের ভান করে পালিয়ে মস্কো চলে গিয়েছিলেন। কিছুকাল ছিলেন তিনি সেখানে। আমেরিকার জন্যে খুব একটা ক্ষতিকর নয়, এমন কিছু তথ্য 'ফাঁস' করে দিয়েছিলেন কেজিবির কাছে। ফলে কেজিবি বিশ্বাস করে তাঁকে, আপন ভাবতে শুরু করে দেয়।

এই সুযোগ পাওয়ার আশাতেই মস্কো গিয়েছিলেন ওয়েন প্যাকার। ফাঁক বুঝে ওয়াশিংটনের জানা প্রয়োজন, ওদের এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতিয়ে নিয়ে পালিয়ে আসেন তিনি রাশিয়া ছেড়ে। ওর মধ্যে কার্ল হফার সম্পর্কিত এমন সব দলিল ছিল, যা যুক্তরাষ্ট্রের হাতে পড়লে নির্ঘাত পঞ্চাশবার মৃত্যুদণ্ড হত তার। সে সময় রাশিয়ার সঙ্গে হফারের বিশেষ সম্পর্ক ছিল। ওই দলিলপত্রের ভয় দেখিয়ে লোকটাকে নিয়মিত ব্ল্যাকমেইল করত ওরা। মস্কোর প্রয়োজন অনুযায়ী নানান তথ্য দিয়ে ওদের প্লাস নিজের উপকার করত হফার।

ওয়েন প্যাকারের পালানোর ব্যাপার টের পেয়ে কেজিবি তার পিছু ধাওয়া করে, সেই সঙ্গে প্যারিসে অবস্থানরত কার্ল হফারকে সতর্ক করে দেয়। দ্বিমুখী ধাওয়ার মুখে পড়ে অসহায় হয়ে পড়েন বৃদ্ধ, অসুস্থ প্যাকার। সেনেগালের মরু অঞ্চলে আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। ইচ্ছে ছিল তথ্যগুলো প্যারিসের সিআইএ-র এক কর্মকর্তা সীন ওয়াটের হাতে তুলে দেবেন। কিন্তু সে পথ রুদ্ধ হয়ে পড়ায় বাধ্য হয়ে মাসুদ রানার সাহায্য প্রার্থনা করেন ওয়েন প্যাকার। সাহায্য করেছিল ও।

অনেক ঘটনা সংঘাতের মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যন্ত তথ্য প্রমাণগুলো ওয়াটের হাতে পৌঁছে দেয় রানা। কিন্তু ওগুলো ওয়াশিংটনে পৌঁছাবার সুযোগ হয়নি ওয়াটের। তার আগেই নিজের বাড়িতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় সে, কাগজপত্রগুলো উধাও হয়ে যায়। কাজটা কার বুঝতে অসুবিধে হয়নি। কিন্তু কিছুই করার ছিল না রানার। পিছনে কোন সূত্র রেখে যায়নি কার্ল হফার।

সিটিংরুমে ফিরে এল ওরা। রানা ঠিক করেছে, ডিভাইসটা যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। ওটা সরাতে গেলে সতর্ক হয়ে যাবে জেরি লাটিমার। পাঁচ মিনিট পর টেলিফোন বেজে উঠল। সাড়া দিল মাসুদ রানা।

'ও'ডোনিল নামে এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, স্যার, বলল রিসেপশনিস্ট।

'ওপরে পাঠিয়ে দিন, প্লীজ।'

পাশের স্যুইটে হেডফোন পরা জেরির বিশ্বস্ত অনুচর রবার্ট গুডনাউ ওদের প্রতিটি কথা শুনল। চোখমুখ কুঁচকে ভাবল সে, হয়ে গেছে। কেস খতম। এখানে বসে থাকা আর নিরাপদ নয়। কারণ সে জানে গুডনাউ কে, কি তার পেশা। টেপ রেকর্ডার এবং হেডফোন একটা ব্যাগে ভরে ফায়ার এসকেপ দিয়ে নীরবে হোটেল

ত্যাগ করল সে। খবরটা জেরিকে জানাবার চেষ্টা করল গুডনাউ, কিন্তু কাজ হলো না। যেখানে ছিল তারা, জায়গাটা ফাঁকা। কেউ নেই। প্রফেসরকে নিয়ে সরে পড়েছে জেরি লাটিমার।

রাত একটার দিকে ফ্লোরিডা ছেড়ে লুইজিয়ানার আকাশে প্রবেশ করল একটা চার্টার বিমান। টাম্পা থেকে শ্রিভিপোর্ট যাচ্ছে ওটা একটা কফিন নিয়ে। বিমান সংগ্রহে একটুও বেগ পেতে হয়নি জেরিকে, কারণ ওই বিমান কোম্পানির মালিক কার্ল হফার। বিনা প্রশ্নে বিমানটিকে ফ্লোরিডা ত্যাগের অনুমতি দিয়েছে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল। অথরিটির সংশ্লিষ্ট বড় অফিসাররা কাজটা করে দেয়ার জন্যে প্রচুর টাকা পেয়েছে অজ্ঞাত এক সূত্র থেকে। টাম্পা থেকে সেই শ্রিভিপোর্ট পর্যন্ত সবাই।

ভোর তিনটের দিকে শ্রিভিপোর্টের এক অখ্যাত প্রাইভেট এয়ার স্ট্রিপে অবতরণ করল বিমানটা। কফিন বহনের জন্যে একটা কালো ভ্যান এবং আরও দুয়েকটা গাড়ি অপেক্ষায় ছিল সেখানে। কফিন এবং মৃতের 'শোকার্ত' আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে গাড়ির বহর অজ্ঞাত স্থানের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল।

হোটেল ছেড়ে বেরুবার পাঁচ মিনিটের মধ্যে টের পেল রানা অনুসরণ করা হচ্ছে ওকে। কালো একটা সেডান, মাঝে বেশ ব্যবধান রেখে পিছু লেগে আছে। গতি কয়েকবার বাড়িয়ে কমিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিল মাসুদ রানা। হ্যাঁ, কোন ভুল নেই। ওকে অনুসরণ করছে সেডান। ভেতরে দুটো মাথা।

কারা ওরা? জেরি লাটিমারের লোক? রানার পিছু নিয়েছে কেন? ওকে হত্যা করার জন্যে? না, আপনমনে মাথা দোলাল মাসুদ রানা, হতে পারে না। হলে এরমধ্যে বেশ কয়েকটা সুযোগ পেয়েছে ওরা। এগিয়ে এসে সহজেই আক্রমণ করার চেষ্টা করতে পারত। তেমন কোন লক্ষণই নেই সেডানের মধ্যে। ভাব দেখে মনে হচ্ছে রানাকে অনুসরণ করবে, অথচ কাছে আসবে না, এমন এক পণ নিয়ে এসেছে যেন ওটা।

তাহলে কে? পুলিস! হ্যাঁ, তাই হবে। কিন্তু ওরা আমার পিছনে কেন? ভাবতে ভাবতে গাড়ি ঘোরাল রানা। আলেক্স ক্যাগারের বাসার ওপর নজর রাখতে যাচ্ছিল ও, মত বদলেছে। লেজ নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে নেই সেখানে। এদের নিজের কাজের ব্যাপারে কিছু জানতে দিতে চায় না রানা। ফেলে আসা পথে তীরবেগে গাড়ি ছোটাল ও। সামনের গাড়ির মতিগতি হঠাৎ পাল্টে যেতে দেখে প্রথমে খানিকটা দ্বিধায় পড়ে গেল সেডান, পরক্ষণেই সামলে নিয়ে ছুটল সে-ও।

মাত্র পাঁচ মিনিটে গাড়িটা খসিয়ে ফেলল মাসুদ রানা। ব্যাক করে সরু একটা গলিতে ঢুকে লাইট অফ করে বসে থাকল। নাকের সামনে দিয়ে হাঁ হাঁ করে ছুটে গেল সেডান দিশেহারার মত। মুচকে হাসল মাসুদ রানা, ইহার নাম কাণ্ডি।

ওদিকে একই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলো আলতাফ মির্জা। একটা মেটে রঙের ফিয়াট রানার ওখান থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে পিছু নিল ওর। ও'ডোনিলের কাছ থেকে ঠিকানা পেয়ে জ্যাক ডজের বাসার ওপর নজর রাখতে

যাচ্ছিল আলতাফ। প্রথমে পাত্তা দিল না ও। কিন্তু, অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে আসার পরও যখন পিছু ছাড়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না পিছনেরটার মধ্যে, তখন গুরুত্বের সঙ্গে ভাবতে লাগল বিষয়টা নিয়ে। ভেতরে দু'জনকে বসা দেখা যাচ্ছে। কারা ওরা? দুই মিনিট পর সিদ্ধান্ত নিল আলতাফ, যারাই হোক, একেবারেই আনাড়ি ব্যাটারা। কারণ মাত্র এক মিনিট ত্রিশ সেকেণ্ড সময় লেগেছে ওর ওটাকে খসাতে।

ঠিক দুই মিনিটের মাথায় বড় রাস্তায় এসে উঠল আলতাফ গলি ছেড়ে। ফিয়াটের চিহ্নও নেই কোথাও। নিশ্চিন্তমনে ম্যাকক্লিফ রোডের দিকে ছুটল ও।

'সে কি!' মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে গেল পুলিস চীফ ফ্রেড উইলিয়ামসনের। 'কেমন করে পালাল? তোমাকে না হাজারবার সতর্ক করেছি যে মানুষটা সাংঘাতিক ধূর্ত? তারপরও কি করে ফাঁকি দিল সে তোমাদের! নিশ্চই বেশি কাছে চলে গিয়েছিলে?'

ভেতরে ভেতরে রেগে উঠল ডিটেকটিভ মরভিন ক্রিস্টেনসেন। হাজারবার কেন, একবারও বলেননি চীফ অমন কথা। একে মাসুদ রানার কাটি খেয়ে মন খারাপ, তারওপর বসের মিথ্যে কথা, গা জ্বলে গেল তার। কিন্তু এ নিয়ে কথা বাড়াতে মন চাইল না। হাজার হোক বস্, তার ভুল ধরিয়ে দেয়াও বিপদ। 'ওর ত্রিশ গজের মধ্যেও যাইনি আমি, চীফ,' কণ্ঠ যথাসম্ভব সংযত রেখে বলল সে।

'তাহলে আর কি কারণ থাকতে পারে তার টের পাওয়ার?'

'মনে হয় বেশিক্ষণ পিছু লেগে থাকার ফলে সন্দেহ করে বসেছে, চীফ।'

'তাহলে এখন?' হতাশ শোনাল বসের গলা।

'ওর হোটেলে গিয়েছিলাম আমি খোঁজ নিতে।'

'কিসের?'

'এমনি। লোকটার গতিবিধি সম্পর্কে কিছু জানা-টানা যায় কি না, তাই।'

'তারপর? কিছু জানা গেল?'

'হ্যাঁ। ঘণ্টাখানেক আগে মাসুদ রানার স্যুইটে ও'ডোনিল নামে এক লোক এসেছিল। ওকে চিনি আমি।'

'ও'ডোনিল? কে সে?'

'ইনফর্মার। আণ্ডারওয়ার্ল্ড সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখে মোটামুটি। কখনও কখনও আমরাও তার সাহায্য নিয়ে থাকি।'

'আই সী!' চিন্তায় ডুবে গেলেন ফ্রেড উইলিয়ামসন। 'মাসুদ রানার কাছে তার এমন কি...।' ঝট করে সিধে হয়ে বসলেন। 'শোনো, কাল রাতে প্যারাডাইস ইনের মালিকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল রানা আর আলতাফ। লোকটা ওদের ক্যাগার-ডজের নাম জানিয়েছে। খুব সম্ভব...খুব সম্ভব...ওদের ঠিকানা,' মাথা দোলালেন তিনি আপনমনে। 'হ্যাঁ, ঠিক তাই। এক্ষুণি যাও, ওই দুই খুনীর বাসার সামনেই পাবে ওদের। কোন ভুল নেই তাতে। জলদি যাও।'

'ইয়েস, চীফ,' ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল মরভিন।

আবার ভাবতে বসলেন চীফ। ভালই হলো, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্যাগার

ও ডজের বাসার ওপর নজর রাখার জন্যে সার্বক্ষণিক ওয়াচ পাঠাতে যাচ্ছিলেন তিনি। রাতে লোক দুটো ফিরে আসতে পারে, এই আশায়। ওরা যদি ওই দুই জায়গায় থেকে থাকে, এক কাজে দুই কাজ হবে।

# আট

পরদিন।

লিউমিনাস ডায়ালে চোখ বোলাল আলতাফ মির্জা। একটা পঁয়তাল্লিশ। ম্যাকক্লিফ রোডের আবছা অন্ধকারমত এক জায়গায় গাড়িতে বসে আছে সে। পাশে এজেন্সির আরেক এজেন্ট, সাদেক, ওর রিলিভার। গতকাল সারারাত এখানে বসে ছিল আলতাফ, কাজ হয়নি। দেখা পায়নি জ্যাক ডজের।

ওদিকে বেলভিড অ্যাভিনিউতে আলেক্স ক্যাগারের ফ্ল্যাটের ওপর চোখ রেখে রাত কাটিয়েছে মাসুদ রানা। ফেরেনি সে-ও। খামোকা বসে থাকাই সার হয়েছে। ভোরের দিকে অন্য দু'জনের ওপর নজর রাখার দায়িত্ব দিয়ে যার যার ডেরায় ফিরে গিয়েছিল রানা ও আলতাফ। মিনিট পনেরো আগে রিলিভার দু'জন প্রায় একই সঙ্গে যোগাযোগ করেছে ওদের সঙ্গে। শিকার দুটোই ফিরে এসেছে।

মাসুদ রানা ছুটেছে ওর জায়গায়, আলতাফ এখানে। নজর তার গজ পঞ্চাশেক দূরের বত্রিশ নম্বর অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের সাততলায়। জ্যাক ডজের আখড়া ওটা। আলো জ্বলছে ভেতরে। আলতাফের গাড়ির কয়েক গজ পিছনে রিলিভার সাদেকের গাড়ি দাঁড়িয়ে। আলতাফ আসার পর চলে যাওয়ার কথা তার, কিন্তু যায়নি। এরকম মুহূর্তে স্থান ত্যাগ করার ইচ্ছে নেই তার। বলা যায় না, জরুরী কোন পরিস্থিতি দেখা দিলে তাকে দরকার হতেও পারে। তাই রয়ে গেছে সে।

আবার ঘড়ি দেখল আলতাফ। একটা ঊনপঞ্চাশ। একটা মেয়েও আছে ডজের সঙ্গে, সাদেক জানিয়েছে ওকে। মেয়েটি কে হতে পারে ভাবছে আলতাফ। ঘুমিয়ে পড়েছে শহর। মিনিটের পর মিনিট পেরিয়ে যাচ্ছে, আলো জ্বলছে ডজের ঘরে। লোকটা কি আবার বেরুবে, নাকি…?

ওদিকে নিজের বিলাসবহুল সিটিংরুমের দামী সোফায় আধশোয়া হয়ে বসে আছে জ্যাক ডজ। মনটা বেজায় খুশি। হাতের কাজ আপাতত শেষ। প্রফেসরকে জায়গামত পৌঁছে দিয়ে এসেছে তারা। বিনিময়ে পেয়েছে মোটা বখশীশ। অনেক মোটা। ফেরার পথে টাকাটা খরচ করার একটা উপায় বের করে ফেলেছে সে।

মেক্সিকো যাবে জ্যাক ডজ। কয়েকদিন বেড়িয়ে আসবে। ও দেশের অনেক নাম শুনেছে সে, মেয়ে নাকি খুব সস্তা ওখানে। দেখতে চায় কেমন সস্তা। সঙ্গে ক্যাগারকেও নিয়ে যাবে ভেবেছিল ডজ, কিন্তু রাজি হলো না ব্যাটা। ও একটা যাচ্ছেতাই। রস-কষ বলে কিচ্ছু নেই। কুছ্ পরোয়া নেই, একাই যাবে জ্যাক

ডজ।

মনের আনন্দে গুনগুন করে গান ধরল সে। ডান হাতে থেকে থেকে তাল ঠুকছে সোফায়। বাঁ হাতে তরল পদার্থ ধরা একটা হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ, মারফি ম্যাডেলিনের খোরাক। ঘন সন্নিবেশিত সবুজ দুই কুঁতকুঁতে চোখে প্রায় জোড়হাতে সামনেই দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটিকে দেখছে সে। কালো রঙের স্বচ্ছ, খাটো একটা নাইট ড্রেস পরে আছে মারফি, সারা গা দেখা যায় পরিষ্কার। নিচে সোনালী জাঙ্গিয়া। চোখ ভরা পানি তার। দেহ কাঁপছে থর থর করে। আপাদমস্তক ঝাঁকি খাচ্ছে থেকে থেকে।

ওর ডোজ দিতে ইচ্ছে করেই দেরি করছে জ্যাক ডজ। দেয়ার কথা ছিল আরও দুই ঘণ্টা আগে। সঙ্গেই ছিল সব, ইচ্ছে করলে ফেরার পথে দিতে পারত ডজ। কিন্তু দেয়নি। খানিকটা রগড় করার ইচ্ছে হয়েছে। দেখতে চায় কতক্ষণ সহ্য করতে পারে মারফি। একটু একটু করে কাঁপুনি বাড়ছে মেয়েটির, খিঁচুনির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। নাক টানছে ঘন ঘন। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই জ্যাক ডজের।

'চালিয়ে যাও, চালিয়ে যাও!' হাসতে হাসতে বলল সে। 'এত তাড়াহুড়ো কিসের?'

'প্লী-ই-জ, ডজ! আমি···আমি আর সহ্য করতে পারছি না!'

'পারবে পারবে। এতক্ষণ যখন পেরেছ, আরও পারবে। হাঁটু গেড়ে বেড়ালের মত বোসো মেঝেতে। তারপর করুণ সুরে ভিক্ষে চাও। হয়তো তাতে দয়া জাগতে পারে আমার মনে।'

ঝাপ্‌সা চোখে কয়েক মুহূর্ত লোকটাকে দেখল মারফি। তারপর বসে পড়ল নির্দেশমত। নাকি সুরে, কান্না ভেজা কণ্ঠে তার দয়া প্রার্থনা করতে লাগল। সন্তুষ্ট চিত্তে তার দিকে তাকিয়ে থাকল জ্যাক ডজ।

'আমার মনে হয় চেষ্টা করলে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে পার তুমি। কি বলো? যে কাজ আস্তে ধীরে হয়, তা ভাল হয়, বুঝলে? কোন কাজেই তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়।' সিরিঞ্জটা লোফালুফি করতে লাগল সে।

চোখে রাজ্যের প্রত্যাশা নিয়ে ওটার উত্থান-পতন দেখছে মারফি। গোঙাচ্ছে। 'প্লী-ই-জ, ডজ! আমি···আমি মরে যাবো! দয়া করো! তুমি যা···করতে বলবে···আমি তা-ই করব। প্লী-ই-জ, ডজ!'

'নতুন কী-ই বা আর করতে পার তুমি? করার বাকি আছেটা কি? একটা মেয়ের পক্ষে যা যা সম্ভব, তার সবই তো করেছ তুমি আমার জন্যে। ও নিয়ে ভেবো না, আমি তোমার পারফরমেন্সে খুব সন্তুষ্ট।'

'ডজ···!'

'হলো না,' হাসতে হাসতে মাথা দোলাল সে। 'আরও করুণ হতে হবে সুর। আরও করুণ। চালিয়ে যাও, দেখতে দারুণ লাগছে তোমাকে।'

চোখ আর নাকের পানি এক হাতে মুছে নিয়ে আবার শুরু করল মারফি। এখন আগের চেয়ে ঘন ঘন ঝাঁকি খাচ্ছে দেহ। চেষ্টা করেও হাত-পা নিজের

নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না মেয়েটি, কুঁকড়ে আসছে বারবার।

'এইবার জোরে জোরে ফ্লোরে মাথা ঠুকতে থাকো। গুণে গুণে দশবার।'

হুকুম পালন করার জন্যে প্রস্তুত হলো মেয়েটি, এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। জঘন্য একটা গালি বেরুল ডজের কণ্ঠ থেকে। সিরিঞ্জটা সেন্টার টেবিলে রেখে ওটারই আরেক মাথায় রাখা ফোনের রিসিভার তুলল। মাউথপীস চেপে ধরে মারফিকে বলল সে, 'থেমো না। ঠুকতে থাকো মাথা জোরে জোরে। কথা শেষ করে ভেবে দেখব তোমার ব্যাপারটা। হ্যালো!' পরমুহূর্তে জমে গেল সে ও প্রান্তের কণ্ঠ এবং তার বক্তব্য বুঝতে পেরে।

'তৈরি হয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে পড়ো,' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল আলেক্স ক্যাগার। 'আধ ঘণ্টার মধ্যে ওয়াটারফ্রন্টে পৌঁছতে হবে। এর মধ্যে না এলে পাবে না আমাকে। রওনা হয়ে যাব আমি।'

'বুঝলাম না! কোথায় রওনা হয়ে যাবে? হয়েছে কি?'

'অত কথার সময় নেই!' খেঁকিয়ে উঠল ক্যাগার। 'এদিকে সব জানাজানি হয়ে গেছে। যে কোন মুহূর্তে ধরা পড়ে যেতে পারি আমরা। জলদি করো। জানে বাঁচতে চাইলে হাত-পা চালাও। খবরদার! ওই ছুঁড়িকে সঙ্গে নিয়ে এসো না যেন আবার।' দড়াম করে রিসিভার রেখে দিল ক্যাগার।

কয়েক সেকেণ্ড নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকল জ্যাক ডজ। কিছুই পরিষ্কার বোঝা গেল না। কেবল এইটুকু বোঝা গেছে, পালাতে হবে। এবং এক্ষুণি। কেন, তা পরে জানলেও চলবে। ক্যাগারের কণ্ঠে আতঙ্ক টের পেয়েছে ডজ, আপাতত ওটাই যথেষ্ট। মাথা কাজ শুরু করে দিল তার। রিসিভার রেখে মুখ ঘোরাল ডজ। কি কি নেবে সে সঙ্গে?

পরক্ষণে মেজাজ বিগড়ে গেল। নির্দেশ অমান্য করে সিরিঞ্জের দিকে হাত বাড়িয়েছে মারফি ম্যাডেলিন। এই ধরল বলে! তড়াক করে আসন ছাড়ল জ্যাক ডজ। পাশ থেকে মেয়েটির বুকের খাঁচায় ভয়ঙ্কর এক লাথি মেরে বসল। উড়ে গেল মেয়েটি, ওপাশের এক সোফার ওপর আছড়ে পড়ল দড়াম করে। ব্যথায় কাতরে উঠল আর্তস্বরে। রেগে গেলে মাথায় রক্ত উঠে যায় ডজের। হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। এবারও তাই ঘটল।

সিরিঞ্জটা তুলেই দরজা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল সে খুদে বোমার মত বিস্ফোরিত হলো জিনিসটা। ভেতরের তরল পদার্থটুকু দরজার গা বেয়ে গড়িয়ে নামতে লাগল। ফলাফল দেখার জন্যে অপেক্ষা করল না জ্যাক ডজ, একছুটে বেডরুমে এসে ঢুকল। ক্লজিটের ওপর থেকে সুটকেসটা নামিয়ে বিছানার ওপর রাখল সে। ভাল ভাল কয়েক সেট জামা কাপড় ভরল ওতে ঝটপট।

তারপর ওয়্যারড্রোবের একটা ড্রয়ার খুলে ভেতর থেকে নিজের পাসপোর্ট আর সঞ্চিত টাকা-পয়সা বের করে পকেটে ভরল। পিস্তলটা কোথায়? ও হ্যাঁ, ওটা সিটিংরুমে আছে। মনে আছে ডজের, ঘরে ফিরেই ওটা হোলস্টার থেকে বের করেছিল সে। সুটকেসের ডালা আছড়ে বন্ধ করল ডজ। তালা লাগাল। তারপর ওটা নিয়ে দৌড়ে ফিরে এল সামনের ঘরে। দ্রুত এদিক ওদিক তাকাল ডজ।

কোথায় গেল জিনিসটা?

সোফায় বসা মারফির সামনে দিয়ে রুমের ও প্রান্তের ককটেল বারের দিকে ছুটল ডজ। মনে হচ্ছে ওখানেই রেখেছে সে ওটা। কিন্তু নেই, পাওয়া গেল না। আরেক জঘন্য গালি বেরুল গলা দিয়ে। কী মুশকিল! কোথায় যে রাখলাম...। ফায়ারপ্লেসের ওপর, রেকর্ড প্লেয়ারের ওপর, এখানে-সেখানে সর্বত্র হন্যে হয়ে জিনিসটা খুঁজে বেড়াতে লাগল জ্যাক ডজ। একই সঙ্গে ঝড়ের বেগে গালাগাল করছে নিজেকে। মনের মধ্যে থেকে কে যেন বারবার সতর্ক করছে তাকে, জলদি পালাও! সময় নেই। জলদি পালাও!

'কোথায় যাচ্ছ?' শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইল মারফি। সোফায় জড়সড় হয়ে বসে আছে সে। চাউনিটা যেন কেমন।

'চুপ থাক, মাগী!' চেঁচিয়ে উঠল জ্যাক ডজ। উবু হয়ে সোফার নিচে, পিছনে চোখ বোলাতে বোলাতে আনমনে বলল, 'গেল কোথায় পিস্তলটা?'

'পিস্তল?'

'হ্যাঁ।'

'ওটা এখন আমার কাছে।'

কাঁধ-পিঠের পেশী শক্ত হয়ে গেল জ্যাক ডজের। মেয়েটির কণ্ঠে কিছু একটা আছে, শুনে বুক কেঁপে উঠল তার। ধীরে ধীরে ঘাড় ঘোরাল ডজ, মারফির চোখে চোখ রাখল। দেখল পিস্তলটা দু'হাতে তার দিকে ধরে আছে মেয়েটি। উঠে দাঁড়িয়েছে সে এর মধ্যে। হাত কাঁপছে, সর্বাঙ্গ কাঁপছে। বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করে উঠল ডজের। মুহূর্তে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে জিভ। সম্মোহিতের মত অস্ত্রটার দিকে চেয়ে আছে সে পলকহীন।

জীবনে এমন ঘটনা এই প্রথম। কেউ কোনদিন তার দিকে পিস্তল ধরেনি। ধরার সুযোগ পায়নি। গুলি খাওয়ার আগে অন্যেরাই চিরকাল তাকিয়ে দেখেছে তার অস্ত্র। আর আজ দেখতে হচ্ছে ডজকে। খুদে ব্যারেলের মৃত্যু গহ্বরে নিজের সর্বনাশ দেখতে পেল সে। সারাদেহে তীব্র আতঙ্কের ঢেউ বয়ে গেল ডজের। নড়তে পারছে না। দু'পা পেরেক দিয়ে মেঝের সঙ্গে আটকে দিয়েছে যেন কেউ।

'দাও ওটা!' গলায় কঠোরতা ফোটাবার চেষ্টা করল ডজ যথাসাধ্য। কিন্তু কণ্ঠ বিশ্বাসঘাতকতা করল। ভাঙা গলায় আতঙ্ক ছাড়া আর কিছুই ফুটল না।

দ্রুত মাথা ঝাঁকাল মারফি ম্যাডেলিন। চোখ দিয়ে পানি পড়ছে দরদর করে। ভেজা গাল দুটো চিকচিক করছে আলো লেগে। পায়ে পায়ে পিছিয়ে গেল সে ডজের কাছ থেকে। 'আমি আমার ফিক্স চাই, ডজ,' সাপের মত হিসিয়ে উঠল মেয়েটি।

মনে করার চেষ্টা করল ডজ, পিস্তলের সেফটি ক্যাচ অন করে রেখেছিল কি না। যদিও তা কখনও করে না সে। তবু, যদি আজ মনের ভুলে...এক লাফে ওর কাছে গিয়ে যদি...না। ঝুঁকি নিতে রাজি নয় জ্যাক ডজ। সাহস নেই। সে যেমন হিংস্র, তেমনি ভীরু। কাপুরুষ। এ ধরনের কাজ ক্যাগারকে সাজে, তাকে নয়।

'আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে,' আতঙ্ক চেপে রাখার চেষ্টা করল ডজ। 'আমি

নিয়ে আসছি। একটু অপেক্ষা করো। শান্ত হও। ওটা…ওটা নামাও।'

শুনতে পায়নি যেন মারফি। আবার বলল, 'আমি আমার ফিক্স চাই, ডজ। ফিক্স চাই, আমার ফিক্স।'

যদি, ভাবল জ্যাক ডজ, ওকে ধানাই-পানাই কিছু একটা বুঝ দিয়ে লাউঞ্জ অতিক্রম করে কোন রকমে লবিতে চলে যাওয়া সম্ভব হয়, তাহলে…। হারামজাদী ভাববে সে নতুন সিরিঞ্জ আনতে যাচ্ছে। এই ফাঁকে লিভিংরুমের দরজা বন্ধ করে পালিয়ে যেতে পারবে ডজ। রাগের মাথায় সিরিঞ্জটা ভেঙে ফেলার জন্যে নিজেকে অভিসম্পাত দিতে লাগল সে। ঘরে বাড়তি নেই। থাকলে সহজেই সামাল দেয়া যেত পরিস্থিতি।

'ঠিক আছে। এক্ষুণি নিয়ে আসছি আমি। দু'মিনিট অপেক্ষা করো, কেমন? লক্ষ্মী মেয়ে। আমি যাব আর আসব।' সুটকেসটা তুলে নিল জ্যাক ডজ। প্রায় পা টিপে টিপে লবির দিকে চলল, যেন একরাশ ডিমের খোসার ওপর দিয়ে হাঁটছে সে।

হাতের পিঠ দিয়ে চোখ-নাকের পানি মুছল আবার মারফি ম্যাডেলিন। তারপর চেঁচিয়ে উঠল। 'সুটকেস রেখে যাও!'

চট্ করে থেমে পড়ল ডজ। ছেড়ে দিল সুটকেসটা। 'হলো কি তোমার?' দাঁত বের করে হাসির ভঙ্গি করল সে। কুঁতকুঁতে সবুজ দুই চোখের দৃষ্টি অস্থির। 'ফিক্স আনতেই তো যাচ্ছি আমি তোমার জন্যে।'

'জাহান্নামে যাচ্ছ তুমি, শুয়োরের বাচ্চা!' পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠল মারফির থরথর করে। 'আমাকে ফেলে পালাচ্ছ তুমি!' অস্ত্রটা ডজের মাথা লক্ষ্য করে তুলল সে।

'আরে না, পালাব কেন! তোমাকে নিয়েই যাব। কিন্তু তার আগে তোমার ফিক্সের ব্যবস্থা…' মেয়েটিকে ভীষণভাবে ঝাঁকি খেতে দেখে আঁতকে উঠল ডজ। সম্ভবত ঝাঁকির কারণেই ট্রিগারে চাপ লেগে গেছে, বিকট শব্দে গর্জে উঠল পিস্তল। ডজের মাথার ওপর দিয়ে গিয়ে পিছনের দরজার নরম দেহে বিঁধে গেল বুলেটটা। 'মারফি! ওটা নামাও…পিস্তল নামাও! আঙুল সরাও ট্রিগার থেকে!' চেঁচিয়ে উঠল সে।

ডজের আতঙ্ক দেখল মেয়েটি। বুঝে ফেলল কোণঠাসা করতে পেরেছে সে জানোয়ারটাকে। ওর জীবন-মৃত্যু এখন তারই হাতে। দেহে স্বস্তির পরশ বয়ে গেল মারফির। আনন্দে হেসে উঠতে ইচ্ছে হলো শব্দ করে। এতদিন অনেক অপমান, বেইজ্জতি আর নোংরামি সহ্য করতে হয়েছে তাকে ডজকে খুশি রাখার জন্যে। কিন্তু আর না। আজ সব কিছুর প্রতিশোধ নেবে সে।

'মারফি, প্লী-ই-জ! অস্ত্র নামাও। আবার গুলি বেরিয়ে যেতে পারে।'

'হাঁটু গেড়ে কুকুরের মত বোসো!'

'অ্যাঁ!' চোখ বড় হয়ে গেল লোকটার। 'কি?'

আবার কেঁপে উঠল মারফি। সশব্দে আঁতকে উঠেই ঝপ্ করে বসে পড়ল ডজ চার হাত-পায়ে। চেহারা বিকৃত করে দেখছে মেয়েটিকে।

'মাথা ঠোকো মেঝেতে। জোরে জোরে।'

ভয়ঙ্কর রাগে অস্থির হয়ে উঠেছে জ্যাক ডজ। কিন্তু মনে মনে তড়পানো ছাড়া কিছু করার নেই। একটু এদিক-ওদিক হলেই···ওদিকে ক্যাগার হয়তো চলেই গেল ওকে রেখে।

ধমকে উঠল মারফি। 'হারি আপ্, বাস্টার্ড!'

ঠক্ ঠক্ করে মেঝেতে মাথা ঠুকতে শুরু করল ডজ। রাগে, দুঃখে পানি এসে গেছে তার চোখে। মিনিট পাঁচেক ক্রমাগত মাথা ঠুকল সে। 'হয়েছে?'

বাঁ হাতে তাকে উঠে দাঁড়াতে ইঙ্গিত করল মারফি ম্যাডেলিন। অনেকটা রোবটের মত লাগছে এখন ওকে। মনে হয় ইঞ্জেকশন নেয়ার গরজ এখন নেই তার, ভুলে গেছে নেশার কথা।

'দেখ, মারফি, যা হওয়ার হয়ে গেছে। আমি খুব দুঃখিত। যেতে দাও আমাকে, এক্ষুণি তোমার জন্যে নতুন ফিক্সের ব্যবস্থা করতে হবে। আর দেরি করা ঠিক হবে না।'

'ঠিক। আর দেরি করা ঠিক হবে না।' ডজের চোখ সই করে পিস্তল তুলল মারফি।

'অ্যাই! করো কি, করো কি!! গুলি···'

নিজেকে স্থির রাখার কসরত করতে করতে ট্রিগার টেনে দিল মেয়েটি। ডজের ডান চোয়াল ভেদ করে ভেতরে ঢুকে গেল বুলেট। একটা পাক খেয়ে দড়াম করে আছড়ে পড়ল সে। গলা ঘাড় বেয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছে টের পেয়ে হাত-পায়ে খিল ধরে এল ডজের। ওরই মধ্যে প্রাণের দায়ে পড়িমরি ছুটল দরজার দিকে। আবার গুলি করল মারফি। ডজের দুই শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে কেউ যেন উত্তপ্ত লোহার শিক ঢুকিয়ে দিল, চেঁচিয়ে উঠল সে আর্ত স্বরে। বুলেটের ধাক্কায় দৌড়ের গতি আরও বেড়ে গেল।

পানিতে ঝাপসা হয়ে গেছে দৃষ্টি, ঠিকমত দেখতে পাচ্ছে না জ্যাক ডজ। কিভাবে দরজা খুলল, বলতে পারবে না সে। সবে এক পা রেখেছে লবিতে, এই সময় তৃতীয় বুলেট আঘাত করল। উবু হয়ে চার হাতপায়ে বসে পড়ল জ্যাক ডজ। সমানে গল্‌গল্ করে রক্ত বেরুচ্ছে ক্ষতগুলো থেকে। আহত কুকুরের মত এপাশ ওপাশ মাথা দোলাচ্ছে লোকটা। মেঝেতে এরই মধ্যে ছোটখাট একটা পুকুর জমে উঠেছে রক্তের।

কাঁপতে কাঁপতে, ঝাঁকি খেতে খেতে তার পিছনে এসে দাঁড়াল মারফি ম্যাডেলিন। হাঁটু গেড়ে বসে অকথ্য অশ্রাব্য ভাষায় বিরতিহীন গালাগাল করতে লাগল ডজকে, ঠিক যে ভাষায় হাঁটতে-চলতে তাকে এতদিন গালাগাল করেছে সে। এক সময় দেহের ভার ধরে রাখার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলল জ্যাক ডজের পেশীবহুল হাত দুটো। আহত গাল নিয়ে রক্তের পুকুরে মুখ থুবড়ে পড়ল সে। আবার পিস্তল তুলল মারফি। নলটা ডজের মাথার পিছনে ঠেকিয়ে গুলি করল। তারপর অস্ত্র ফেলে কাঁদতে বসল।

ওদিকে প্রথম বুলেটের শব্দে ঝট্ করে সিধে হয়ে বসল আলতাফ মির্জা।

সাদেকের সঙ্গে চোখাচোখি হলো। মুহূর্তে দু'জনের হাতই পৌঁছে গেল দরজার হাতলে। দেরি না করে নেমে পড়ল ওরা। নির্জন পেভমেন্টে জুতোর আওয়াজ তুলে দ্রুত পা বাড়াল অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের দিকে। সাদেকের গাড়ির গজ বিশেক পিছনে আরেকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল।

ওটা থেকে নামল আরও দু'জন। এরা পুলিসের লোক। চোখে পড়েনি আলতাফ বা সাদেকের। একজন ডিটেকটিভ, অন্যজন সার্জেন্ট। সামনের দু'জনকে অনুসরণ করে চলল তারা। কয়েক পা এগোতেই দ্বিতীয় গুলির আওয়াজ এল। ঝেড়ে দৌড় লাগাল আলতাফ ও সাদেক, দেখাদেখি পিছনের দু'জনও। লিফটে পা রেখেই দরজা বন্ধ করে দিল আলতাফ। দুই পাল্লা লেগে যাওয়ার আগ মুহূর্তে পিছনের দু'জনকে দেখতে পেল সে পলকের জন্যে। লবিতে পৌঁছে গেছে, চেঁচিয়ে দরজা বন্ধ করতে নিষেধ করছে।

পাত্তা দিল না আলতাফ। মৃদু ঝাঁকি খেয়ে রওনা হয়ে গেল লিফট। এই সময় আবারও গুলি হলো। সাততলায় উঠে থেমে দাঁড়াল লিফট। দরজা পুরোপুরি খোলার আগেই হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল ওরা। হাতে বেরিয়ে এসেছে যার যার অস্ত্র। জ্যাক ডজের বন্ধ দরজায় নক্ করল আলতাফ, পাশ থেকে ওকে কাভার করছে সাদেক। নক্ করেই ছিটকে সরে এল আলতাফ, কারণ একই সঙ্গে শেষবারের মত গর্জে উঠেছে মারফির পিস্তল।

গুলিটা ওদের লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয়নি বুঝতে পেরে আবার এগোল সে অস্ত্র কোমরে গুঁজে। কয়েক পা পিছিয়ে ছুটে এসে কাঁধ দিয়ে দড়াম করে আছড়ে পড়ল বন্ধ দরজার ওপর। ভয়ঙ্করভাবে কেঁপে উঠল দরজাটা, কিন্তু খুলল না। আবার পিছিয়ে গেল আলতাফ। দৌড় শুরু করতে যাবে, এমন সময় পিছন থেকে কে একজন হেঁকে উঠল, 'কি হচ্ছে এখানে?'

ঘুরে তাকাল ওরা। লিফট থেকে বেরিয়ে আসছে দুই পুলিস। চেহারা দেখে মনে হয় রেগে আছে তারা ওদের ওপর। এক মিনিট পর দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকল ওরা। কান্নার আওয়াজ আসছে ভেতর থেকে। কাঁদছে কোনও মেয়ে। ইনার লবির বাঁক ঘুরতেই রক্তের পুকুরে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা জ্যাক ডজের মৃতদেহের ওপর চোখ পড়ল সবার। মাথার তালু প্রায় পুরোটা উড়ে গেছে তার। দৃশ্যটা ভয়াবহ।'

তার পাশেই মেঝেতে মুখ গুঁজে কাঁদছিল মারফি ম্যাডেলিন। পায়ের শব্দে উঠে বসল সে। ওদের দেখে আরও জোরে কেঁদে উঠল। 'প্লীজ…হেলপ্ মি! আ'য়্যাম আ জাঙ্কি! প্লীজ, হেলপ্ মি। প্লীজ…
প্লী-ই-জ!'

বেলভিউ অ্যাভিনিউ। আলেক্স ক্যাগারের অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের সামনে গাড়িতে বসে আছে মাসুদ রানা। পাশে ওর রিলিভার, হাসিব। ওদের সতর্ক নজর সেঁটে রয়েছে সামনের সুউচ্চ এক অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের টপ ফ্লোরে। এ তল্লাটের কোন ঘরেই আলো জ্বলছে না, জ্বলছে কেবল ওই ফ্লোরে।

হাসিবের মতে পনেরো মিনিট আগে ঘরে ফিরেছে আলেক্স ক্যাগার। একা। খবর পেয়ে রানা পৌঁছেছে সাত-আট মিনিট পরে। পাহারায় না থাকলেও দিনটা আজ গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যয় করেছে ও। কার্ল হফারের সাম্প্রতিক মুভমেন্ট সম্পর্কে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছে ও বিভিন্ন সূত্র থেকে। এবার আজ আর পথে কোন ঝামেলা হয়নি। পিছু লাগেনি কেউ। সোজা চলে এসেছে রানা। কি করছে ক্যাগার? ভাবল ও, পেটপুজো? না বিছানায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে? যা-ই করুক, বেশি সময় লাগার কথা নয়। পরিশ্রান্ত হয়ে ফিরেছে নিশ্চয়ই, এখন বিশ্রাম···।

ভাবনার খেই হারিয়ে ফেলল মাসুদ রানা। হঠাৎ করেই গাড়িটার ওপর চোখ পড়েছে। ওদের পঞ্চাশ-ষাট গজ পিছনে, চওড়া অ্যাভিনিউর ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে ওটা। হলপ করে বলতে পারে রানা, একটু আগেও ছিল না গাড়িটা। তার মানে কি এখনই এসেছে? কই, আলো···আলো নিভিয়ে এসেছে? পুলিস! ভাল করে আয়নার ভিতর দিয়ে গাড়িটা দেখার চেষ্টা করল রানা।

কিন্তু বোঝার উপায় নেই কিছু। অন্ধকারে শুধু গাড়ির কাঠামো ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। মুখ দিয়ে বিরক্তিসূচক একটা আওয়াজ করল ও।

'কি হলো, মাসুদ ভাই?' প্রশ্ন করল হাসিব।

তর্জনী দিয়ে আয়নায় টোকা মারল ও। 'পিছনে দেখ।'

কাত হয়ে আয়তাকার আয়নায় চোখ রাখল সে। বেশ সময় লাগল তার ব্যাপার টের পেতে। 'ঠোলা?'

'তাই তো মনে হয়।' দ্রুত চিন্তা চলছে রানার মাথায়। ওরা যদি ক্যাগারের ওপর নজর রাখার জন্যে এসে থাকে, তাহলে অত দূরে অবস্থান নেয়াটা খুবই অস্বাভাবিক। এর একটাই ব্যাখ্যা হতে পারে, ওদের ওপরও নজর রাখছে ব্যাটারা। অর্থাৎ ওকেও কোন কারণে সন্দেহ করতে শুরু করেছে পুলিস। কায়দা করে দূর থেকে রানা ও ক্যাগার, দু'জনের ওপরই নজর রাখছে।

রানা যা করতে চায়, তা ওদের উপস্থিতিতে সম্ভব নয়। তাই অন্য লাইনে মাথা খাটাতে লাগল রানা। ভাগাতে হবে ব্যাটাদের। হাসিবের, 'ওই দেখুন,' শুনে মুখ তুলল মাসুদ রানা। ক্যাগারের সামনের রুমের আলো নিভে গেছে। ঘুমাতে যাচ্ছে ব্যাটা, ভাবল ও। কিন্তু না, সেকেণ্ড দশেক পরই আবার জ্বলে উঠল আলো। জ্বলতেই থাকল। কি ব্যাপার! কিছু টের পেয়ে গেল নাকি লোকটা? নিজেকে আড়াল করে ওদের অবস্থান···'হাসিব!'

'জ্বি?'

দ্রুত নির্দেশ দিতে শুরু করল মাসুদ রানা। শুনতে শুনতে দুই কানে গিয়ে ঠেকল হাসিবের হাসি। বলল, 'কোন চিন্তা নেই, মাসুদ ভাই। শেয়াল দৌড় কাকে বলে হাড়ে হাড়ে টের পাবে আজ ব্যাটারা।'

ওদিকে শাওয়ারের নিচে মিনিট দশেক ভিজে বেরিয়ে এল আলেক্স ক্যাগার। এই ক'দিন শরীরের ওপর দিয়ে ধকল কম যায়নি, এবার একটু বিশ্রাম না নিলেই নয়। দু'দিন পড়ে পড়ে শুধু ঘুমাবে সে। তারপর অন্য কাজ। বাথরোবের ফিতে কোমরে পেঁচাতে পেঁচাতে ককটেল কেবিনেটের সামনে এসে দাঁড়াল ক্যাগার

খানিকটা স্কচ ঢেলে চুমুক দিল গ্লাসে।

দ্বিতীয় চুমুক দিতে যাবে সে, এমন সময় বেজে উঠল টেলিফোন। কপাল কুঁচকে উঠল ক্যাগারের, কে হতে পারে এই অসময়ে? সাড়া দিল সে।

'ক্যাগার? গুড গড!'

'গুডনাউ?' আরও কুঁচকে উঠল তার কপাল। রবার্ট গুডনাউ জেরি লাটিমারের চ্যালা। বেলিভেডারে তার স্যুইটে গত দু'দিন ধরে আছে লোকটা। কানে হেডফোন লাগিয়ে বসে আছে মাসুদ রানার ঘরে কি আলোচনা হয় শোনার জন্যে।

'হ্যাঁ। কখন ফিরেছ?'

'এই মিনিট দশেক হলো। আমি ফোন করতে যাচ্ছিলাম তোমাকে।'

'শোনো, এই মুহূর্তে শহর ছেড়ে পালাও। এদিকে সব জানাজানি হয়ে গেছে। এতক্ষণে হয়তো ওদের চোখেও পড়ে গেছ তুমি। জলদি করো! এক্ষুণি!

শক্ত হয়ে গেছে আলেক্স ক্যাগার। মনে মনে নিজেকে অভিসম্পাত দিচ্ছে। আসার সময় জেরি লাটিমার বলে দিয়েছে, বাসায় ফিরেই যেন মাসুদ রানার খবর জানার জন্যে গুডনাউর সঙ্গে যোগাযোগ করে সে। অথচ করছি করব করে দেরি করে ফেলেছে ক্যাগার। অমার্জনীয় ভুল করে ফেলেছে। এই লাইনে এ ধরনের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত একমাত্র··· 'কখন ঘটেছে এসব?'

'গতকাল। ও'ডোনিল দেখা করেছে মাসুদ রানার সঙ্গে। বুঝলে কিছু?'

'বলে যাও।' চিকন ঘাম দেখা দিল ক্যাগারের কপালে।

অনেক চেষ্টা করেছি আমি খবর পৌঁছানোর, কিন্তু তোমাদের পাইনি। তোমরা সরে গেছ তখন ওখান থেকে। ওসব শোনার সময় নেই এখন, বেরিয়ে পড়ো জলদি। আর হ্যাঁ, ওখানে খবর পাঠানো সম্ভব? জেরি-হফার সবার পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে। মাইক্রোফোন খুঁজে বের করে ফেলেছে হারামজাদা।'

হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল ক্যাগার। 'আচ্ছা, কি করা যায় দেখি। তুমি এখন কোথায়? হোটেলে?'

'আরে না! পালিয়ে এসেছি। আধ ঘণ্টা পর পর তোমাকে ধরার চেষ্টা করছি আমি কাল থেকে।'

'ডজ জানে ঘটনা?'

'না।'

'ঠিক আছে, আমিই জানাচ্ছি ওকে। রাখছি।' ক্রেডলে টোকা দিয়ে জ্যাক ডজের নম্বর টিপল সে দ্রুত। দু-চার কথায় কাজ সেরে ছুঁড়ে ফেলে দিল রিসিভার। রোব খুলে শার্ট ঝোলাল গায়ে। তারপর প্যান্টের ভেতর এক পা ভরে লাফাতে লাফাতে সিটিংরুমে চলে এল। আলো নিভিয়ে পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল নিচে। তিনটে গাড়ি দেখা যাচ্ছে সামনের রাস্তায়। দুটো অ্যাভিনিউর এপাশে, আরেকটা ওপাশে।

ক্রূর এক টুকরো হাসি ফুটল আলেক্স ক্যাগারের ভয়ঙ্কর মুখে। আলো জ্বেলে বেডরুমে ফিরে এল সে। টাকা-পয়সা যা আছে সব কোটের ভেতরের পকেটে ঢোকাল। সঙ্গে পাসপোর্ট। তারপর টেলিফোন করল তার এক বন্ধুকে। চমৎকার

একটা মোটরবোট আছে লোকটার। কয়েকদিনের জন্যে বোটটা ভাড়ায় চাইল ক্যাগার। বিনা বাক্য ব্যয়ে রাজি হয়ে গেল লোকটা। তার জানা আছে টাকা-পয়সার ব্যাপারে ক্যাগার দরাজ হাতের মানুষ। পনেরো মিনিটের মধ্যে বোটটা তৈরি করে রাখার নির্দেশ দিল তাকে ক্যাগার।

রিসিভার নামিয়ে রাখবে, এই সময় নিচ থেকে টায়ারের তীক্ষ্ণ আওয়াজ উঠল। দৌড়ে সিটিংরুমে ফিরে এল ক্যাগার। হাতে ধরা আছে মাউজারটা। আলো নিভিয়ে আবার উঁকি দিয়ে নিচে তাকাল সে। এপাশের দুটো গাড়ির একটা নেই। হাঁ-হাঁ করে ছুটছে ওটা। এরই মধ্যে বেশ দূরে সরে গেছে। মুখ ঘুরিয়ে বাকি দুটোর দিকে তাকাল ক্যাগার বিস্মিত চোখে, এই সময় সগর্জনে স্টার্ট নিল ওপাশে, একটু দূরে দাঁড়ানো গাড়িটা। দ্রুত এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়ানো গাড়িটার পাশে থামল কড়া ব্রেক কষে। এক মুহূর্ত মাত্র, তারপরই ছুটল প্রথমটার পিছন পিছন। দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়ি দুটো।

হতভম্ব হয়ে ও দুটো যেদিকে গেল, সেদিকে চেয়ে থাকল ক্যাগার। খানিক পর হুঁশ ফিরতে নিচের গাড়িটার ওপর নজর দিল। অনড় আছে ওটা। ব্যাপারটা কি? ভাবতে ভাবতে পিছিয়ে এসে আলো জ্বালল সে। নিচে যদি কেউ থাকে, এই আলো দিয়ে তাকে বা তাদেরকে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও বিভ্রান্ত করা যাবে। বেডরুমে চলে এল সে। সুটকেস গুছিয়ে নিতে তিন মিনিট সময় লাগল। তারপর বাঁ হতে সুটকেস, ডান হাতে মাউজার নিয়ে বেড়ালের মত নিঃশব্দ, চিতার মত ক্ষিপ্র পায়ে বেরিয়ে এল ফ্ল্যাট ছেড়ে। সামনে দিয়ে বের হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

কাজেই ভবনের পিছন দিকে যেতে হবে তাকে। ফায়ার এসকেপের সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবে সে। কেউ কিছু টের পাবে না। পীসহোলে চোখ রেখে সামনেটা দেখে নিল ক্যাগার। তারপর আস্তে করে হাতল ঘোরাল। পরমুহূর্তে পুরো আকাশটাই যেন ভেঙে পড়ল তার মাথায়। বাইরে থেকে প্রচণ্ড এক লাথিতে ভেতরদিকে ছিটকে এল দরজাটা। সতর্ক হওয়ার কথা চিন্তা করার সময়ও পেল না আলেক্স ক্যাগার, নাকে মুখে আছড়ে পড়ল ওটা। বিদঘুটে এক আওয়াজ বেরিয়ে এল তার গলা দিয়ে, কয়েক পা পিছিয়ে চিতপাৎ হয়ে পড়ে গেল সে।

কোথায় গেল তার মাউজার, কোথায় সুটকেস, দিশা হারিয়ে ফেলল আলেক্স ক্যাগার। দু'হাতে মুখ চেপে ধরে আধশোয়া হয়ে তাকিয়ে থাকল দোরগোড়ায় দাঁড়ানো দীর্ঘদেহী, নিষ্ঠুর চেহারার যুবকের দিকে। লোভীর দৃষ্টিতে ক্যাগারের পেট নিরিখ করছে তার হাতের অস্ত্রটা। যন্ত্রণায় জ্ঞান হারানোর দশা তার। আঙুলের ফাঁক গলে রক্ত গড়াচ্ছে গল গল করে। পানিতে ভরে গেছে চোখ।

কিন্তু নড়তে সাহস হচ্ছে না ক্যাগারের। মাঝ কোমর থেকে ওপরের অংশ সামান্য একটু তুলে স্থির হয়ে আছে। অপলক চোখে দেখছে যুবককে। চট করে ঘরের ভেতর দৃষ্টি বুলিয়ে নিল সে। আবার তাকাল ক্যাগারের দিকে। 'কোথাও যাচ্ছিলে বুঝি, আলেক্স ক্যাগার?' ভরাট গলায় প্রশ্ন করল মাসুদ রানা।

ওদিকে উল্কার মত ছুটছে হাসিব। মাসুদ ভাই যা চেয়েছিলেন, তাই হয়েছে। হঠাৎ সামনের দুটোর মধ্যে একটা গাড়ি বিনা নোটিসে চলতে শুরু করেছে দেখে

তার পিছু নিয়েছে মরভিন ক্রিস্টেনসেন। সে আর তার সঙ্গী এতক্ষণ দূর থেকে নজর রাখছিল মাসুদ রানার ওপর। কাছে এসে দ্বিতীয় গাড়ির ভেতরটা উঁকি দিয়ে দেখল সে। নেই কেউ। তার মানে পালিয়ে যাচ্ছে মাসুদ রানা। ধাওয়া শুরু করল মরভিন। বসের নির্দেশ, মাসুদ রানাকে চোখে চোখে রাখতে হবে।

কাল একবার তাকে হারিয়ে যথেষ্ট বকা খেতে হয়েছে। আজ আর তা হতে দেবে না সে। ক্যাগার-ফ্যাগার পরে দেখা যাবে, আগে মাসুদ রানা। সামনের লাল টেইল লাইট জোড়ার দিকে অপলক চেয়ে আছে মরভিন। ষাট-সত্তর গজ আগে রয়েছে গাড়িটা। 'সাবধান! সাবধান!' সঙ্গী চালককে বারবার সতর্ক করছে সে। 'কোনমতেই যেন ফসকাতে না পারে ওরা, সার্জেন্ট।'

মাসুদ রানা তখন পৌঁছে গেছে আলেক্স ক্যাগারের বন্ধ দরজার সামনে। হাসিবের সঙ্গে পরামর্শ সেরে দরজা খুলে হামাগুড়ি দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল ও। পিছিয়ে গিয়ে টান টান হয়ে শুয়ে পড়েছিল পিছনে দাঁড়ানো হাসিবের গাড়ির পাশে। দূর থেকে কিছু টেরই পায়নি ডিটেকটিভ। সে যখন কাছে এসে উঁকি দিচ্ছে, রানা তখন তার মাত্র পাঁচ হাতের মধ্যে, গাড়ির ওপাশে।

# নয়

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে হঠাৎ করেই। বড় বড় ফোঁটায় ঝরছে অবিরাম, দশ হাত দূরেও ভালমত দেখার উপায় নেই। জনশূন্য ওয়াটারফ্রন্টে পৌঁছে গাড়ি থামাল মাসুদ রানা। ওর পায়ের কাছে উপুড় হয়ে বেকায়দা ভঙ্গিতে পড়ে আছে ক্যাগার।

হাত-পা বাঁধা। ভাঙা নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে তার। দরজার আঘাতে ওপরের পাটির তিনটে দাঁত নেই হয়ে গেছে। ফেটে দু'ফাঁক হয়ে আছে নিচের ঠোঁট। সব মিলিয়ে বদখত চেহারা আরও বীভৎস হয়ে উঠেছে ক্যাগারের। চোখ আধবোজা। ঝিম্ মেরে পড়ে আছে। কি এক ঘোরের মধ্যে রয়েছে যেন সে।

গাড়ির ছাতে অনবরত ড্রাম বাজছে। চারদিকের কাঁচ বেয়ে এমন প্রবল ধারায় পানি ঝরছে যে সামনে ঠিকমত ঠাহর করা মুশকিল। ওয়াইপার কোন কাজেই আসছে না। ওর মাঝে যতটা পারা যায়, ডানে-বাঁয়ে, পিছনে দেখে নিল মাসুদ রানা। ফ্রন্টের দক্ষিণ প্রান্তে কয়েকটা পরিত্যক্ত ওয়্যারহাউস আছে, সেদিকে রওনা হলো আবার। বৃষ্টির তোড়ে উপসাগরের পানি ধোঁয়াটে সাদা রঙ পেয়েছে। বজ্রপাতের আওয়াজ লাগছে যেন দূর থেকে ভেসে আসা ক্রমাগত কামানের গর্জন।

পর পর কয়েকটা গুদামঘর পেরিয়ে এসে একটা গলি পেয়ে গাড়ি ঢোকাল মাসুদ রানা। চেহারায় রাগ, হিংসা, ঘৃণা কিছু নেই। কোন অভিব্যক্তি নেই। কেবল দৃঢ় সংবদ্ধ চোয়াল দেখলে মনে হয় ভেতরে ভেতরে কি এক কঠিন প্রতিজ্ঞা

নিয়েছে যেন। আলো নিভিয়ে স্টার্ট বন্ধ করল রানা। ঝাড়া দুই মিনিট পিছনে তাকিয়ে বসে থাকল। না, কোন নড়াচড়া নেই পিছনে। কেউ অনুসরণ করেনি তাকে।

আবার স্টার্ট দিল ও। খানিক এগিয়ে সার দেয়া গুদামঘরগুলোর পিছনে চলে এল। তারপর হেডলাইটের আলোয় খুঁজে পেতে পছন্দসই একটা ঘর বের করল। পিছনের দরজা খোলা ওটার। এখানে ওখানে ফেলে রাখা জঞ্জাল, পুরু ধুলোর স্তর আর অজস্র ইঁদুর ছাড়া কিছু নেই ভেতরে। মুখ তুলল রানা। অনেক উঁচুতে, আকাশের পটভূমিতে দৈত্যাকার গুদামগুলোর ছাত ঝুলে আছে। গাড়ি ঘুরিয়ে খোলা দরজার সামনে আড়াআড়ি করে রাখল ও। তারপর নেমে পড়ল।

ঝুঁকে পড়ে বাঁ হাতে মুঠো করে ধরল ও আলেক্স ক্যাগারের চুল। নির্দয়ের মত টানতে টানতে বের করে আনল তাকে। কোটের কলার ধরে এবড়ো-খেবড়ো মেঝের ওপর দিয়ে টেনে হিঁচড়ে গুদামে ঢোকাল। নতুন ধরনের আওয়াজে ভয় পেয়ে গেল ভেতরের ইঁদুর বাহিনী। দুদ্দাড় ছুটে পালাল ঝাঁকে ঝাঁকে। একটু পরই অবশ্য আবার ফিরে এল ওরা। বুঝতে পেরেছে ভয়ের কিছু নেই।

'তোমাকে এখানে কেন নিয়ে এসেছি, জানো?' যেন গল্প করছে, এমনভাবে বলল মাসুদ রানা। 'আমার কাজ হয়ে গেলে তোমার নোংরা দেহটা যেন ওদের,' ইঙ্গিতে ইঁদুর বোঝাল ও, 'খোরাক হয়, তাই।'

উত্তর দিল না ক্যাগার। যদিও বুঝতে পেরেছে আজ আর রেহাই নেই। জীবনে এই প্রথম বড্ড শক্ত পাল্লায় পড়েছে সে। এবং হয়তো শেষ পাল্লা। মন বলছে এর হাত থেকে নিস্তার নেই। লোকটাকে চেনে না ক্যাগার, তবে অনুমান করে নিয়েছে, মাসুদ রানা ছাড়া এ আর কেউ নয়।

'একদম নির্জন জায়গা। কেউ শুনতে পাবে না তোমার চিৎকার, বা পিস্তলের আওয়াজ। অবশ্য যদি সব স্বীকার করো, প্রাণে মারব না তোমাকে।'

'কি জানতে চান আপনি?' কাঁপা, আতঙ্কিত গলায় প্রশ্ন করল সে। ঘামে সারা শরীর ভিজে গেছে তার।

'অনেক কিছু। তবে সবচে' আগে জানতে চাই জেরি লাটিমার কোথায়।'

চুপ করে থাকল ক্যাগার। আধ মিনিট অপেক্ষা করে বলল রানা, 'চুপ করে থেকে কোন লাভ হবে না, আলেক্স ক্যাগার। তোমাকে নিয়ে নীরবতা পালনের জন্যে এখানে আসিনি আমি। মুখ তোমাকে খুলতেই হবে। যত তাড়াতাড়ি খুলবে, ততই লাভ।'

'আমি জানি না।'

'প্রফেসর মারগুব হোসেনকে কোথায় রেখেছ তোমরা?'

'জানি না। আমি এসব কিছুই জানি না।'

ক্যাগারের গালে রানার গায়ের জোরে মারা চড়টার অস্বাভাবিক আওয়াজে আবার হুড়োহুড়ি পড়ে গেল ইঁদুরগুলোর মধ্যে। মাথার অন্য পাশ ঠক্ করে ফ্লোরে ঠুকে গেল লোকটার। গলা দিয়ে উঠে এল চাপা গোঙানি। একের পর এক প্রশ্ন করে যেতে লাগল রানা। 'আলেক ওয়াটসনকে কে হত্যা করেছে?'

উত্তর নেই।
'কে হাত তুলেছে জিম ফ্রিম্যানের গায়ে?'
উত্তর নেই।
'অ্যাসাইলামের মেল নার্স আর তার বান্ধবীকে হত্যা করেছে কে?'
ক্যাগার নিরুত্তর।
'স্টোর ডিক আর জেসি কুপারকে?'
তথৈবচ।

এক মিনিট অপেক্ষা করল রানা। তারপর থমথমে গলায় বলল, 'শেষবারের মত জানতে চাইছি, কোথায় রাখা হয়েছে প্রফেসরকে!'

'সত্যি বলছি, আমি...'

ঠাণ্ডা মাথায় মার শুরু করল মাসুদ রানা। খালি হাতে। জায়গা বুঝে মারছে ও, নার্ভ সেন্টার বেছে বেছে। মারের সঙ্গে সঙ্গে ফুলে উঠছে জায়গাগুলো। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে আলেক্স ক্যাগার। মাত্র দুই মিনিটে গলার জোর কমে গেল তার। গোঙাচ্ছে। আরও কিছুক্ষণ হাত চালিয়ে থামল মাসুদ রানা। পরিশ্রমে চওড়া বুক ঘন ঘন ওঠানামা করছে। 'মুখ খুলতে চাও?'

বহুকষ্টে মাথা দোলাল আলেক্স ক্যাগার। গড় গড় করে বলতে আরম্ভ করল সব। মন দিয়ে শুনল রানা। কয়েক জায়গায় দু'তিনবার করে প্রশ্ন করে আরও খোলাখুলি জেনে নিল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে ক্যাগারের মাউজারটা বের করল। তার কপাল সই করে তুলল ওটা রানা।

'না!' চেঁচিয়ে উঠল ক্যাগার সভয়ে। 'আমাকে মারবেন না! প্লীজ! আমি...'

'জীবনে অনেক হত্যা করেছ, আলেক্স ক্যাগার, গমগমে কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা। 'অসময়ে অনেক প্রাণ ঝরে গেছে তোমার হাতে। তোমার মত নরপশু বেঁচে থাকলে আরও মরবে। কিন্তু আমি সে সুযোগ দিতে রাজি নই।'

গুলি করল মাসুদ রানা। বুকের বাঁ দিকে, হৃৎপিণ্ড ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল আলেক্স ক্যাগারের। চেম্বার পুরো শেষ করল রানা অমানুষটার ওপর। তারপর কলার ধরে মৃতদেহটা নিজের পদচিহ্নের ওপর দিয়ে টেনে খোলা দরজার সামনে ফেলে রাখল। পুরু ধুলোর ওপর কোথায় কোথায় পা রাখছে সেদিকে প্রথম থেকেই নজর রেখেছিল রানা। সব ছাপ মুছে গেল। গুলিশূন্য মাউজারটা ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরে। বৃষ্টির পানি ধুয়ে মুছে দেবে রানা হাতের ছাপ।

ওদিকে প্রায় আশি-নব্বই মাইল বেগে ছুটছে হাসিব। যখন মনে হয়েছে এতক্ষণে কাজ সেরে ফেলেছেন মাসুদ ভাই, অমনি গতি বাড়িয়ে দিয়েছে সে। পিছনের গাড়িটাকে ব্যস্ত রাখার জন্যে দৌড়েছে সে এতক্ষণ, এবার উঠেপড়ে লেগেছে ওটাকে খসাবার চেষ্টায়। গাড়িতে মাসুদ রানা নেই, এটা ওদের বুঝতে দেয়া চলবে না কোনমতেই।

মিনিট দশেক একনাগাড়ে চেষ্টা চালিয়ে সফল হলো সে। ছুটল নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশে। তার খানিক আগে শুরু হয়েছে বৃষ্টি।

একটা পাব থেকে এজেন্সির বিশেষ নম্বরে ফোন করল মাসুদ রানা। দ্বিতীয়

রিঙ শুরু হতেই রিসিভার তুলল আলতাফ মির্জা। 'মাসুদ ভাই, কোথায় আপনি?' স্ক্র্যাম্বলার টিপে দিয়ে প্রশ্ন করল সে।

'ওয়াটার ফ্রন্টে। তুমি কখন ফিরেছ? ওদিকের খবর কি?' এক মিনিট ও প্রান্তের বক্তব্য শুনল ও। তারপর বলল, 'পুলিস কিছু জিজ্ঞেস করেনি তোমাকে?'

'না।'

'গুড। এবার শোনো।'

'সিটি পুলিস…সার্জেন্ট'স ডেস্ক। কে বলছেন?' বলল ডিউটি সার্জেন্ট, টিম মার্টিনেজ। একটু একটু করে চোখ কুঁচকে উঠল তার টেলিফোন-কারীর বক্তব্য অনুধাবন করতে পেরে। 'আপনি শিওর?'

'হ্যাঁ। নিজ কানে শুনেছি আমি। চার-পাঁচবার।'

'অন্য কিছুর শব্দও তো হতে পারে!'

'না,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল লোকটা। 'গুলির শব্দই। কোন ভুল নেই তাতে।'

'আচ্ছা, আপনি থাকুন ওখানেই। আমি দেখছি।'

বিশ মিনিট পর সাইরেন বাজিয়ে দুটো স্কোয়াড কার এসে থামল ওয়াটার ফ্রন্টের দক্ষিণ মাথার সর্বশেষ ভবনটার সামনে। জীর্ণ চেহারার দোতলা একটা ভবন। কোন এক কালে রেস্টুরেন্ট ছিল। নিচতলায় থাকে দুই ডক শ্রমিক পরিবার। ওপরে বিপত্নীক বৃদ্ধ মালিক। টেলিফোনটা সে-ই করেছিল পুলিসে।

ডিটেকটিভ জিন মরিস প্রশ্ন করল বৃদ্ধকে। 'কোথায় বসে শুনেছিলেন আপনি গুলির আওয়াজ?'

'ওপরতলায় আমার বেডরুম থেকে। ওদিক থেকে এসেছে শব্দ, খুব সম্ভব,' হাত তুলে দূরের পরিত্যক্ত গুদামগুলো দেখাল লোকটা।

'অল রাইট, বয়েজ,' ঘুরে নিজের লোকদের নির্দেশ দিল জিন মরিস। 'পুরো এলাকা সার্চ করতে হবে। শুরু করে দাও। কারও চোখে কিছু পড়লে হুইস্‌ল বাজাবে।'

আধ ঘণ্টার মধ্যে আবিষ্কৃত হলো আলেক্স ক্যাগারের মৃতদেহ। বাঁশির আওয়াজে জায়গামত গিয়ে হাজির হলো সবাই। ঘিরে দাঁড়াল লাশটা। চেহারা চেনার তেমন উপায় ছিল না। কাঁচের চোখ আর বাঁ গালের কাটা দাগটাই কেবল সাক্ষ্য দিল মানুষটা কে হতে পারে। কার-টেলিফোনে ঘটনাটা চীফকে জানাল মরিস। ঘুমে ব্যাঘাত ঘটায় বিরক্ত হলেও ক্যাগারের মৃতদেহ পাওয়া গেছে, কথাটা জাদুমন্ত্রের মত কাজ করল।

পনেরো মিনিটের মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেলেন তিনি। ততক্ষণে পড়ে থাকা মাউজারটা আবিষ্কার করে ফেলেছে এক সার্জেন্ট। ফ্লাশ লাইটের আলোয় ক্যাগারের চেহারাটা ভাল করে দেখলেন ফ্রেড উইলিয়ামসন। চেহারা গম্ভীর। চিন্তিত। ওদিকে জ্যাক ডজ, এদিকে আলেক্স ক্যাগার, দুটোই শেষ। প্রথমটার ব্যাপার না হয় বোঝা গেল বান্ধবীর হাতে খুন হয়েছে, কিন্তু এ মরল কার হাতে?

*

পুলিস চীফ যখন ক্যাগারের হত্যাকারী কে হতে পারে ভাবছেন, সেই সময় নিজের সেডান নিয়ে বড় রাস্তায় উঠে থামল আলতাফ মির্জা। বৃষ্টির বেগ তখনও একই রকম। বেশি দূরে দেখার উপায় নেই। তবু যথাসম্ভব এদিক-ওদিক চোখ বুলিয়ে নিল সে। তারপর গাড়ি ছাড়ল। হেডলাইট জ্বালেনি।

ত্রিশ পঁয়ত্রিশ গজ পিছনে আরও একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল পথের পাশে। একজন বসা গাড়িতে। একটু আগে ম্যাকক্লিফ রোডে আলতাফের পাহারায় যে দু'জন ছিল, এ তাদের একজন। সার্জেন্ট অ্যাডাম গিলি। অন্যজন তখনই মারফি ম্যাডেলিনকে নিয়ে ফিরে গেছে পুলিস স্টেশনে। রানা এজেন্সির গেট দিয়ে আলোবিহীন একটা গাড়ির কাঠামো আবছাভাবে বেরুতে দেখে সোজা হয়ে বসল সার্জেন্ট।

বুঝল আবার কোন অভিসারে চলেছে আলতাফ। সে-ও আলো না জ্বেলেই পিছু নিল ধীর গতিতে। গজ পঞ্চাশেক অনেকটা যেন পা টিপে টিপে এগোল মির্জা, তারপর হেডলাইট জ্বেলেই বাড়িয়ে দিল গতি। গাড়ি প্রায় দাঁড় করিয়ে ফেলল অ্যাডাম গিলি। সামনের টেইললাইট দুটোকে অনেকটা পথ এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিল। তারপর থাবা দিয়ে হেডলাইট জ্বালল সে। হুঙ্কার ছেড়ে লাফ দিল তার লিঙ্কন। মাঝখানে যথেষ্টর চেয়েও বেশি ব্যবধান রেখে অনুসরণ করে চলল সামনের গাড়িটিকে। কোনমতেই একে চোখের আড়াল করা যাবে না।

উত্তরে, শহরের প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছে সামনের গাড়ির গতি কমতে শুরু করল। এ শহরে জন্ম অ্যাডাম গিলির। এর কোথায় কি আছে, সব তার নখ দর্পণে। যেখানে গাড়িটা থামছে, সেটা একটা অর্ধ সমাপ্ত কনস্ট্রাকশন সাইট, বুঝে ফেলল সে। যেখানে কয়েকদিন আগে খুব মারধর করা হয়েছিল এক সাংবাদিককে। ওখানে কি দাঁড়াবে ওটা, না ভেতরে ঢুকবে? ভাবছে সার্জেন্ট, এই সময় সাইট এরিয়ায় ঢুকে পড়ল আলতাফ। চট করে দাঁড়িয়ে পড়ল সার্জেন্ট, নিভিয়ে দিল আলো।

ওই একটাই রাস্তা ওখানে। ভেতরদিকে কোন পথ নেই। কাজেই যখনই বের হোক লোকটা, এ পথেই বেরুতে হবে। অতএব সামনে এগোবার কোন ঝুঁকি নেয়ার প্রয়োজন নেই তার। চুপচাপ বসে থাকল অ্যাডাম গিলি। ওদিকে ভেতরে ঢুকতেই হেডলাইটের আলোয় মাসুদ রানাকে দেখতে পেল আলতাফ মির্জা। বড়সড় এক ভবনের পোর্চের নিচে দাঁড়িয়ে আছে গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে। এগিয়ে এসে থেমে দাঁড়াল মির্জা।

'পিছনদিক পরিষ্কার ছিল তো?' জানতে চাইল মাসুদ রানা।

'একদম পরিষ্কার।'

'যা যা আনতে বলেছি, এনেছ?'

'জ্বি।' পায়ের কাছে রাখা একটা মোটা কাপড়ের ব্যাগ দেখাল সে।

'চলো তাহলে।' রানার ইঙ্গিতে সরে বসল আলতাফ পাশে। ও বসল হুইলে। মুখ ঘুরিয়ে রওনা হয়ে গেল সেডান। রানার নিয়ে আসা হাসিবের গাড়ি পড়ে রইল

পিছনে। বড় রাস্তায় ওঠার আগে শহরের দিকে তাকাল মাসুদ রানা। নির্জীব হয়ে পড়ে আছে প্যারাডাইস সিটি। বৃষ্টির বেগ কমেছে খানিকটা সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ল না রানার। আপনমনে কাঁধ ঝাঁকাল ও। কেউ যদি থেকে থাকে, সময়মত দেখা যাবে। গাড়ির নাক বাঁয়ে ঘোরাল রানা, তারপর রওনা হলো লুইজিয়ানা হাইওয়ের দিকে।

পনেরো মিনিট এক নাগাড়ে চলার পর প্রশস্ত ইন্টারস্টেট হাইওয়েতে পড়ল সেডান। সঙ্গে সঙ্গে যেন পাখা গজাল, প্রায় উড়িয়ে নিয়ে চলল রানা ওটাকে। আর পঁচিশ মাইল গেলেই স্টেট লাইন। 'কোথায় চলেছি আমরা, মাসুদ ভাই?'

'প্রথমে লিঙ্কন ফলস্। ওখান থেকে এয়ার ট্যাক্সি জোগাড় করতে হবে, শ্রিভিপোর্ট যাচ্ছি আমরা।'

'সে তো অনেক দূর!'

'হ্যাঁ। কাল দুপুরের আগে পৌঁছানো সম্ভব হবে না।'

'তারপর? ওখান থেকে?'

'রেড রিভার বেসিন।'

ভাবতে লাগল মির্জা। সঙ্গে যেসব আনার নির্দেশ দিয়েছে ওকে মাসুদ রানা, তাতে মনে হয় রীতিমত যুদ্ধ করতে চলেছে ওরা। তার মানে কি প্রফেসরের খোঁজ পেয়েছেন মাসুদ ভাই?

'ঠিকই ভাবছ তুমি,' এদিকে না তাকিয়েই বলল ও। 'প্রফেসরকে উদ্ধার করতে চলেছি আমরা। তবে কাজটা খুব কঠিন হবে, সন্দেহ নেই।'

'তার মানে...আপনি কি করে জানেন, প্রফেসর ওখানে আছেন!'

'আলেক্স ক্যাগার দিল ঠিকানা।' মনে মনে হাসছে রানা। সব শোনার জন্য নিশ্চয়ই তড়পাচ্ছে ও ভেতরে ভেতরে।

'ক্যাগার!'

'হ্যাঁ।' আস্তে ধীরে পুরো ঘটনা জানাল ও আলতাফকে। কি করে পুলিসকে ফাঁকি দিয়েছে রানা, শুনে হেসে উঠল সে।

'ভালই বুদ্ধি করেছিলেন। কিন্তু ক্যাগার? ও কোথায়?'

গম্ভীর হয়ে গেল মাসুদ রানা। অনেকক্ষণ পর বলল 'শেষ যখন দেখি, তখন মারা গেছে লোকটা'

ড্যাশবোর্ডের আলোয় ওর মুখের এপাশ দেখা যাচ্ছে, সেদিকে পলকহীন চেয়ে থাকল আলতাফ। একটু পরই খেয়াল হলো, ঘন ঘন ভিউ মিররের দিকে তাকাচ্ছে রানা। 'কোনও সমস্যা?' প্রশ্ন করল সে।

'মনে হচ্ছে আবারও পুলিস জুটেছে পিছনে। অনেকক্ষণ থেকে লেগে আছে গাড়িটা।'

'সে কি!' অবাক হলো মির্জা। 'ওরা কি করে জানবে...!'

'নজর রাখো পিছনে।' গ্যাস পেডালে পায়ের চাপ বাড়াল মাসুদ রানা। পঁয়ষট্টির ওপর ছিল, ধীরে ধীরে পঁচাত্তরে উঠে এল স্পীডোমিটারের নীল, সরু কাঁটা। সীটের ওপর ঘুরে বসেছে আলতাফ। পিছনের জোড়া হেডলাইটের ওপর

সতর্ক নজর রাখছে।

'একই আছে ব্যবধান,' ঘোষণা করল সে।

'তার মানে তাই!' আর গতি ওঠাতে সাহস হচ্ছে না রানার। এসব রাস্তার সারফেস বেশি রকম মসৃণ। তার ওপর একটু বেতাল হলেই বিপদ। কাজেই অন্য সিদ্ধান্ত নিল ও। 'একটু বিশ্রাম নেয়া যাক। দেখি ও ব্যাটা কি করে।'

পেডালের চাপ কমাল মাসুদ রানা। পড়ে এল সেডানের গতি। 'ওটাও কমিয়েছে স্পীড,' বলল মির্জা।

'হুঁম!' বলেই গীয়ার ডিজএনগেজ করল ও। পেডাল ছেড়ে রাস্তার কিনারা ঘেঁষে দাঁড় করিয়ে ফেলল গাড়ি। চোখ রাখল আয়নায়। দু'জনেই বেশ বুঝতে পারল, মুহূর্তের জন্যে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল পিছনের চালক। পরমুহূর্তে গতি বাড়িয়ে দিল, সাঁ করে ওদের পাশ কাটিয়ে ছুটে গেল সামনে। একটা লিঙ্কন ওটা, চালক ছাড়া আর কেউ নেই।

সিগারেট ধরাল রানা। 'এগোক ও আরও কিছু দূর। মনে হয় না আমাদের ফলো করছে। তবু, কোন ঝুঁকি নেব না আমি।'

পাঁচ মিনিট পর গাড়ি ছাড়ল মাসুদ রানা। বৃষ্টি কমে গেছে। মাথার ওপরের ঘন কালো মেঘের পর্দাটা ফাটাছেঁড়া হয়ে আকাশ বেরিয়ে পড়েছে কোথাও কোথাও। থেমে যাবে বৃষ্টি যে কোন সময়। সামনে যতদূর দেখা যায় কোন টেইল লাইটের চিহ্নমাত্র নেই। তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না, ভাবল মাসুদ রানা। হয়তো আলো নিভিয়ে কোন ঝোপঝাড়ের আড়ালে বসে আছে ব্যাটা। সময় বুঝে পিছু নেবে আবার।

'পিছনে নজর রাখো,' বলল ও। 'কে জানে, মহাশয় হয়তো অতি ধূর্ত।'

সীট ব্যাকের নরম গদিতে মুখ গুঁজে বসে থাকল আলতাফ। সম্মোহিতের মত তাকিয়ে আছে পিছনদিকে। মাইল পাঁচেক আসার পর সোজা হয়ে গেল ও। 'হেডলাইট!'

'কত দূরে?'

'প্রায় সিকি মাইল।'

'আগেরটা?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

হারামজাদা! মনে মনে বলল রানা, তুমি যদি সেই তুমি হও, তাহলে খবর আছে। অবার লাফ দিল সেডান। সত্তর...আশি...নব্বইয়ে তুলে আনল রানা নির্ভয়ে। প্রায় থেমে গেছে বৃষ্টি। গড়িয়ে নেমে গেছে রাস্তার পানি, কাজেই এ মুহূর্তে চিন্তার কিছু নেই। কিন্তু দুটো গাড়ির ব্যবধান এক ইঞ্চিও বেড়েছে বলে মনে হলো না। সিকি মাইলেই বহাল।

আরও মাইল সাতেক পর ঝড়ের বেগে স্টেট লাইন অতিক্রম করল গাড়ি দুটো। সামনে খুদে মফস্বল শহর ব্রেন্টউড। তার আরও ত্রিশ মাইল পর লিঙ্কন ফলস্। ব্রেন্টউডের মেইন স্ট্রীটে প্রবেশ করল ওরা। পুরো শহর অন্ধকার। সাড়ে তিনটের কিছু বেশি বাজে। স্ট্রীটের শেষ মাথায় একটা অল নাইট কাফে লেখা

নিওন সাইন জ্বলছে।

আশান্বিত হয়ে উঠল মাসুদ রানা। ওদের ওখানে নিশ্চয়ই টেলিফোন আছে। কথা বলা দরকার সোহেলের সঙ্গে। কিন্তু আগে ফেউটা খসানো গেলে ভাল হত। থাক্ ব্যাটা, ভাবল ও। এতক্ষণেও যখন কাছে আসেনি, তখন আর আসবেও না। বরং ফোনটা সেরে ওর সঙ্গে মোলাকাত করা যাবে। কাফের পঁচিশ-ত্রিশ গজ আগে গাড়ি পার্ক করল রানা। জায়গাটা অন্ধকার। গাড়ি থেকে নেমে পিছনে তাকাল দু'জনেই।

কিন্তু লিঙ্কনটাকে দেখা গেল না। নেই ওটা। 'দাঁড়িয়ে পড়েছে কোথাও,' মন্তব্য করল মাসুদ রানা। 'বাকি পথ পায়ে হেঁটে আসবে হয়তো। চলো, আগে জরুরী কাজ সেরে নিই।' কাফেতে ঢুকল ওরা।

রানা তখনই ফোনের খোঁজে গেল না। পিছনের ল্যাভেটরির দিকে চলল ও। তার শেষ প্রান্তে সুইপার আসা-যাওয়ার দরজা। ওটা দিয়ে বেরিয়ে কাফের পিছনে চলে এল ও। খুব সরু একটা পথ ধরে ফিরে এল বড় রাস্তায়, কাফের প্রবেশপথের মাত্র দশ-বারো গজ দূরে। ছায়ায় মিশে দাঁড়িয়ে থাকল মাসুদ রানা। একটু পরই দেখা পাওয়া গেল লোকটার, জোর পায়ে এদিকেই আসছে নিশ্চিন্ত মনে। নিশ্চয়ই ওদের কাফেতে ঢুকতে দেখেছে সে। আরও কাছে আসতে চেহারা দেখেই বুঝল রানা লোকটা পুলিস।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল ও। মাত্র তিন গজ সামনে দিয়ে হেঁটে গেল সে। বেরিয়ে পড়ল রানা আড়াল ছেড়ে। উল্টোদিকে হাঁটতে লাগল হন্ হন্ করে। দোকানপাটের গা ঘেঁষে এগোচ্ছে, যাতে ঘুরে তাকালেও সহজে ওকে দেখতে না পায় লোকটা। নিজেদের গাড়ি পিছনে ফেলে আরও প্রায় পঞ্চাশ-ষাট গজ এগোতে একটা বাঁক পড়ল। বাঁকটা ঘুরতেই দেখা পাওয়া গেল লিঙ্কনের।

গাড়ি লক্ করে যায়নি লোকটা। দরজা খুলে ড্রাইভিং সীটে বসল রানা পা দুটো বাইরে রেখে, বনেটের ঢাকনার রিলিজ বাটনটা টিপে দিয়ে বেরিয়ে এল। ঢাকনা তুলে দু'মিনিট ভেতরে কাজ করল রানা। তারপর ডিস্ট্রিবিউটর ক্যাপটা রাস্তায় ফেলে জুতো দিয়ে মাড়িয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলল। সবশেষে ঢাকনা আছড়ে ফেলল বনেটের। রুমালে হাত মুছতে মুছতে ফিরে চলল কাফের দিকে।

আড়াল থেকে রানাকে বাইরে দেখতে পেয়ে চোখ কপালে উঠল সার্জেন্ট অ্যাডাম গিলির। সে নিজের চোখে লোকটাকে কাফের ভেতরে ঢুকতে দেখেছে একটু আগে, অথচ সেই লোক বাইরে এল কি করে? কখন বেরুল সে? স্যাণ্ডউইচ আর কফি খেলো ওরা। তারপর টেলিফোনে সোহেলের সঙ্গে মিনিট পাঁচেক কথা বলল রানা। বেরিয়ে এসে অনুসরণকারীকে দেখতে পেল না কেউ।

'এবার তুমি খানিক চালাও,' বলে পাশের সীটে উঠে বসল রানা।

গড়ে পঞ্চাশ মাইল বেগে গাড়ি চালাচ্ছে আলতাফ মির্জা। তাড়াহুড়ো করে লাভ নেই। সকালের আগে এয়ার ট্যাক্সি জোগাড় করা সম্ভব হবে না। লিঙ্কন ফলস তেমন ব্যস্ত কোন শহর নয়, চাইলেই যখন তখন সবকিছু পাওয়া যায় না।

প্রচণ্ড রাগে গায়ের রক্ত টগবগ করে ফুটছে ফ্রেড উইলিয়ামসনের। বাঘের দৃষ্টিতে

নতমস্তকে দাঁড়িয়ে থাকা ডিটেকটিভ মরভিনকে দেখছেন তিনি। খানিক পর হুঙ্কার ছাড়লেন, 'এ মাসুদ রানার কাজ না হয়েই পারে না। প্রফেসরকে কোথায় রাখা হয়েছে, টর্চার করে জেনে নিয়ে ক্যাগারকে খুন করেছে সে।'

'কিন্তু, চীফ...'

'কোন কিন্তু নেই। বাজি ধরে বলতে পারি আমি যা বললাম, ঠিক তাই ঘটেছে। মাসুদ রানাকে নয়, আর কাউকে ধাওয়া করে বেড়িয়েছ তোমরা, বুঝলে? তোমাদের ওখান থেকে সরাবার জন্যেই ফন্দিটা এঁটেছিল সে। অথচ তোমরা এমনই বুদ্ধিমান যে ধরতে পারোনি ওর চাল!'

চুপ করে থাকল মরভিন। হয়তো চীফের অনুমানই ঠিক। ওদের একজন যদি থেকে যেত ওখানে, তাহলে হয়তো ঘটত না এমন ব্যাপারটা। ঠিকই তো! নইলে আর কে করবে এ কাজ?

# দশ

রেড রিভার আসলে নামেই রিভার, বাংলাদেশের অনেক খালও ওর থেকে চওড়া। কাদাগোলা মেটে রঙের পানি, বয়ে চলেছে ধীর গতিতে। দু'তীরে খুব ঘন হয়ে জন্মেছে স-ঘাস, ডাক-উইডসহ নাম জানা-অজানা হরেক উদ্ভিদ। গাছ-পালার ঝাঁকড়া মাথা দু'পাশ থেকে প্রায় ছাতার মত ঢেকে রেখেছে নদীটাকে।

পানির ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে গরম বাতাস। কেমন এক বোঁটকা গন্ধ তাতে। সকাল ন'টা। গলুইয়ে বসে পাকা মাঝির মত নৌকা বাইছে মাসুদ রানা। নৌকা ছাড়া মোটরবোটে যাওয়া যেত গন্তব্যে, কিন্তু শ্রিভিপোর্টের চারদিকের দু'চার মাইলের বাইরে এ নদীতে কেউ ভ্রমণ করে না। তাই মোটরবোটের চল নেই এদিকে। তারপরও চেষ্টা করলে হয়তো জোগাড় করা যেত, কিন্তু ও নিয়ে চিন্তাই করেনি রানা। নিঃশব্দে এগোবার জন্যে নৌকাই নিরাপদ।

জায়গাটা একেবারে প্রত্যন্ত। শহরের বাইরে যোগাযোগ ব্যবস্থা মান্ধাতা আমলের। এদিকটায় অবশ্য সাধারণ মানুষের আসা-যাওয়াও নেই। বিশেষ ঠেকায় না পড়লে সে প্রশ্নও আসে না। গতরাতে শ্রিভিপোর্ট পৌঁছেছে ওরা। খুব ভোরে বেড়াতে যাবে বলে মালিককে প্রচুর অ্যাডভান্স দিয়ে নৌকাটা ভাড়া নিয়েছে মাসুদ রানা। অঙ্কটা দেখে চোখ কপালে উঠেছে লোকটার। খুশি হয়ে অনেক উপদেশ দিয়েছে সে ওদের।

তার কাছ থেকে জেনেছে ওরা রেড রিভার আসলে অ্যালিগেটরের ডিপো। শত শত অ্যালিগেটর আছে এ নদীতে। ওরা এ অঞ্চলে নতুন, একটু যেন সতর্ক থাকে। ভুলেও যেন ঘাঁটানো না হয় প্রাণীগুলোকে। চারটার দিকে রওনা হয়েছে ওরা। সেই থেকে এক ঘণ্টার পালা করে বৈঠা চালাচ্ছে রানা ও আলতাফ। ফলে খুব একটা কষ্ট হচ্ছে না কারও। কষ্ট যেটুকু হচ্ছে, গরমের কারণে।

যতটা পারা যায় তীর ঘেঁষে এগোচ্ছে মাসুদ রানা। সারাদিনে অজস্র অ্যালিগেটর চোখে পড়েছে ওদের। সুখের কথা, ওদের ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখায়নি জন্তুগুলো। কেবল চেয়ে থেকেছে ড্যাব ড্যাব করে। নৌকার মাঝখানে রানার দিকে পিছন ফিরে বসে আছে আলতাফ মির্জা। তার সামনেই রয়েছে একটা থম্পসন মেশিনগান। দুই তীরে সতর্ক নজর রেখেছে সে। বারোটার দিকে আরেকটা খুদে শহর বেলমোর অতিক্রম করল ওরা।

এতক্ষণ মাথার ওপরটা ফর্সা ছিল, ডাল-পালার দাপট ছিল কম। হঠাৎ করেই অন্ধকার হয়ে এল, দীর্ঘ ছাতার নিচে ঢুকেছে নৌকা। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁক ঝাঁক মশা ছেঁকে ধরল ওদের দু'জনকে। দু'হাত সমানে ওপরদিকে ছুঁড়ছে মির্জা, তাড়াবার চেষ্টা করছে ওগুলোকে। ক্রমে আরও আঁধার হয়ে এল চারদিক। সেই সঙ্গে মশার জ্বালাতনও বাড়তে লাগল পাল্লা দিয়ে।

নৌকার কয়েক গজ সামনে একটা গাছের গুঁড়ি ভাসতে দেখে চোখ কুঁচকে তাকাল মাসুদ রানা। পরক্ষণেই নৌকার মাথা ঘুরিয়ে দিল সন্তর্পণে। কয়েক হাত দূর থেকে পাশ কাটাল ওটাকে। গতি বাড়িয়ে দিল খানিকটা। প্রকাণ্ড এক অ্যালিগেটর ওটা। পানিতে গা ভাসিয়ে ঘুমাচ্ছে।

'কুমিরের মত হারামজাদা নয় এরা,' কিছুদূর এগিয়ে মন্তব্য করল ও। 'এদের না ঘাঁটানো হলে এরাও তোমাকে ঘাঁটাবে না। তবে ওটা যদি কুমির হত, এত সহজে পার পেতাম না আমরা।'

বাঁ তীরের স-ঘাসের আড়াল থেকে আচমকা লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল বড় একটা পাখি। দীর্ঘ পাখার দ্রুত ঝাপটানির শব্দে চারদিক মুখর করে পালাল ওটা। ভয় পেয়েছে। দুটোর দিকে সঙ্গে করে আনা শুকনো মাংস আর কফি খেলো ওরা নৌকা থামিয়ে। তারপর আবার শুরু হলো চলা।

আটটার দিকে জায়গামত পৌঁছল ওরা। রেড পোর্ট জায়গাটার নাম। অন্তত দূর থেকে ভেসে আসা একটা ভারী ডিজেল এঞ্জিনের আওয়াজ শুনে তাই মনে হলো রানার। ড্রেজিং চলছে রেড রিভারে। কার্ল হফার পেয়েছে কাজটা–কয়েক মিলিয়ন ডলারের কন্ট্রাক্ট। জায়গাটা যেমন দুর্গম, সভ্যতা থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন, তেমনি নিরাপদ। নিজের লোকজনের চলাচলের সুবিধের জন্যে ওখানে মোটরবোট মজুদ আছে হফারের। হালকা বিমান-কপ্টার ওঠা নামার জন্যে এয়ার স্ট্রিপও তৈরি করিয়ে নিয়েছে সে।

আলেক্স ক্যাগারের মুখে শুনেছে রানা এসব।

আগের কথা।

সকাল আটটার দিকে বাসে করে প্যারাডাইস সিটিতে ফিরে এল সার্জেন্ট অ্যাডাম গিলি। পুরো ঘটনা রিপোর্ট করল চীফকে। ভাবনায় পড়ে গেলেন তিনি। ওদিকে কোথায় গেল মাসুদ রানা? কেন? প্রফেসর মারগুব হোসেনকে উদ্ধার করতে? কোথায় আটকে রাখা হয়েছে তাকে, জানে লোকটা?

তাই হবে, ভাবলেন পুলিস চীফ। ক্যাগারকে নির্যাতন করে জেনে নিয়েছে

মাসুদ রানা। 'ওদের গাড়ির নাম-নম্বর এনেছ?'

'এনেছি।'

'ঠিক আছে। দেখি।' টেলিফোনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন ফ্রেড।

দুপুরের ভেতর জানা হয়ে গেল তাঁর কোনদিকে গেছে মানুষ দুটো। সেডানটা পাওয়া গেছে লিঙ্কন ফলসে। শ্রিভিপোর্ট পর্যন্ত সব ঠিকঠাক, তারপরই হাওয়া রানা ও আলতাফ। বহু চেষ্টা করেও কোনদিকে গেছে ওরা জানা গেল না।

ব্যাপারটা চিন্তায় ফেলে দিল পুলিস চীফকে।

ন'টা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। দিনের আলোয় টান ধরেছে হঠাৎ করেই। খুব দ্রুত আঁধার হয়ে আসছে। নৌকার নাক ঘুরিয়ে দিল মাসুদ রানা। তীরের নরম কাদায় গেঁথে গেল নৌকা। বৈঠা রেখে দু'হাত ঝাড়া দিতে লাগল ও। সারা শরীর বিষ হয়ে গেছে ব্যথায়। ক্লান্তিতে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। একই অবস্থা আলতাফেরও।

থম্পসন কাঁধে ঝুলিয়ে নেমে গেল সে। গলুই শক্ত করে ধরে রাখল রানার সুবিধের জন্যে। মোটা কাপড়ের ব্যাগটা দু'হাতে ধরে নেমে পড়ল রানা। খুব ভারি ব্যাগটা। তীরের মাটি খুব নরম, এঁটেল, মনে হলো যেন চিটাগুড়ের ওপর দিয়ে হাঁটছে ওরা। ড্রেজিং বন্ধ হয়ে গেছে আধঘণ্টা আগেই। তেমন কোন আওয়াজ নেই। মাঝেমধ্যে এক আধটা গলা ভেসে আসছে দূর থেকে–হাসছে, চড়া কণ্ঠে কথা বলছে।

হাঁটু সমান ঘাস ঠেলে এগোল রানা ও আলতাফ। মোটামুটি একটা পরিষ্কার জায়গা দেখে বসল। 'আরেকটু আঁধার হোক, তারপর এগোব।' ব্যাগের ভেতর হাত ভরে ক্যানড মাছ, হুইস্কি ইত্যাদি বের করল মাসুদ রানা। খিদেয় চোঁ-চোঁ করছে পেট। কিন্তু শান্তিতে খাওয়া-বসা কোনটাই সম্ভব হচ্ছে না। একেকটা জেট ফাইটার সাইজের মশার কামড়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল ওরা কয়েক মিনিটের মধ্যেই।

'সর্বনাশ!' বলল আলতাফ। 'হারামজাদারা জ্যান্ত খেয়ে ফেলবে দেখছি। কেন যে ব্যাটা নমরুদ এসেছিল দুনিয়ায়, বুঝি না।'

মুচকে হাসল মাসুদ রানা। একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল। সমানে হাত-পা ছুঁড়ছে। বসে বসে কত্থক অনুশীলন করছে যেন। ধোঁয়া গেলা শেষ করে উঠল ও। ঝোলা থেকে একটা নাইট গ্লাস বের করে বড় গাছের খোঁজে এদিক ওদিক তাকাল। প্রায় দশটা বাজে। ত্রিশ গজ দূরের একটা ওক গাছ পছন্দ হলো ওর। ওপরে দাঁড়াবার ভাল জায়গা আছে।

তরতর করে উঠে পড়ল রানা। 'ওয়াই'-এর মত বেরিয়ে আসা একজোড়া মোটা ডালে পা ছড়িয়ে বসে গুঁড়িতে হেলান দিল। চোখ রাখল নাইটগ্লাসে। ওর সরাসরি সামনে, সত্তর-পঁচাত্তর গজ দূরে কাঁটাতারের দেয়ালঘেরা এক কমপ্লেক্স। ভেতরে তিনটে প্লাস্টারহীন ভবন। দুটো স্কুল ঘরের মত লম্বা। অন্যটা ছোটখাটো আবাসিক ডিজাইনের, দোতলা।

ভবনটির সামনে মেশিনগানধারী দু'জন গার্ড দেখা গেল। শিকলে বাঁধা

ভয়ঙ্কর দর্শন দুটো জার্মান শেফার্ড ধরা তাদের হাতে। রেলিংবিহীন ছাতে রয়েছে আরেক গার্ড। তার সামনে দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা ব্রাউনিং মেশিনগান। দৃষ্টি হোঁচট খেলো মাসুদ রানার। এ পর্যন্ত যা যা দেখা গেছে, প্রায় সবই ওকে বলেছিল আলেক্স ক্যাগার। বলেনি কেবল এই জিনিসটার কথা। কমপ্লেক্সে ঢোকার একমাত্র পথটা বড়সড় এক ফ্লাড লাইটের আলোয় ঝলমল করছে। গেটটা পাহারা দিচ্ছে মেশিনগানার। থেকে থেকে পিছনদিকেও চোখ বোলাচ্ছে সে।

ডানে ঘুরল রানা। নদীতে স্থির দাঁড়িয়ে আছে একটা মাটি খোঁড়ার যন্ত্র। দূরে আরও একটা দেখা যাচ্ছে। ওটা হাইড্রলিক ড্রেজার। প্রথমটার কাজ তলার মাটি খোঁড়া, পরেরটার তীর কেটে নদী চওড়া করা। নদীর তীরে কাজের সুবিধের জন্যে পাকা রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। কাদা-মাটি বহন করার চার পাঁচটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়। ওপাশে একটা কাঠের পন্টুনে চমৎকার দুটো মোটরবোট দাঁড়িয়ে। মনটা খুশি হয়ে উঠল রানার। ফেরার সময় ওর একটা নিয়ে পালাবার চেষ্টা করতে হবে।

মুখ ঘোরাল মাসুদ রানা। কমপ্লেক্সে আরও একজন গার্ড আবিষ্কার করল। হাতে অটোমেটিক রাইফেল নিয়ে ভেতরে চক্কর দিচ্ছে লোকটা। কোমরে গোঁজা রয়েছে পয়েন্ট ফোর ফাইভ স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন। নজর আরেকটু বাঁয়ে ঘোরাল রানা। বাংলো ধাঁচের ভবনটার দোতলার একটা দরজা খুলে সামনের বারান্দায় বেরিয়ে এল দুটো লোক।

গ্লাসের ফোকাস তাদের মুখের ওপর অ্যাডজাস্ট করল রানা। দেখামাত্রই জেরি লাটিমারকে চিনে ফেলল ও। অন্যজন খুব সম্ভব কার্ল হফার। না, কার্ল হফার নয়, লোকটা…পল ম্যাথিয়াস! রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে জেরিকে কি যেন বোঝাচ্ছে ডাক্তার। খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল মাসুদ রানার। 'জিনিসপত্র রেখে উঠে এসো, আলতাফ,' নিচু গলায় বলল। 'ওপরে মশা অনেক কম।'

ধৈর্য ধরে পাশাপাশি বসে থাকল ওরা। ভেতরে সব মিলিয়ে পঁচিশ-ত্রিশজন মানুষ। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে শ্রমিকরা ক্লান্ত, খেয়ে-দেয়ে একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়বে লোকগুলো। তখন কাজে নামবে ওরা। বারোটার ভেতরে প্রায় সব বাতি নিভে গেল কমপ্লেক্সের। কেবল বাংলোর ওপরতলার দুটো রুমে আলো জ্বলছে।

নেমে এল ওরা। প্রস্তুতি নেয়ার সময় এসেছে। ঝোলা থেকে লম্বামত একটা বাক্স বের করল রানা। ভেতরে খুলে সাজানো রয়েছে পয়েন্ট টু-টু উইনচেস্টার রিপিটার। অস্ত্রটা দ্রুত হাতে প্রস্তুত করতে বসল মাসুদ রানা। কাজ শেষে সাইলেন্সার ও টেলিস্কোপিক সাইট জোড়া জিনিসটা ভয়ঙ্কর চেহারা পেল। ওটা নিয়ে আবার গাছে উঠে গেল রানা। আরাম করে বসে মেশিনগানারের ওপর নজর দিল। প্রথম কাজ ওই ব্যাটাকে ঠাণ্ডা করা।

আস্ত একটা তরমুজের সমান লোকটার মুখ। টকটকে লাল চেহারা। সারা মুখে বুটি বুটি দাগ। তেমন একটা সতর্ক ভাব দেখা গেল না তার মধ্যে। বসে

আছে ঢিলেঢালা ভঙ্গিতে। মাঝেমধ্যে গেটের দিকে তাকাচ্ছে। নিচের গার্ডদের ওপরই পড়ে আছে তার বেশিরভাগ নজর। শেফার্ড দুটোর নীরব লাফ ঝাঁপ দেখছে। হাঁটুর ওপর কনুইয়ের ভর রেখে লোকটার কপাল সই করল রানা সতর্কতার সঙ্গে।

খুব সহজ টার্গেট। আস্তে আস্তে আঙুলের চাপ বাড়াল রানা ট্রিগারে। নিচে কিছু একটা দেখে হেসে উঠল গার্ডটা, ঠিক সেই মুহূর্তে বেরিয়ে গেল বুলেট। হাসি মুখেই মারা গেল লোকটা। আস্তে করে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল মেশিনগানের ওপর, যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে কপালের ফুটো দিয়ে।

চট্ করে টেলিস্কোপ নিচে তাক্ করল মাসুদ রানা। না, অন্য গার্ডরা কিছু টের পায়নি। এখন আর এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই ডগ হ্যাণ্ডলাররা। হাঁটাহাঁটি করছে বাংলোর চারদিকে। নেমে এল রানা। রাইফেল ব্যাগে ভরে আরেকটা থম্পসন মেশিনগান বের করল ভেতর থেকে। প্রতিটির জন্যে দুটো করে অতিরিক্ত ক্লিপ এনেছে আলতাফ। এরপর দুটো হ্যাণ্ড গ্রেনেড আর দুটো কম্যাণ্ডো ছুরি বের করল ও। এছাড়া যার যার ব্যক্তিগত অস্ত্র তো রয়েইছে। সবশেষে বেরুল একটা প্লায়ার্স।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে নিল ওরা দু'জন। ঘুরপথে রওনা হয়ে গেল কমপ্লেক্সের দিকে। পিছনদিক দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করবে প্রথমে। সম্ভব না হলে অন্য ব্যবস্থা। দেখেশুনে সতর্ক হয়ে হাঁটতে হচ্ছে, কাজেই এই সামান্য পথ পার হতেই পুরো পনেরো মিনিট ব্যয় হয়ে গেল। লম্বাটে ভবন দুটোর পিছনে কোন আলো নেই। তবে অন্যটার আছে। পিছনের দেয়ালে শক্তিশালী একটা বালব্ জ্বলছে। বিল্ডিংটা তেমন বড় নয়, ওতেই বেশ পরিষ্কার দেখা যায় পিছনটা।

যার যার নাইটগ্লাসে চোখ রেখে ভাল করে চারদিকে নজর বোলাল রানা ও আলতাফ। নিয়মিত কোন ছন্দ নেই গার্ডদের পাহারায়। যার যখন খুশি আসছে, চক্কর দিয়ে যাচ্ছে পিছনদিকটায়। বেশ অলসভাবে হাঁটাচলা করছে লোক তিনটে। নিচু কণ্ঠে কথা বলছে, হাসছে। সিগারেট ফুঁকছে।

সুবিধে হবে বলে বাংলোর কাছের লম্বাটে ভবনটার পিছনের অন্ধকারে এসে বসল ওরা। পকেট থেকে প্লায়ার্স বের করল মাসুদ রানা। হাত বাড়াতে গিয়েও থেমে গেল মুহূর্তের জন্যে। তারগুলো ইলেকট্রিফায়েড কি না জানে না ও। কোন অ্যালার্ম সিস্টেম আছে কি না তা-ও জানে না। থাকতে পারে, আবার না-ও থাকতে পারে। ক্যাগার অবশ্য বলেছে নেই। তবু ছাতের মেশিনগানারের কথা ভেবে সন্দেহ যাচ্ছে না রানার।

নাক ডাকার আওয়াজে সচকিত হলো ও। সামনের ভবন থেকে আসছে। বিসমিল্লাহ্ বলে নিচের তারটা প্লায়ার্স দিয়ে আঁকড়ে ধরল মাসুদ রানা। এই বুঝি বেজে উঠল সাইরেন, ভেবে আশঙ্কায় বুজে ফেলল দু'চোখ। একই অবস্থা মির্জারও। দোয়া-দরূদ পড়ছে সে সমানে। কিন্তু আশঙ্কা মিথ্যে প্রমাণিত হলো ওদের। কোন সাইরেন বাজল না। কুট্ কুট্ করে নিচের তিনটে তার কেটে ফেলল মাসুদ রানা। ওগুলো টেনে সরিয়ে পরিষ্কার করল পথ।

পরমুহূর্তে শিকলের মৃদু 'ঠুং' এবং কানের একেবারে কাছে বিকট 'ঘাউ' শব্দে পিলে চমকে উঠল দু'জনেরই। কি করে ছাড়া পেল কে জানে, ফাঁকটা গলে ওদের দু'হাতের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে দৈত্যাকার একটা শেফার্ড। কুকুরটার গায়ের রঙ কালচে, তারওপর দু'জনেরই নজর ছিল তারের ওপর, দেখতেই পায়নি কেউ। কয়েক মুহূর্ত অবাক বিস্ময়ে ওদের দেখল শেফার্ড, তারপর আবার হাঁক ছাড়ল প্রাণ খুলে।

পলক পড়ার আগেই ঝাঁপ দিল ওটা মাসুদ রানার টুঁটি লক্ষ্য করে। প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলে নিয়ে নিঃশব্দে কাজ সারবে বলে হিপ্ পকেট থেকে কম্যাণ্ডো ছুরি বের করতে যাচ্ছিল রানা। কিন্তু ছুরির বাঁট পর্যন্ত হাত পৌঁছার আগেই ওটার আক্রমণে ধরাশায়ী হলো ও। পরক্ষণেই বিদ্যুৎ খেলে গেল মির্জার দেহে, নিজের ছুরি বের করেই ওপরদিকে হাত চালাল সে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে, কুকুরটার হৃৎপিণ্ড সই করে।

কিন্তু অতিরিক্ত লাফঝাঁপ করছে কুকুরটা, ফলে কোপটা জায়গামত লাগল না। লাগল সামনের পায়ের ওপরদিকে। কেঁউ করে উঠল কুত্তার বাচ্চা। ঝটকা মেরে ছুরিটা ছাড়িয়ে নিয়েই আবার চালাল আলতাফ। এইবার কাজ হলো। গোড়া পর্যন্ত বসে গেল ওটা শেফার্ডের নরম বুকে। থেমে গেল লাফঝাঁপ। অস্ফুট এক টুকরো গোঙানি বেরিয়ে এল ওটার গলা দিয়ে। কাত হয়ে ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ল দৈত্যাকার কুকুরটা।

পুরো ব্যাপারটা ঘটতে বড়জোর তিন কি চার সেকেণ্ড লাগল। অথচ রানার মনে হলো কয়েক ঘণ্টা। উঠে বসে হাঁপাতে লাগল ও। এদিক ওদিক তাকাল। হ্যাণ্ডলারের হাত থেকে কেমন করে ছুটল কুকুরটা, বুঝে উঠতে পারছে না। কিন্তু এখন চিন্তা করার সময় নেই। যে কোন মুহূর্তে আরও বড় বিপদ ঘটে যেতে পারে। তাড়াতাড়ি মৃত জন্তুটাকে সরাতে হবে। দু'জনে মিলে হেঁচড়ে ভারী দেহটা কাছের একটা ঝোপের আড়ালে রেখে ফিরে এল। চট্ করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। এই সময় কাছেই কেউ ডেকে উঠল, 'উইনি!'

মৃত কুকুরটাকেই ডাকা হচ্ছে, বুঝল ওরা। 'উইনি!' আরও কাছে চলে এসেছে কণ্ঠধারী। অন্ধকারে লম্বাটে বিল্ডিংটার পিছনে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা দম বন্ধ করে। কয়েক মুহূর্ত পরই দেখা গেল এক হ্যাণ্ডলারকে। পিছনের আলোয় কাঠামোটা দেখা যাচ্ছে তার। প্যান্টের চেইন লাগাতে লাগাতে ওদের পাঁচ হাতের মধ্যে এসে দাঁড়াল লোকটা। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। 'গেল কোথায়!' বিড় বিড় করে বলল সে। আরও দু'পা এগোল। 'উইনি!' ডাকটা দিয়েই সশব্দে আঁতকে উঠল হ্যাণ্ডলার, কাটা বেড়া চোখে পড়েছে। ঝট্ করে কাঁধের অস্ত্র নামাল সে।

পিছনে তাকিয়ে হাঁক ছাড়তে গেল, কিন্তু সুযোগ হলো না। প্যান্থারের মত তার দু'হাতের মধ্যে এসে পড়ল রানা, হ্যাণ্ডলারের কণ্ঠনালীর এপাশ দিয়ে ঢুকে ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল ওর কম্যাণ্ডো ছুরি। দাঁড়ানো অবস্থায় জবাই হয়ে গেল লোকটা। দেহটা মাটিতে পড়ার আগেই ধরে ফেলল রানা। কলার ধরে টানতে

টানতে নিয়ে গেল অন্ধকারে। শুইয়ে দিল বিল্ডিঙের দেয়াল ঘেঁষে।

'যাক,' চাপা গলায় বলল আলতাফ। 'দেড় জোড়া গেল।'

'আরও দেড় জোড়া আছে। শোনো, দেরি করা যাবে না। একজন হ্যাণ্ডলার আর উইনি গায়েব, ব্যাপারটা অন্যদের চোখে পড়তে সময় লাগবে না। তুমি কভার দাও আমাকে,' বলতে বলতে মেশিনগান কাঁধে ঝোলাল মাসুদ রানা। শোল্ডার হোলস্টার থেকে ওয়ালথার বের করে সাইলেন্সার লাগাল। যতক্ষণ নিঃশব্দে কাজ চালানো যায়, ততই লাভ। ওর দেখাদেখি আলতাফও তাই করল।

এই সময় পিছনে চলে এল দ্বিতীয় হ্যাণ্ডলার। সঙ্গে অন্যজনও আছে। নিবিষ্ট মনে গল্প করতে করতে হাঁটছে ব্যাটারা। কিন্তু কুকুরটা কেন যেন এগোতে চাইছে না। গলা দিয়ে গর্র্ গর্র্ আওয়াজ বেরুচ্ছে ওটার। হ্যাণ্ডলারকে টেনে নিয়ে আসতে চাইছে এদিকে। নাকে রক্তের গন্ধ গেছে হয়তো। ব্যাপারটা খেয়ালই করল না গল্পে মগ্ন হ্যাণ্ডলার। বরং বাধা পড়ায় রেগেমেগে শিকল ধরে এক হ্যাঁচকা টান মারল। টেনে নিয়ে চলল ওটাকে জোর করে।

আগেও লক্ষ করেছে রানা, এখনও দেখল, পাহারাদারী যে গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ, এদের আচরণে তা মনেই হয় না। তার মানে এরা গভীর আত্মবিশ্বাসী। নিশ্চিত জানে, এখানে কেউ আসবে না প্রফেসরকে খুঁজতে। নিচু কণ্ঠে দ্রুত কিছু নির্দেশ দিল রানা আলতাফকে। মাথা ঝাঁকাল সে। 'ঠিক আছে।'

লোক দুটো বিল্ডিঙের কোণা ঘুরে আড়ালে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা। 'রেডি?'

'রেডি!'

নিঃশব্দে, নিক্ষিপ্ত তীরের মত ছুটল ও গার্ডদের পিছন পিছন। বাঁ হাতে কাঁধের মেশিনগান ধরে রেখেছে যাতে পড়ে না যায়। বুকের ভেতর ধুকপুক করছে কলজে, এই বুঝি কেউ দেখে ফেলল, এই বুঝি চেঁচিয়ে উঠল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তেমন কিছু ঘটল না। নিরাপদেই আলোকিত জায়গাটা পেরিয়ে এসে দোতলা ভবনটার পাশের দেয়ালে গা ঘেঁষে দাঁড়াল ও। ততক্ষণে ঘুরে সামনে চলে গেছে গার্ড দুটো। দেয়ালে পিঠ ঘষে এক পা এক পা করে এগোল রানা দম বন্ধ করে। ওয়ালথার ধরা ডান হাত সামনে বাড়ানো। প্রস্তুত।

কিন্তু বিল্ডিংটার সামনে পৌঁছার জন্যে শেষ বাঁকটা ঘোরার আগে মুখ বাড়িয়েই অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল ও। চমকেই উঠল। রানার মাত্র তিন হাতের মধ্যে এদিকে ফিরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে কুকুরবিহীন গার্ডটা। ঠোঁটে সিগারেট ঝুলিয়ে ধরাতে যাচ্ছিল সে, এই সময় চোখের কোণে নড়াচড়া ধরা পড়তে মুখ তুলল সে। পর মুহূর্তেই রানাকে দেখে চরম বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল লোকটা, মুখ থেকে খসে পড়ল সিগারেট।

'দুপ্!' মৃত্যু বর্ষণ করল রানার ওয়ালথার। টুঁ শব্দটিও করার সময় পেল না সে। এক লাফে এগিয়ে এসে পতনোন্মুখ দেহটা ঠেকাল রানা কলার শক্ত করে ধরে। দ্বিতীয় ডগ হ্যাণ্ডলারের খোঁজে এদিক ওদিক তাকাল দ্রুত। নেই কোথাও লোকটা। পিছনে চলে গেছে আবার? উত্তরটা সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গেল ও। বিল্ডিঙের

ওপাশ থেকে ডেকে উঠল কেউ। 'রিকো!'

এই সেরেছে! ব্যাটা ডাকাডাকি করে এখনই হয়তো মাথায় তুলবে কমপ্লেক্স। সময় মত আলতাফ যদি...কলার ধরে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে দেহটা কয়েক গজ দূরের সিঁড়িঘরে এনে ঢোকাল মাসুদ রানা। বাইরে প্রচুর আলো, তাই হয়তো সিঁড়িঘরে আলোর ব্যবস্থা রাখা হয়নি কোন। ঠেলে গুঁতিয়ে যতটা পারা যায়, দেহটা সিঁড়ির নিচে গুঁজে রাখল রানা। তারপর প্লাস্টারবিহীন সিঁড়ি বেয়ে ছুটল দোতলার উদ্দেশে।

ওপরে পৌঁছে একটু থামল রানা। একটু আগে নিচ থেকে শেষ গার্ডটির ডাক শুনেছে ও। তারপর আর কোন আওয়াজ নেই, বোধহয় মির্জা ব্যবস্থা করেছে তার। একটা বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে ধমকের সুরে কথা বলে উঠল কেউ, কিন্তু কি বলল বোঝা গেল না। পা টিপে টিপে এগোল রানা। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দম নিল লম্বা করে। ভেতরে লোকটা নিশ্চয়ই জেরি লাটিমার, ভাবল ও। কারণ আমেরিকান অ্যাকসেন্টে কথা বলছে লোকটা।

'সকালে প্যারাডাইস সিটি যাচ্ছি আমি। পরদিন ফিরব। এর মধ্যে যদি...।'

আর শোনার প্রয়োজন মনে করল না রানা। বুঝে নিল যা বোঝার। দরজায় আস্তে করে চাপ দিল ও। খুলল না দরজা। ভেতর থেকে লাগানো। হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল মাথায়। মৃদু নক করল ও দরজায়।

খ্যাঁক করে উঠল ভেতর থেকে একই কণ্ঠ। 'কে!'

'আমি, স্যার,' চাপা গলায় বলল রানা।

'আমি কে?'

'রিকো, স্যার। কাছেই কোথাও একটা মোটরবোটের আওয়াজ পেয়েছি আমি এইমাত্র। তাই...'

প্রায় উড়ে এসে দরজার ওপর পড়ল কেউ, পরমুহূর্তে ঝটাং করে খুলে গেল দরজা। 'কি বললে? মো...।'

'হ্যালো। জেরি লাটিমার!' অমায়িক হাসিতে ভরে উঠল রানার মুখ। পিস্তলের দীর্ঘ নল দিয়ে লোকটার বুকে ভয়ঙ্কর এক খোঁচা মারল ও। দ্রুত দু'পা পিছিয়ে গেল সে। মহাবিস্ময়ে অবর্ণনীয় চেহারা হয়েছে। হাঁ করে দেখছে সে রানাকে। চোখে নিখাদ অবিশ্বাস।

'চিনতে পারোনি বুঝি?'

তোতলাতে আরম্ভ করল জেরি। 'কি...কে! আ-আপনি...?'

'তোমার সেই বন্ধু, যার সুইটে লিসনিং ডিভাইস প্ল্যান্ট করেছিলে তুমি।'

'মা...মা...!'

'মাসুদ রানা!' ধমকে উঠল ও, যেন খুব বিরক্ত হয়েছে। 'কি মা মা করছ?' ভেতরে ঢুকে পড়ল ও। পিছনে না তাকিয়ে আন্দাজে দরজাটা বন্ধ করে দিল। চট্ করে চোখ বুলিয়ে নিল ঘরের ওপর।

একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে এদিকে মুখ করে বসে আছেন প্রফেসর মারগুব হোসেন। তাঁর ডান দিকে বসা শিলা ব্রাউন। সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত লাগছে মেয়েটিকে।

চোখের নিচে কালি পড়ে বিশ্রী হয়ে গেছে চেহারা। বিজ্ঞানীর আরেক পাশে বসা ডাক্তার পল ম্যাথিয়াস। ঘটনার আকস্মিকতায় এতই অবাক হয়েছে ঘরের সবাই, নড়াচড়ার কথা মনে হলো ভুলেই গেছে। যে যে-ভাবে ছিল, জমে বসে আছে মূর্তির মত।

এগিয়ে এসে জেরি লাটিমারকে সার্চ করল রানা। কোন অস্ত্র পাওয়া গেল না তার কাছে। ঘরের একমাত্র খালি চেয়ারটা তাকে দেখাল রানা ইঙ্গিতে। এতক্ষণ নিশ্চয়ই ওটাতেই বসে ছিল সে। 'ওটা নিয়ে দেয়ালের দিকে সরে যাও।'

ভয়ে ভয়ে তাড়াতাড়ি নির্দেশটা পালন করল জেরি। চেয়ারটা দেয়াল ঘেঁষে রেখে তাকাল রানার দিকে। ঘামে গোসল হয়ে গেছে লোকটা। চোখ বড় বড় করে দেখছে ওকে।

'বোসো!' ওয়ালথার নাচাল রানা।

সঙ্গে সঙ্গে পালিত হলো নির্দেশ। দেয়াল ঘেঁষা একটা টেবিলের পাশে গিয়ে বসল সে। ভয়ে কলজে শুকিয়ে গেছে তার। সারাজীবন কেটেছে শুধু ফন্দি এঁটে, অ্যাকশনে কোনদিন যায়নি সে। যেতে হয়নি। আজ আচমকা জীবন-মৃত্যুর মুখে পড়ে সব এলোমেলো হয়ে গেছে জেরির। হাড়ে হাড়ে টের পেল, মিথ্যে বলেনি কার্ল হফার।

এতক্ষণ কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে মাসুদ রানাকে দেখছিলেন প্রফেসর। এইবার কথা বলে উঠলেন। 'আপনি কে?'

বাংলায় নিজের পরিচয় দিল ও। 'আমি আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

'কোথায়?'

'বাংলাদেশে।'

'মানে?'

'আপনার সব প্রশ্নের উত্তর পরে দেব, স্যার। এখন দেরি করার সময় নেই। আমাদের তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে এখান থেকে।'

'মাসুদ ভাই!' বাইরে থেকে ডেকে উঠল আলতাফ।

'দাঁড়াও।' দরজা খুলে দিল রানা।

ভেতরে এসে আবার দরজা লাগিয়ে দিল সে। 'সব ঠিক আছে এদিকে?'

'হ্যাঁ। নিচের কি খবর?'

'কোন অসুবিধে নেই।'

ওর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মুহূর্তের জন্যে অসতর্ক হয়ে পড়েছিল রানা। চোখ সরে গিয়েছিল জেরির ওপর থেকে, সুযোগটার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করল লোকটা। ডান হাতটা চট্ করে টেবিলের নিচে চলে গেল তার। পরমুহূর্তে আকাশ কাঁপিয়ে বেজে উঠল সাইরেন।

# এগারো

চর্কির মত ঘুরে দাঁড়াল মাসুদ রানা। তাজ্জব হয়ে তাকাল জেরি লাটিমারের দিকে, হাতটা তখনও পুরোপুরি ফিরিয়ে আনতে পারেনি লোকটা। বুঝে ফেলল রানা কি ঘটে গেছে। রাগে অন্ধ হয়ে গেল। ঝট্ করে ওয়ালথার তুলেই টেনে দিল ট্রিগার। বুকের বাঁ দিকে গোল একটা ফুটো সৃষ্টি হলো লাটিমারের। চোখ কপালে তুলে মাসুদ রানাকে দেখল সে।

আবার একই জায়গায় গুলি করল রানা। চোখ উল্টে চেয়ারসহ হুড়মুড় করে মেঝেতে আছড়ে পড়ল লোকটার প্রাণহীন দেহ। সেই মুহূর্তে নিচ থেকে একটা হাঁক ভেসে এল। পরক্ষণেই আরেকটা। তখনও সমানে বাজছে সাইরেন।

'আলতাফ, কুইক! শিলাকে নাও···নৌকার দিকে!' বলেই এক লাফে প্রফেসরের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। 'জলদি উঠুন, স্যার! জলদি, জলদি!' হাত ধরে টান দিল বিজ্ঞানীর।

'আমি!' আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে ডাক্তার ম্যাথিয়াসের চেহারা। তড়াক্ করে উঠে দাঁড়িয়েছে সে এক লাফে। 'আমার কি হবে?'

লোকটার দিকে তাকাল না রানা। প্রফেসরের হাত ধরে দরজার দিকে ছুটতে ছুটতে বলল, 'আসুন আমাদের সঙ্গে।'

আগেই দরজা খুলে ফেলেছে আলতাফ। উঁকি দিয়ে সামনেটা এক পলক দেখে নিয়ে রানার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল সে। তারপর পা রাখল বাইরে। বাঁ হাতে শিলার এক হাত ধরে রেখেছে শক্ত হাতে। ডান হাতে ধরা থম্পসন মেশিনগানটা। সিঁড়ি বেয়ে সাবধানে নামতে শুরু করল ওরা। নিচে গলার সংখ্যা বেড়ে গেছে। চেঁচামেচি করছে পাঁচ-ছয়জন। ছোটাছুটি করছে লোকগুলো। কাঁচা ঘুম থেকে উঠেছে বলে দিশে করতে পারছে না। সবার হাতে একটা করে মেশিন পিস্তল।

সিঁড়ির গোড়ায় এসে থেমে দাঁড়াল মাসুদ রানা। মেশিনগান তুলেই গুলি করল গেটের ফ্লাডলাইট লক্ষ্য করে। মুহূর্তে অন্ধকারে ডুবে গেল সামনের পুরো এলাকা। গুলির শব্দে হৈ-হৈ পড়ে গেল। দুদ্দাড় ছুটে আসছে কয়েক জোড়া পদশব্দ ওরাও ছুটল। বিজ্ঞানীর এক হাত ধরে আগে আগে ছুটছে মাসুদ রানা। ওর ঠিক পিছনেই শিলা ব্রাউন। তার পাশাপাশি হাঁফাতে হাঁফাতে দৌড়াচ্ছে ম্যাথিয়াস। মোটা, তারওপর বয়সও একেবারে কম নয়, দৌড়াতে পারছে না লোকটা

ভীত চোখে পিছনে তাকাচ্ছে থেকে থেকে। হোঁচট খেতে খেতে পড়িমরি ছুটছে। শিলার অবস্থাও অনেকটা একই রকম। ব্যতিক্রম কেবল বিজ্ঞানী। ভদ্রলোক ভয় পেয়েছেন বলে মনে হলো না। দৌড়াচ্ছেন ঠিকই, তবে যতটা না প্রাণের তাগিদে, তার চেয়ে বেশি মাসুদ রানার টান খেয়ে। সবার পিছনে রয়েছে

আলতাফ। কভার করছে সবাইকে।

গেট পেরিয়ে রাস্তায় এসে উঠল ওরা। তারপর রাস্তা ছেড়ে অসমান ঘাসমোড়া মাঠে নেমে এল। এবার ওক গাছটা লক্ষ্য করে ছুটল। এই সময় পিছনের লোকগুলোর চোখে পড়ে গেল ওরা। এক সঙ্গে গর্জে উঠল তিন-চারটা মেশিন পিস্তল। দৌড়ের ওপর গুলি ছুঁড়ছে লোকগুলো, তাই প্রথম পশলাটা ফাঁকা গেল। সঙ্গে সঙ্গে পলকের জন্যে থেমে দাঁড়িয়ে জবাব দিল আলতাফ। লুটিয়ে পড়ল একজন। আবার এক ঝাঁক গুলি বর্ষণ করল ও, শুয়ে পড়তে বাধ্য করল লোকগুলোকে। তারপর ঘুরেই দৌড় শুরু করল। অন্যরা তখন ছয়-সাত গজ পিছনে ফেলে দিয়েছে ওকে।

আচমকা হেভি মেশিনগানের ঠা-ঠা-ঠা-ঠা শব্দে চমকে ঘুরে তাকাল। পর মুহূর্তে 'মাগো!' বলে আছড়ে পড়ল আলতাফ।

'আলতাফ!' আঁতকে উঠল মাসুদ রানা। দাঁড়িয়ে গেল চট করে। 'কোথায় লেগেছে, আলতাফ? কোথায়?'

উপুড় হয়ে পড়ে মাটিতে নাকমুখ ঘষছে মির্জা যন্ত্রণায়। বুকের ডান দিকে আর ডান উরুতে দুটো গুলি খেয়েছে সে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে পরনের কাপড়। 'থামবেন না, মাসুদ ভাই!' দাঁতে দাঁত পিষে কোনমতে বলল সে। 'পালান!'

কাছে এসে বসে পড়ল রানা। 'আপনারা দৌড়াতে থাকুন,' বলল ও অন্যদের উদ্দেশে। 'ওই ওক গাছটার দিকে যান। জলদি করুন, জলদি করুন!' ঘুরে কমপ্লেক্সের দিকে তাকাল ও। পাঁচ-ছয়জন চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে আসছে, ওদিকে মাথার ওপর আরেক বিপদ, বাউনিং। মুহূর্তের জন্যে অসহায় বোধ করল রানা।

'মাসুদ ভাই, পালান! সময় নষ্ট করবেন না, প্লীজ!'

জবাব দিল না রানা। মেশিনগান তুলে ধীরস্থির মাথায় পিছনের ছুটন্ত ছায়াগুলো লক্ষ্য করে ট্রিগার টানল। দুটো ছায়া লুটিয়ে পড়ল চিৎকার করে। থমকে দাঁড়াল বাকিরা, শুয়ে পড়ল চট করে। ওদের মাত্র বিশ গজ পিছনে রয়েছে দলটা। হঠাৎ করেই লালচে আলোয় ভরে উঠল চারদিক। দোতলা বিল্ডিংটার ছাতে জ্বলে উঠেছে আরেকটা ফ্লাড লাইট। কিন্তু আলোটা তেমন জোরাল নয়।

সেই সঙ্গে আবার হুঙ্কার ছাড়ল ব্রাউনিং। ধড়াস করে পড়ে গেল ম্যাথিয়াস। পড়ে আর নড়ল না লোকটা। তাই দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন বিজ্ঞানী। কিন্তু দাঁড়াতে দিল না তাঁকে শিলা ব্রাউন, হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল। একজন দু'জন করে পিছনের লোকগুলো মাথা তুলছে দেখে আবার গুলি করল মাসুদ রানা। ওর মেশিন পিস্তলের আওয়াজ চাপা পড়ে গেল ব্রাউনিঙের গুরুগম্ভীর গর্জনে।

মনে হলো 'ঠক্' করে একটা আওয়াজ হলো। কিন্তু কোথায়, দেখার গরজ নেই যেন মাসুদ রানার। ওই মেশিনগান স্তব্ধ না করা গেলে কোন আশা নেই বাকিদের। সবাইকে মরতে হবে। 'মন শক্ত করো,' আলতাফকে সাহস জোগাবার চেষ্টা করল রানা। 'এক-আধটা গুলি খেলে কিছু হয় না। ঠিক হয়ে যাবে তুমি।'

বলতে বলতে মেশিনগান কাঁধে ঠেকাল। লম্বা ঘাসের আড়ালে বসে আছে বলে কিছুটা সুবিধে পাচ্ছে ও। খুনীগুলোর ওপব আরেক পশলা গুলি বর্ষণ করেই

ফ্লাড লাইট সই করল রানা। গুলি বেরিয়ে যাওয়ার পরক্ষণেই কাঁচ ভাঙার আওয়াজ পাওয়া গেল অস্পষ্টভাবে। দপ্‌ করে নিভে গেল আলো। 'আর একটু ধৈর্য ধরো, আলতাফ,' প্রায় বিড় বিড় করে বলল রানা। 'আর একটু, আর একটু।'

ছাতে রেলিং নেই। ফ্লাড লাইটের আলো নিভে যেতেই আকাশের পটভূমিতে গানারকে প্রায় পরিষ্কার দেখতে পেল ও। এবার আরও দুই এক মুহূর্ত বেশি ব্যয় করে লোকটার ওপর লক্ষ্য স্থির করে ট্রিগারে চাপ দিল রানা। প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়ে দু'হাত শূন্যে উঠে গেল লোকটার। চিত হয়ে আছড়ে পড়ল সে। এইবার হাঁটুতে ভর দিয়ে মরিয়া হয়ে উঠে বসল মাসুদ রানা। বাকি ক্লিপ শেষ করল পিছনের খুনীগুলোর ওপর।

পর পর দুটো আর্ত চিৎকার কানে এল ওর। এইবার বোধহয় হুঁশ হলো বাকিদের। টাকার জন্যে পৈতৃক প্রাণটা হারানো কোন কাজের কথা নয় বুঝে যে যেদিক পারল ছুটে পালাল লোকগুলো। কিন্তু ছাড়ল না মাসুদ রানা। রাগে অন্ধ হয়ে গেছে ও। পাখি শিকারের মত আরও দুটোকে ফেলে দিল। বাকি ছিল তিনজন, কিভাবে কোনদিক দিয়ে পালাল তারা বুঝতেই পারল না রানা।

এবার আলতাফের দিকে মন দিল ও। 'কোথায় লেগেছে, দেখি!' সাড়া দিল না সে। 'আলতাফ!' তাড়াতাড়ি ওর গলার পাশে চাপ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখল রানা। না, মারা যায়নি। এখনও বেঁচে আছে। জ্ঞান হারিয়েছে। ওর শরীর হাতড়াতে শুরু করল রানা। বেশি সময় লাগল না ক্ষত দুটো বের করতে। গাল কুঁচকে উঠল রানার। রক্তে মাটি ভিজে চপ্‌চপ্‌ করছে। চোখের কোণ শিরশির করে উঠল রানার। যে হারে রক্ত পড়ছে, বেশিক্ষণ বাঁচবে না ছেলেটা। তবু যথাসাধ্য চেষ্টা করবে ও। সঙ্গে ফার্স্ট এইড বক্স আছে। ক্ষত দুটো ব্যাণ্ডেজ করে যদি কোনরকমে···। ভাবতে ভাবতে খুব যত্নের সঙ্গে দেহটা কাঁধে তুলে নিল ও। পিছনে একবার তাকিয়ে পা বাড়াল ওক গাছটার দিকে।

ঘোলাটে চাঁদ উঠেছে আকাশে। সে আলোয় মোটামুটি দেখা যায় খানিকটা। কয়েক পা এগিয়েই থমকে দাঁড়াল মাসুদ রানা। বেকায়দা ভঙ্গিতে পড়ে আছে ডাক্তার। সাদা শার্ট পিঠের দিকে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পা বাড়াল আবার। ফের থামতে হলো ওকে। উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে শিলা ব্রাউন। মাথার খুলি প্রায় পুরোটাই উড়ে গেছে তার। মেয়েটির একটা হাত মুঠোয় নিয়ে হাঁটু গেড়ে স্থবিরের মত বসে আছেন প্রফেসর।

জোয়ারের প্রবল টানে তরতর করে ভেসে চলেছে নৌকা। গলুইয়ে হাল ধরে নৌকার নাক সোজা রাখার সংগ্রাম করছে মাসুদ রানা। পাটাতনে চিত হয়ে শুয়ে আছে আহত আলতাফ মির্জা।

ওক গাছের নিচে রেখে যাওয়া কাপড়ের ব্যাগে একটা ফার্স্ট এইড কিট ছিল। ওষুধ লাগিয়ে ক্ষত দুটো ব্যাণ্ডেজ করে দিয়েছে রানা। যদিও ছেলেটার বাঁচার আশা আগেই ছেড়ে দিয়েছে। শরীরের প্রায় সব রক্ত বেরিয়ে গেছে আলতাফের। নাড়ি চলছে কি না বোঝা দায়। দুই কষায় থেকে থেকে লালচে বুদ্বুদ

দেখা দিচ্ছে। ফুসফুস ফুটো হয়ে গেছে হতভাগ্য যুবকের। ব্যাণ্ডেজ বাঁধার সময় সামান্য নড়াচড়া করেছিল ও। তারপর থেকে অনেকক্ষণ ধরে নিঃসাড়। ওর মাথার কাছে বসে আছেন প্রফেসর। থেকে থেকে বিড় বিড় করে কি সব বলছেন, বোঝা যায় না।

'ইস্! জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে ছেলেটার,' এক সময় বলে উঠলেন তিনি।

কিছু বলল না মাসুদ রানা। উঠল না জায়গা ছেড়ে। উঠে কিছু করার নেই ওর। অসহায়ের মত হা পিত্যেশ করার চেয়ে কাজে ব্যস্ত থাকাই ভাল। স্রোত এ মুহূর্তে এত বেশি যে চার ঘণ্টার পথ মাত্র দুই ঘণ্টা বিশ মিনিটে পেরিয়ে এল ওরা। বেলমোর যখন পৌঁছল, রাত তখন তিনটের মত। একটা পন্টুনে নৌকা বেঁধে বিজ্ঞানীকে অপেক্ষা করতে বলে তীরে উঠে পড়ল রানা। পনেরো মিনিটের মাথায় ফিরে এল একটা প্যাকার্ড নিয়ে। গাড়িটা চুরি করেছে ও।

ধরাধরি করে আলতাফকে পিছনের আসনে শুইয়ে দিল ওরা। তারপর গাড়ি ছোটাল মাসুদ রানা। একটু পর আবার বৃষ্টি নামল। ভাব দেখে মনে হলো দুই একদিনে ছাড়বে না এ বৃষ্টি। যথাসম্ভব দ্রুত গাড়ি ছোটাল রানা। এর মধ্যে আলতাফের অবস্থা আরও খারাপের দিকে মোড় নিয়েছে। অভিজ্ঞতা থেকে জানে রানা, ছেলেটার যে অবস্থা, তাতে এই মুহূর্তে যদি পৃথিবীর সর্বাধুনিক হাসপাতালেও ভর্তি করা হয়, বাঁচবে না ও। কাজেই অহেতুক ছোটাছুটি করে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না।

প্রায় দুই ঘণ্টা হলো কোনরকম সাড়া নেই আলতাফের। মাঝে মধ্যে বাঁ হাত পিছনে নিয়ে তার কপাল-গলার উত্তাপ দেখছে মাসুদ রানা। প্রচণ্ড জ্বর। একশো চারের নিচে নয়। ব্যাণ্ডেজ বাঁধার সময় দুটো পেইন কিলার খাওয়ানো হয়েছিল ওকে। তাতে কোন কাজ হয়েছে বলে মনে হলো না। দুটো বুলেটই রয়ে গেছে ওর দেহে।

বুকেরটার খোঁজ রানা জানে না। তবে উরুরটার অস্তিত্ব টের পেয়েছে। হাড়ের গায়ে শক্ত হয়ে গেঁথে আছে ওটা, ব্যাণ্ডেজ বাঁধার সময় স্পর্শ করে দেখেছে। অনেক চেষ্টা করেও বের করতে পারেনি। ও দুটোই বেশি ক্ষতি করছে। নীরবে ড্রাইভ করছে রানা। গড়ে আশি মাইল গতিতে ছুটছে প্যাকার্ড। কেমন এক ঘোরের ভেতর রয়েছে যেন রানা। প্রফেসরেরও একই অবস্থা। চোখ বুজে হেলান দিয়ে পড়ে আছেন পা লম্বা করে।

কখনও কখনও চোখ মেলছেন তিনি। ঘুরে তাকাচ্ছেন পিছনের নিথর দেহটার দিকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা নীরবে কেটে যাচ্ছে। কথা নেই কারও মুখে। ভোরের দিকে এক সেলফ সার্ভিস স্টেশনে থেমেছিল মাসুদ রানা। ট্যাঙ্ক ভর্তি করে ফুয়েল নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়েছে তক্ষুণি। তারপর থেকে চলছে তো চলছেই। বাইরে বৃষ্টি, পড়ছে তো পড়ছেই।

রাতের মত আঁধার হয়ে থাকল মেঘলা আকাশ। একটানা সতেরো ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে লিঙ্কন ফলস্ পৌঁছল রানা। প্যাকার্ড ফেলে আলতাফের লুকিয়ে রাখা সেডানে উঠল। তার অনেক আগে, সকাল এগারোটার দিকে, নীরবে সব হাসি

কান্নার ওপারে চলে গেছে আলতাফ মির্জা। কখন গেল, টের পেতে দেয়নি কাউকে।

অন্ধকার মত একটা জায়গায় গাড়ি রাখল রানা ফোন বুদ দেখে। টেলিফোনে দু'মিনিট কথা বলল কারও সঙ্গে। তারপর ফিরে এসে আবার রওনা হলো। মাসুদ রানা যেন রোবট একটা। চেহারায় কোন অভিব্যক্তি নেই, বুকে কোন অনুভূতি নেই। মুখে ভাষা নেই। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মত যখন প্রয়োজন গাড়ির গতি বাড়াচ্ছে কমাচ্ছে, গীয়ার বদল করছে, স্টীয়ারিং হুইল ঘোরাচ্ছে। দৃষ্টি সামনের রাস্তায় স্থির।

সারাদিন বৃষ্টি গেছে আজ। ফলে রাস্তায় গাড়িঘোড়ার চাপ অনেক কম। ফ্লোরিডা রাজ্যে ঢুকল সেডান। গতি এখন কিছুটা কম। একভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ধাঁধা ধরে গেছে চোখে। মাঝে মধ্যেই বিভ্রান্ত হচ্ছে এখন দৃষ্টি। কখনও মনে হচ্ছে ওর, রাস্তা যেন শূন্যে ভাসছে। হঠাৎ হঠাৎ রং সাইডে নিজেকে আবিষ্কার করে তাজ্জব হয়ে যাচ্ছে রানা। হুইলের সঙ্গে যুদ্ধ করে সোজা করছে গাড়ি।

প্যারাডাইস সিটির মাইল বিশেক আগে পিছনে আচমকা সাইরেনের শব্দে চমকে উঠল মাসুদ রানা। মস্তিষ্ক সক্রিয় হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। ড্রাইভিং মিররে চোখ রাখল ও। পিছনে বিশাল একটা হেডলাইট–মোটর সাইকেল। পাশে পৌঁছে রানাকে থামতে ইশারা করল ওটার আরোহী, রেইনকোট পরা হাইওয়ে পুলিসের এক কনস্টেবল।

রাস্তা ছেড়ে ঘাসের ওপর নেমে এল মাসুদ রানা। দাঁড় করিয়ে ফেলল গাড়ি। নিজের দিকের কাঁচ নামিয়ে দিল। ওর জবা ফুলের মত টকটকে লাল চোখের দিকে চেয়ে থাকল লোকটা কিছুক্ষণ। 'কি ব্যাপার? মদ খেয়ে গাড়ি চালাচ্ছেন মনে হয়?'

কথা বলল না রানা। কি করে তাড়াতাড়ি ঝামেলা বিদেয় করা যায়, তাই ভাবছে। হাতের ফ্ল্যাশ লাইটের আলো ওর মুখের ওপর ফেলল লোকটা। 'কী সর্বনাশ!' প্রায় আঁতকে উঠল। 'অসুস্থ নাকি আপনি?'

'ও কিছু নয়। বাসায় গিয়ে একটা ঘুম দিতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।' মনে মনে আশা করছে, আলতাফকে যেন দেখে না ফেলে লোকটা। তাহলেই ঝামেলা।

'কোথায় থাকেন আপনি?'

'প্যারাডাইস সিটি।'

'পাগল নাকি! অতদূর কি করে যাবেন আপনি?' বলেই গাড়ির ভেতর আলো ফেলল লোকটা। নিঃশব্দে দরজা খুলে এক পা নামিয়ে দিল রানা। 'ওহ্, গড! ও-ওটা কে?' আলতাফকে দেখছে তাজ্জব কনস্টেবল।

'আমার বন্ধু। ঘুমিয়ে আছে।'

'ঘুমিয়ে আছে, মানে!' গলা চড়ে গেছে লোকটার। 'ও তো···'

আর কথা বলার সুযোগ দিল না রানা তাকে। বাঁ হাতে ওজন মেপে মারল

লোকটার ডান কানের নিচে। পরমুহূর্তে নাকের ওপর আরেকটা হেভিওয়েট পাঞ্চ। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল কনস্টেবল। পথের পাশের একটা ঝোপের আড়ালে তাকে এবং তার মোটর সাইকেল রেখে ফিরে এল মাসুদ রানা। গাড়ি ছোটাল দ্রুত। মাইল পাঁচেক এগোতে দেখা গেল রাস্তার পাশে পার্কিং লাইট জ্বেলে দাঁড়িয়ে আছে একটা গাড়ি।

হেডলাইট হাই করল মাসুদ রানা। জবাবে ওটার পার্কিং লাইট একবার মুহূর্তের জন্যে নিভেই জ্বলে উঠল। গাড়িটার যথাসম্ভব কাছে গিয়ে থামল রানা। ওটা একটা ক্যাডিলাক। সামনের দু'দিকের দরজা খুলে গেল, বেরিয়ে এল দুটো মনুষ্য মূর্তি। রানার জানালায় টোকা দিল ওদের একজন। কাঁচ নামাল রানা, কিন্তু কিছু বলল না।

'যাক্, বাবা!' বলে উঠল সোহেল আহমেদ। 'শেষ পর্যন্ত...'

'কুইক!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ধমকে উঠল মাসুদ রানা।

সেডান দুলে উঠল। 'কি ব্যাপার!' বিস্মিত কণ্ঠে বললেন প্রফেসর মারগুব হোসেন। 'আমাকে কোথায়...।'

'ইয়াল্লা!' চেঁচিয়ে উঠল সোহেল। 'রানা, কি হয়েছে আলতাফের!'

উত্তর দিল না ও। সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল কেবল। একটা সিগারেট ধরাল অনেকক্ষণ পর। ব্যস্ত হয়ে হাত বাড়িয়ে মৃতদেহটা স্পর্শ করল সোহেল, জমে গেল সঙ্গে সঙ্গে। অস্ফুটে বলল, 'ইন্নালিল্লাহ!'

আবার দুলে উঠল সেডান। তাকাল না মাসুদ রানা। কর্কশ গলায় সোহেলের উদ্দেশে বলল, 'যেতে দে।'

'কিন্তু, দোস্ত! তোর অবস্থা তো...'

'চুপ কর, সোহেল!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মাসুদ রানা। পরমুহূর্তে সিগারেটটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে গীয়ার দিল। দু'পা সরে গেল সোহেল। সাঁ করে বেরিয়ে গেল সেডান।

# বারো

রাত সাড়ে দশটা। প্যারাডাইস সিটি পুলিস স্টেশন। সার্জেন্টস ডেস্কে বসে পর্নো ম্যাগাজিন গিলছে ডিউটি সার্জেন্ট টিম মার্টিনেজ। হঠাৎ বাইরে থেকে টানা হর্নের আওয়াজে ভুরু কুঁচকে উঠল তার।

বেজেই চলেছে হর্ন। থামার লক্ষণ নেই। বিরক্ত হয়ে ম্যাগাজিনটা ড্রয়ারে গুঁজে দরজার দিকে পা বাড়াল সে। একটা নীল সেডান দাঁড়িয়ে আছে সামনে। ওটার দীর্ঘদেহী চালক হর্ন টিপে ধরে বসে আছে। দ্রুত হাত নেড়ে আওয়াজ বন্ধ করার ইঙ্গিত করতে করতে ছুটে গেল সে কাছে। কয়েক সেকেণ্ড পর ভূতের তাড়া খাওয়া চেহারা করে উর্ধ্বশ্বাসে উল্টো দৌড় দিল সে।

ওদিকে বাসায় যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন ফ্রেড উইলিয়ামসন, বিনা সঙ্কেতে হুড়মুড় করে তাঁর রুমে ঢুকে পড়ল মার্টিনেজ। 'চীফ! চীফ, বাইরে মিস্টার মাসুদ রানা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

চমকে উঠলেন পুলিস চীফ। 'কে!'

'মাসুদ রানা, চীফ। সেই পাগলা প্রফেসরও আছেন তাঁর সঙ্গে।'

'কি বললে!' তড়াক্ করে আসন ছাড়লেন ফ্রেড। এক দৌড়ে বেরিয়ে এলেন রুম ছেড়ে। 'প্রফেসর!'

'আর একটা লাশ...।' বলতে বলতে তাঁর পিছু নিল মার্টিনেজ। মুহূর্তে হুলস্থূল পড়ে গেল পুলিস স্টেশনে।

চীফকে দেখে হাসির ভঙ্গি করল মাসুদ রানা। 'হ্যালো!'

অবাক চোখে ওকে দেখলেন কিছুক্ষণ ফ্রেড উইলিয়ামসন। তারপর প্রফেসরকে। সবশেষে পিছনের সীটে আলতাফের ওপর চোখ পড়ল তাঁর। গাল কুঁচকে উঠল চীফের। 'গড!' রানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'আসুন, মিস্টার রানা। ভেতরে আসুন।'

'না,' বলল ও। 'পরে কথা হবে। আগে আলতাফের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রফেসরকে আপনার হেফাজতে পৌঁছে দিতে এসেছিলাম।' বলে মারগুব হোসেনের দিকে ফিরল ও। 'যান, ডক্টর।'

বিহ্বল দৃষ্টিতে রানাকে দেখলেন প্রফেসর। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন আলতাফের দিকে। তারপর হালকা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন গাড়ি থেকে।

'মিস্টার আলতাফের ব্যাপারে আমি খুব দুঃখিত,' অপরাধীর চেহারা করে বললেন ফ্রেড উইলিয়াম। কি ঘটেছে না বুঝলেও যেটুকু প্রয়োজন, সেটুকু ঠিকই অনুমান করে নিয়েছেন অভিজ্ঞ পুলিস চীফ। 'সত্যিই আন্তরিক দুঃখিত। এখন বুঝতে পারছি, বড্ড অন্যায় করে ফেলেছি আমি আপনাদের ভুল বুঝে।'

'দ্যাট'স অল রাইট, চীফ। ধন্যবাদ।' গীয়ার দিয়ে গাড়ি ব্যাক করল রানা। খানিক পিছিয়ে থেমে দাঁড়াল কি মনে করে। 'লাশটা দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করে হোটেলেই থাকব আমি।'

ব্যস্ত গলায় বললেন ফ্রেড, 'ঠিক আছে ঠিক আছে। রেস্ট নিন। প্রয়োজন হলে আমি নিজে আসব।'

হুশ্ করে বেরিয়ে গেল রানা। যতক্ষণ দেখা যায় সেডানের টেইললাইটের দিকে চেয়ে থাকলেন চীফ। তারপর ঘুরে দাঁড়ালেন প্রফেসরের দিকে। 'আসুন, স্যার।'

পরের দিনের ঘটনা। হোটেল বেলিভেডার। পুরু গদিমোড়া খাটে আধশোয়া হয়ে বসে আছে মাসুদ রানা। দু'হাত বুকের ওপর ভাঁজ করা। অন্যমনস্ক চোখে দেয়ালের দিকে চেয়ে আছে অপলক। গতরাতে হোটেল থেকে পুলিস চীফকে ফোন করেছিল রানা। রেড পোর্টের ঘটনা সবিস্তারে জানাতে। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে

ফোর্স পাঠাবার ব্যবস্থা নিয়েছেন ভদ্রলোক লুইজিয়ানা স্টেট পুলিসের সহায়তায়।

আলতাফ মির্জার কথা ভাবছে রানা। দেশের ছেলে ফিরে গেছে দেশে। তবে কফিনে করে। ছেলেটা নেই, ভাবলেই বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠছে রানার। থেকে থেকে ভাবাবেগ পেয়ে বসছে ওকে, খুব কষ্ট লাগে তখন। টেলিফোনের আওয়াজে সচকিত হলো মাসুদ রানা। হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলল।

'গুড ইভনিং, মিস্টার রানা। পুলিস চীফ বলছি। ডিসটার্ব করলাম না তো?'

'না। বলুন, কি করতে পারি আপনার জন্যে।'

'ইউএস অর্ডন্যান্স রিসার্চ ইনস্টিটিউটের চীফ এসেছেন ওয়াশিংটন থেকে। ভদ্রলোক কথা বলতে চান আপনার সঙ্গে। যদি আপনার আপত্তি না থাকে...'

'না না! এতে আপত্তির কি আছে? বলুন, কোথায় যেতে হবে, কখন?'

'উনি এ মুহূর্তে আমার এখানেই আছেন। এখনই যদি একবার আসেন, খুব ভাল হয়।'

'ঠিক আছে, আসছি আমি।'

আধঘণ্টা পর। ফ্রেড উইলিয়ামসনের অফিসে ম্যাক্স অলব্রাইটের মুখোমুখি বসল মাসুদ রানা। ওর সঙ্গে পরিচয়ের সময়ে ভদ্রলোককে সামান্য পানসে হাসি দিতে দেখেছিল রানা। তারপর থেকেই গম্ভীর তিনি। কী যেন ভাবছেন। ঘরে আরও আছেন পুলিস চীফ, প্রফেসর মারগুব হোসেন এবং সিআইএ-র জ্যাক টার্নার। সবাই নীরব। রানা ঘরে ঢোকার পর একবারই মাত্র চোরা চোখে তাকিয়েছিলেন প্রফেসর ওর দিকে। তারপর সেই যে মুখ নামিয়েছেন, ভুলেও আর তোলেননি।

'কি ভাবে প্রফেসরকে উদ্ধার করে এনেছেন আপনি, জানি না,' বললেন অলব্রাইট। 'তবে অনুমান করতে পারি। এ কাজে আপনি ঘনিষ্ঠ এক সহকারীকে হারিয়েছেন, সে জন্যে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করছি আমি, মিস্টার রানা।'

'ধন্যবাদ।'

'কিন্তু...।' থেমে গেলেন ওআরআই প্রধান। বিজ্ঞানী মারগুব হোসেনের দিকে তাকালেন এক পলক।

'কিন্তু?' কপাল কুঁচকে উঠল মাসুদ রানার।

'কথাটা কি ভাবে বলব, ভাবছি।'

'কি ব্যাপার!' পুলিস চীফের দিকে তাকাল ও। 'কি হয়েছে?'

'এই ভদ্রলোক মারগুব হোসেন নন,' বললেন ফ্রেড।

চমকে উঠল রানা। 'অ্যাঁ! কি বললেন?' বিস্ফারিত দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময় ওর।

'ঠিকই শুনেছেন আপনি,' নড়েচড়ে বসলেন বিশালদেহী অলব্রাইট। 'এ লোক মারগুব হোসেন নয়। তবে ব্যাপারটা অবাক করার মত হলেও এর সঙ্গে মারগুবের চেহারার তিলমাত্র অমিল নেই। অমিলটা কেবল একটা আঁচিলের।'

ধাক্কাটা এখনও যেন সামলে উঠতে পারেনি মাসুদ রানা। অবাক বিস্ময়ে বার বার লোকটার দিকে তাকাচ্ছে ও। 'আঁচিল!'

'হ্যাঁ। মারগুবের বাঁ চোখের কোণে একটা লাল আঁচিল ছিল। এঁর তা নেই। তাছাড়া এঁর কণ্ঠস্বরও অন্যরকম। মারগুব বহু বছর আমার সান্নিধ্যে থেকে কাজ করেছে, নিজের হাতের তালু যেমন চিনি আমি, ঠিক তেমনি চিনি তাকে। দেখামাত্রই বুঝেছি আমি ইনি আর কেউ। ইন ফ্যাক্ট, ভদ্রলোক তা স্বীকারও করেছেন।'

আহাম্মকের মত এর-ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল মাসুদ রানা। 'ভেতরের রহস্যটা কেউ দয়া করে খুলে বলবেন আমাকে? এ সব কি বলছেন আপনারা; আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আপনিই বলুন,' পুলিস চীফকে অনুরোধ করলেন ওআরআই চীফ। তারপর মুখ নামিয়ে লোমশ হাতের পিঠ টেবিলে বিছিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন।

'এই ভদ্রলোক একজন নামকরা গিটারিস্ট, মুনির হোসেন। নিউ ইয়র্কে আছেন প্রায় বছর দশেক। যে রাতে ওয়েন্টওয়র্থ অ্যাসাইলাম থেকে নিরুদ্দেশ হন প্রফেসর মারগুব হোসেন, তার একদিন পর মায়ামি এসেছিলেন তিনি কি এক কাজে। সেখান থেকে রাতের আঁধারে অপহরণ করা হয় এঁকে।'

'কেন?' লোকটির দিকে তাকাল বিস্মিত রানা।

'কারণ, প্রফেসরকে অ্যাসাইলাম থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি বাধা দিলে ক্ষিপ্ত হয়ে জেরি লাটিমারের এক চ্যালা মাথায় আঘাত করে তাঁর। আঘাত খুব জোরে লেগে যায়, ফলে সেখানেই মৃত্যু হয় প্রফেসরের। খবর জানাজানি হয়ে গেলে ওদের বস্ কার্ল হফার কাউকে জ্যান্ত রাখবে না, এই ভয়ে লাশটা গুম করে ফেলে জেরি। এই সময়ে জেরি লাটিমারের চোখে পড়ে যান ভদ্রলোক। প্রফেসরের সঙ্গে এঁর চেহারার অদ্ভুত মিল দেখে পিঠ বাঁচাবার বুদ্ধি আসে তার মাথায়। পরের ঘটনা সোজা।'

'প্রফেসরকে হত্যা করেছে ওরা?' দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে এল রানার। 'আপনারা কি করে জানলেন সে ঘটনা?'

'মিস্টার হোসেনকে সব ব্যাখ্যা করেছে জেরি লাটিমার। প্রচুর অর্থের লোভ দেখিয়ে মারগুব হোসেনের ভূমিকায় কিছুদিনের জন্যে অভিনয় চালিয়ে যেতে অনুরোধ করেছিল সে এঁকে। বলেছিল, কয়েকদিন পর সুযোগ বুঝে ছেড়ে দেবে ওরা মিস্টার হোসেনকে।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল রানা। ভাবছে। 'ঘটনা সত্যি?' মুনির হোসেনের দিকে তাকাল ও।

'হ্যাঁ,' কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন ভদ্রলোক। 'আমার কোন দোষ নেই। ওরা আমাকে জোর করে…।' ফুঁপিয়ে উঠলেন তিনি।

'শান্ত হোন,' বললেন অলব্রাইট। 'কেউ আপনাকে দোষ দিচ্ছে না। আমরা বুঝতে পেরেছি আপনি পরিস্থিতির অসহায় শিকার।'

'মাই গড!' অস্ফুটে বলল মাসুদ রানা। 'কাকে ভেবে কাকে নিয়ে এলাম আমি?'

নিম পাতার রস খাওয়া হাসি ফুটল ফ্রেড উইলিয়ামসনের মুখে। 'সত্যি।

আমরা সবাই নকলের পিছে দৌড়েছি গত ক'দিন। বাই দ্য ওয়ে, মিস্টার রানা, আলেক্স ক্যাগারকে দু'দিন আগে ওয়াটার ফ্রন্টে কে যেন হত্যা করেছে। আপনি জানেন কিছু এ ব্যাপারে?'

'নাহ্! জানি না তো! খুনীটা মরেছে তাহলে?'

অপলক চোখে ওকে দেখতে লাগলেন ফ্রেড। বুঝেও কিছু করার নেই। প্রমাণ নেই হাতে। 'মরেছে।'

'আপনারা কি কোন চার্জ আনবেন আমার বিরুদ্ধে, স্যার?' ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলেন মুনির হোসেন।

'চার্জ?' অবাক হলেন ম্যাক্স অলব্রাইট। 'কিসের চার্জ? নাহ্! আপনার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই আমাদের। আপনি মুক্ত। না কি বলেন?' ফ্রেড উইলিয়ামসনের দিকে তাকালেন তিনি।

'নিশ্চই নিশ্চই।' রানার দিকে ফিরলেন চীফ। 'মিস্টার নানা, কাল পথে এক হাইওয়ে পেট্রলকে মারধর করেছেন আপনি,' মোলায়েম কণ্ঠে বললেন।

'আমি!' আকাশ থেকে পড়ল যেন মাসুদ রানা। 'সে কি! কখন?'

'কাল রাতে। এখানে আসার খানিক আগে। হাইওয়েতে...'

'মাই গড! লোকটা পুলিস ছিল? আমি তো ভেবেছিলাম বুঝি কার্ল হফারের লোক, প্রফেসরকে, আই মীন, মিস্টার মুনিরকে ছিনিয়ে নিতে এসেছে!'

একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন চীফ। 'রিয়েলি!'

ঢাকা। জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। দুপুরের খানিক পরে একটা খুদে চার্টারড্ জেট অবতরণ করল। কড়া রোদে বিমানটির সাদা দেহ ঝিকমিক করছে। ট্যাক্সিয়িং করে টারমাকের উত্তর প্রান্তে হ্যাঙ্গারের কাছাকাছি দাঁড়াল ওটা।

কালো রঙের গোটা তিনেক ক্যাডিলাক দ্রুত ছুটে গেল বিমানটির দিকে। দরজা খুলে গেল ওটার। পেটের ভেতর থেকে প্রথমে বেরুল সোহেল আহমেদ। ওর ঠিক পিছনেই রয়েছেন প্রফেসর মারগুব হোসেন। সামনের ক্যাডিলাকের পিছনের দরজা মেলে ধরল ইউনিফর্ম পরা শোফার। ওটা থেকে বেরিয়ে এলেন বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স প্রধান মেজর জেনারেল (অব:) রাহাত খান।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে প্রফেসরের সঙ্গে হাত মেলালেন বৃদ্ধ। অন্য দুই ক্যাডিলাক থেকে ততক্ষণে বেরিয়ে এসেছে বিসিআই-এর ছয়জন বডিগার্ড। চারদিক থেকে ওঁদের ঘিরে রেখেছে তারা।

দু'মিনিট পর শহরের দিকে ফিরে চলল গাড়িগুলো। মাঝেরটায় রয়ে রাহাত খান, প্রফেসর মারগুব হোসেন এবং সোহেল আহমেদ। এয়ারপোর্ট রো ধরে দ্রুত ছুটছে ক্যাডিলাক বহর শহরের দিকে।

***

মাসুদ রানা

# নকল বিজ্ঞানী

দুইখন্ড একত্রে

## কাজী আনোয়ার হোসেন

এক বৈপ্লবিক মেটাল আবিস্কার করে বসেছেন প্রতিভাধর এক বাঙালি বিজ্ঞানী মারগুব হোসেন।
কিন্তু করেই বুঝতে পেরেছেন, এ আবিস্কারের ফর্মুলা প্রথমে যার হাতে পড়বে, পৃথিবীর জন্যে সে এক মস্ত হুমকি হয়ে দাঁড়াবে।
কাজেই ওটার ফর্মুলা ডিকোড না করার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি।
এদিকে প্রফেসর মারগুব হোসেনকে পুঁজি করে নোংরা ব্যবসায় মেতে উঠেছে এক জার্মান কোটিপতি।
অপহরণ করে বসল সে বিজ্ঞানীকে।
হন্যে হয়ে উঠল রানা,
যে করেই হোক, উদ্ধার করতেই হবে তাঁকে।
একটু একটু করে জড়িয়ে পড়ল ও কঠিন এক রহস্যের জালে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০